মাসিক

আত-তাহরীক

ধর্ম, সমাজ ও সাহিত্য বিষয়ক গবেষণা পত্রিকা

৩য় বর্ষ ৪র্থ ও ৫ম সংখ্যা
জানুয়ারী-ফেব্রুয়ারী ২০০০

তাবলীগী ইজতেমা-২০০০ সংখ্যা

প্রকাশকঃ
হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ
কাজলা, রাজশাহী।
ফোনঃ (অনুঃ) ০৭২১-৭৬০৫২৫, ফোন ও ফ্যাক্সঃ ৭৬১৩৭৮।
মুদ্রণেঃ দি বেঙ্গল প্রেস, রাণীবাজার, রাজশাহী, ফোনঃ৭৭৪৬১২।

مجلة "التحريك" الشهرية علمية أدبية و دينية
جلد:٣ عدد:٤-٥، رمضان - شوّال ١٤٢٠هـ / يناير-فبراير ٢٠٠٠م
رئيس التحرير: د.محمد أسد الله الغالب
تصدرها حديث فاؤنديشن بنغلاديش

প্রচ্ছদ পরিচিতিঃ আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, নওদাপাড়া, রাজশাহীর পশ্চিম পার্শ্বস্থ ক্লাস ভবন।

Monthly **AT-TAHREEK** an extra-ordinary Islamic research Journal of Bangladesh directed to Salafi Path based on pure Tawheed and sahih Sunnah. Enriched with valuable writings of renowned Columnists and writers of home and abroad, aiming at establishing a pure Islamic society in Bangladesh. Some of regular columns of the Journal are: 1. Dars-i Quran 2. Dars-i Hadith 3. Research Articles 4. Lives of Sahaba & Pioneers of Islam 5. Wonder of Science 6. Health & Medicine 7. News: Home & Abroad & Muslim world 8. Pages for Women 9. Children 10. Poetry 11.Fatawa etc.

বিজ্ঞাপনের হারঃ

* শেষ প্রচ্ছদ ঃ	৩,০০০/=
* দ্বিতীয় প্রচ্ছদ ঃ	২,৫০০/=
* তৃতীয় প্রচ্ছদ ঃ	২,০০০/=
* সাধারণ পূর্ণ পৃষ্ঠা ঃ	১,৫০০/=
* সাধারণ অর্ধ পৃষ্ঠাঃ	৮০০/=
* সাধারণ সিকি পৃষ্ঠাঃ	৫০০/=
* অর্ধ সিকি পৃষ্ঠাঃ	২৫০/=

* স্থায়ী,বার্ষিক ও নিয়মিত (ন্যূনপক্ষে ৩ সংখ্যা) বিজ্ঞাপনের ক্ষেত্রে বিশেষ কমিশনের ব্যবস্থা আছে।

বার্ষিক গ্রাহক চাঁদার হারঃ

দেশের নাম	রেজিঃ ডাক	সাধারণ ডাক
বাংলাদেশ	১৫৫/=(ষান্মাষিক ৮০/=)	====
এশিয়া মহাদেশঃ	৬০০/=	৫৩০/=
ভারত, নেপাল ও ভূটানঃ	৪১০/=	৩৪০/=
পাকিস্তানঃ	৫৪০/=	৪৭০/=
ইউরোপ ও আফ্রিকা মহাদেশ	৭৪০/=	৬৭০/=
আমেরিকা মহাদেশঃ	৮৭০/=	৮০০/=

* ভি, পি, পি -যোগে পত্রিকা নিতে চাইলে ৫০% টাকা অগ্রিম পাঠাতে হবে। বছরের যেকোন সময় গ্রাহক হওয়া যায়।
ড্রাফট্ বা চেক পাঠানোর জন্য একাউন্ট নম্বরঃ মাসিক আত-তাহরীক এস, এন, ডি-১১৫, আল-আরাফাহ্ ইসলামী ব্যাংক, সাহেব বাজার শাখা, রাজশাহী, বাংলাদেশ। ফোনঃ ৭৭৫১৬১, ৭৭৫১৭১।

Monthly **AT-TAHREEK**
Chief Editor: Dr.Muhammad Asadullah Al-Ghalib.
Edited by: Muhammad Sakhawat Hossain.
Published by: Hadees Foundation Bangladesh.
Kajla, Rajshahi.Bangladesh.
Yearly subscription at home Regd. Post: Tk. 155/00 & Tk. 80/00 for six months.
Address: Editor, *Monthly* AT-TAHREEK
NAWDAPARA MADRASAH. P.o. SAPURA, RAJSHAHI.
Ph & Fax: (0721) 760525. Ph: (0721) 761378.

মাসিক

بسم الله الرحمن الرحيم

আত-তাহরীক

مجلة "التحريك" الشهرية علمية أدبية و دينية

ধর্ম, সমাজ ও সাহিত্য বিষয়ক গবেষণা পত্রিকা

রেজিঃ নং রাজ ১৬৪

৩য় বর্ষঃ	৪র্থ ও ৫ম যুগ্ম সংখ্যা
রামাযান/শাওয়াল	১৪২০ হিঃ
পৌষ/মাঘ	১৪০৬ বাং
জানুয়ারী/ফেব্রুয়ারী	২০০০ ইং

সম্পাদক মণ্ডলীর সভাপতি
ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব

সম্পাদক
মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন

সার্কুলেশন ম্যানেজার
আবুল কালাম মুহাম্মাদ সাইফুর রহমান

কম্পোজঃ হাদীছ ফাউণ্ডেশন কম্পিউটার্স

যোগাযোগঃ
নির্বাহী সম্পাদক, মাসিক আত-তাহরীক
নওদাপাড়া মাদরাসা, পোঃ সপুরা, রাজশাহী
ফোন ও ফ্যাক্সঃ (০৭২১) ৭৬১৩৭৮।
সম্পাদকমণ্ডলীর সভাপতি ফোন-(বাসা)৭৬০৫২৫

ঢাকাঃ
তাওহীদ ট্রাষ্ট অফিস- ফোন ও ফ্যাক্সঃ ৮৯১৬৭৯২।
আন্দোলন অফিস - ফোনঃ ৯৩৩৮৮৫৯।
যুবসংঘ অফিস - ফোনঃ ৯৫৬৮২৮৯।

হাদিয়াঃ ২০ টাকা মাত্র।

হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ
কর্তৃক, রাজশাহী কর্তৃক প্রকাশিত এবং
দি বেঙ্গল প্রেস, রাণীবাজার, রাজশাহী হ'তে মুদ্রিত।

সূচীপত্র

- সম্পাদকীয় ০২
- দরসে কুরআন ০৩
- দরসে হাদীছ ০৯
- প্রবন্ধ ঃ
  - বাংলাদেশে দারিদ্র্য বিমোচন ও মানব সম্পদ উন্নয়নে যাকাতের ব্যবহার ১২
  - মানফালুতীর ছোট গল্প 'আল-ইক্বাব' -এর আলোকে মিসরীয় সমাজ চিত্র ১৮
  - তোমরা তোমাদের সন্তানদের মাঝে ছালাতের ভালবাসা সৃষ্টি কর ২৪
  - মহানবী (ছাঃ) মানুষ ছিলেন কি-না? ২৬
  - ছালাতের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক মূল্যবোধ ৩১
  - চিন্তা-ভাবনাঃ মুসলিম জীবনে অপরিহার্য কর্তব্য ৩৪
  - ইসলাম প্রতিষ্ঠায় যুবকদের ভূমিকা ৩৬
  - ইসলামী ভ্রাতৃত্ব ৩৮
  - বিশ্বনবী কি ইলমে গায়েব জানতেন? ৪১
  - পর্দা কি শুধু নারীদের জন্য? ৪৫
  - আর্সেনিক দূষণঃ কারণ, প্রতিকার ও প্রতিরোধ ৪৭
  - হজ্জ ও সামাজিক ধারণা ৫০
  - মক্কা-মদীনায় হজ্জ নামে যা দেখেছি ৫২
  - এক নযরে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর হজ্জ ৫৪
- মনীষী চরিতঃ ইবনু হাজার আসক্বালানী (রহঃ) ৫৬
- হাদীছের গল্পঃ কা'ব বিন মালি ক (রাঃ)-এর ঘটনা ৬১
- গল্পের মাধ্যমে জ্ঞানঃ আল্লাহ যা করেন বান্দার মঙ্গলের জন্যই করেন ৬৫
- চিকিৎসা জগৎ ৬৬
- কবিতা ৬৮
- দো'আ ৬৯
- সোনামণিদের পাতা ৭০
- মহিলাদের পাতা ৭৩
- স্বদেশ-বিদেশ ৭৫
- মুসলিম জাহান ৮০
- বিজ্ঞান ও বিস্ময় ৮৩
- জনমত কলাম ৮৪
- সংগঠন সংবাদ ৮৫
- বিশেষ প্রতিবেদন [তাবলীগী ইজতেমা '৮০ হ'তে '৯৮] ৮৯
- প্রশ্নোত্তর ১০৪

বিসমিল্লা-হির রহমা-নির রহীম

قُوْمُوْا إِلَى جَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالأَرْضُ

'এগিয়ে চল তোমরা জান্নাতের পানে, যার প্রশস্ততা আসমান এবং যমীনে পরিব্যপ্ত' (মুসলিম)।

[বদর যুদ্ধে মুসলিম সেনাবাহিনীর প্রতি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নির্দেশ]

সম্পাদকীয়

মুছল্লী না সন্ত্রাসী?

গত ৪ঠা ফেব্রুয়ারী শুক্রবার বাদ জুম'আ খুলনা খালিশপুরে ইমাম পরিষদের ব্যানারে একদল লোক খালিশপুর ১২ নং সড়কের আহলেহাদীছ জামে মসজিদে হামলা করে মসজিদ ও ওযূ খানা ভাংচুর করে এবং পার্শ্ববর্তী মাওলানা আবদুর রঊফ ছাহেবের বাড়ী ও লাইব্রেরীতে হামলা চালিয়ে ব্যাপক ক্ষতিসাধন করে। পবিত্র কুরআনের তাফসীর ও হাদীছ সহ বহু ধর্মীয় গ্রন্থাবলী তারা তছনছ করে। কিছু কেতাব ছিঁড়ে ফেলে। কিছু পার্শ্ববর্তী পুকুরে নিক্ষেপ করে ও কিছু তারা লুট করে নিয়ে যায় বলে জানা যায়। তার পূর্বে তারা জুম'আর ছালাতের পর বিভিন্ন মসজিদ থেকে এসে খালিশপুরে গোলচত্বরে জমায়েত হয় ও পার্শ্ববর্তী খালিশপুর শ্রমিক ময়দানে অনুষ্ঠিতব্য স্থানীয় আহলেহাদীছদের আয়োজিত একটি ওয়ায মাহফিলের মঞ্চ ও প্যাণ্ডেল ভেঙ্গে দেয়। পুলিশ হামলাকারীদের ২৬ জনকে গ্রেফতার করে এবং পরের দিন তাদেরকে ছেড়ে দেয়। মসজিদের সেক্রেটারীর পক্ষ থেকে ৪০ জনের বিরুদ্ধে থানায় অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে বলে জানা গেছে। 'আল্লাহ কি নিরাকার ও সর্বত্র বিরাজমান?' নামক মাওলানা আবদুর রঊফের লেখা ৩২ পৃষ্ঠার একটি পুস্তিকার বিরুদ্ধে স্থানীয় ইমাম পরিষদের ক্ষোভের প্রেক্ষিতে এই হিংসাত্মক ঘটনা ঘটে। বইটি জানু'৯৫-তে প্রথম ও নভে'৯৯-তে পুনরায় প্রকাশিত হয়। পুস্তিকাটি বাজেয়াপ্ত করার জন্য পুলিশ উর্ধতন কর্তৃপক্ষের নিকটে সুপারিশ করেছে বলে খবরে প্রকাশ। পুস্তিকাটির প্রকাশককে পরের দিন পুলিশ গ্রেফতার করেছে বলে জানা গেছে। অথচ দেশে হর-হামেশা ইসলাম বিরোধী ও বিভিন্ন নোংরা বই-পত্রিকা বের হচ্ছে। সেদিকে খেয়াল নেই।

আহলেহাদীছের বিরুদ্ধে খুলনা ইমাম পরিষদের এ হিংসাত্মক আচরণ আজকের নতুন নয়। বিগত ১৯৯৪ সালের ২২শে এপ্রিল তারিখে খুলনা ইমাম পরিষদের নেতাদের প্ররোচনায় কিছু মাদরাসা ছাত্র খুলনা পৌরসভা মিলনায়তনে আয়োজিত 'আহলেহাদীছ যুবসংঘে'র ইসলামী সম্মেলনে হামলা করে। পরে শ্রোতা ও পুলিশের পিটুনী খেয়ে থানায় গিয়ে সম্মেলনে উপস্থিত -অনুপস্থিত পোষ্টারে ঘোষিত বক্তা ও নেতৃবৃন্দের নামে ঢালাওভাবে বিভিন্ন ধারায় মিথ্যা মামলা দায়ের করে। বিচারে বাদীপক্ষের সকল অভিযোগ মিথ্যা প্রমাণিত হয় এবং ২৪.১১.৯৪ তারিখে মামলা খারিজ হয়ে যায়। সেদিনও জালসার শুরুতে তারা হামলা করেছিল। এবারও জালসা শুরুর আগেই ফাঁকা প্যাণ্ডেলে ও ফাঁকা মসজিদে তারা হামলা করেছে। একই ইমাম পরিষদ বর্তমান ঘটনার নায়ক। মাওলানা আবদুর রঊফ ফরিদপুরের গওহরডাঙ্গা মাদরাসার স্বনামধন্য মুহতামিম মরহুম মাওলানা আবদুল আযীয ছাহেবের পুত্র। স্বীয় বুযর্গ পিতার জীবদ্দশায় তিনি জেনে বুঝে আহলেহাদীছ হন এবং তাঁর প্রচারে খালিশপুর ও অন্যান্য স্থানের বহু লোক আহলেহাদীছ হয়েছেন। 'খুলনা ইমাম পরিষদ' নামীয় সংগঠনের আলেমরা তাঁর বিরুদ্ধে প্রথম থেকেই ক্ষুব্ধ। কারণ ধর্মীয় দলীল প্রমাণে তারা কখনোই মাওলানা আবদুর রঊফের মোকাবিলায় টিকতে পারেননি। ফলে স্থানীয় ভক্তদের কাছে এটা তাদের এখন 'প্রেস্টিজ ইস্যু' হ'য়ে দাঁড়িয়েছে। ইমাম পরিষদের সম্মানিত আলেমদেরকে বাগদাদ ধ্বংসের ইতিহাস স্মরণ করিয়ে দিতে চাই। সেদিন শাফেঈদের বিরুদ্ধে হানাফীরা হালাকু খাঁকে ডেকে এনেছিল। ১২৫৮ খৃষ্টাব্দের ১৩ই ফেব্রুয়ারীতে হামলার শুরু থেকে ৪০ দিন পর্যন্ত ব্যাপক হত্যাকাণ্ডে বাগদাদ ও তার আশপাশের শহরে আট হ'তে চল্লিশ লক্ষ মুসলমান নিহত হয়েছিল। কয়েকশত বছর ধরে সঞ্চিত জ্ঞান-বিজ্ঞানের অমূল্য ভাণ্ডার এক সপ্তাহের মধ্যেই তারা দজলার বুকে ডুবিয়ে বিনষ্ট করে দিয়েছিল। ফলে ইসলামের রাজনৈতিক ঐক্য চিরতরে শেষ হয়ে যায়। জ্ঞান-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে মুসলমানদের অগ্রযাত্রা বন্ধ হয়ে যায়। আজও কি আমরা সেই ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি ঘটাতে চাচ্ছি?

আমরা মনে করি একটি স্বাধীন দেশে মানুষের মত প্রকাশের স্বাধীনতা থাকবে। কারু যদি কারু মত পসন্দ না হয়, তাহ'লে তিনি তার পাল্টা মত প্রকাশ করবেন স্বাধীনভাবে। অথবা তার বিরুদ্ধে আপীল করার জন্য দেশের আদালতে যাবেন। সেখানে আইনের ফায়ছালা আসবে। কিন্তু সেপথে না গিয়ে আইন নিজের হাতে তুলে নেওয়া ও অন্যের প্রতি ভয়-ভীতি প্রদর্শন করা, দৈহিকভাবে হামলা ও নির্যাতন করা, তাদের জনসভা পণ্ড করা, সর্বোপরি ইবাদতের স্থান মসজিদ ভাংচুর এবং কুরআন-হাদীছ ও ধর্মীয় কেতাবপত্র তছনছ ও লুট করা নিঃসন্দেহে জঘন্যতম অপরাধ ও মৌলিক মানবাধিকারের সুস্পষ্ট লংঘন। দেশের সংবিধানের রক্ষাকারী হিসাবে পুলিশ ও আদালত জন নিরাপত্তার এ বিষয়গুলি নিশ্চিত করতে না পারলে এদেশ কারু জন্য নিরাপদ এমনকি বাসযোগ্য থাকবে কি-না সন্দেহ। আমরা এই সন্ত্রাসী ঘটনার তীব্র নিন্দা জানাচ্ছি এবং দোষী ব্যক্তিদের আইনানুগ শাস্তির দাবী জানাচ্ছি। দুর্ভাগ্য, বিভিন্ন পত্রিকায় হামলাকারীদেরকে 'মুসল্লী' হিসাবে আখ্যায়িত করা হয়েছে। জানিনা মসজিদে হামলাকারীরা কিভাবে মুছল্লী হয়। বইটি আমরা পড়েছি। বইটিতে নিঃসন্দেহে 'হক' প্রকাশিত হয়েছে এবং পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের সুস্পষ্ট দলীল সমূহ দিয়েই বইটি লিখিত হয়েছে। বইটিতে ইমাম আবু হানীফা (রহঃ)সহ আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের সম্মিলিত আক্বীদা প্রতিফলিত হয়েছে। জানিনা পুলিশ কেন বইটি বাজেয়াপ্ত করার জন্য আগবেড়ে সুপারিশ করতে গেল।

এই সুযোগে এক শ্রেণীর পত্রিকা মাঠে নেমেছে। তারা এই সন্ত্রাসী হামলাকে সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামা এবং ইসলামী আন্দোলনকে 'বিষ নিয়ে নাড়াচাড়া' করার সঙ্গে তুলনা করে পরোক্ষ ভাবে ইসলামের বিরুদ্ধে একচোট নিয়েছেন। সন্ত্রাসী হামলাকারীদের 'ধর্মপ্রাণ' বলে সাফাই গেয়ে তারা নিজেদের মাযহাবী গোঁড়ামী ও আহলেহাদীছ বিদ্বেষকে খোলামেলা করে দিয়েছেন। মূলতঃ এরাও অসাম্প্রদায়িকতার নামে নোংরা সাম্প্রদায়িক। তারা হানাফী ও আহলেহাদীছকে এক কাতারে শামিল করেছেন। তারা জানেন না যে, আহলেহাদীছ প্রচলিত অর্থে কোন ব্যক্তি ভিত্তিক মাযহাবের নাম নয়। এটি একটি আন্দোলন। এ আন্দোলন ধর্মের নামে বিভিন্ন মাযহাব, তরীকা ও পীর-মুরীদীর ভাগাভাগিতে যেমন বিশ্বাসী নয়, তেমনি রাজনীতির নামে জনগণকে বিভিন্ন দলে বিভক্ত করে একে অপরের বিরুদ্ধে লড়াইয়েরও ঘোর বিরোধী। আহলেহাদীছ আন্দোলন মুসলিম উম্মাহকে সকল দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের ভিত্তিতে একক ও ঐক্যবদ্ধ উম্মাহ হিসাবে গড়ে তুলতে চায়। এ আন্দোলন তাই যাবতীয় গোঁড়ামী ও দলাদলির বিরুদ্ধে সর্বদা জনমত গড়ে তুলতে চেষ্টা করে থাকে। সাংবাদিক বন্ধুদেরকে এ আন্দোলন সম্পর্কে আরও পড়া-শোনার আবেদন জানাই। মাওলানা আবদুর রঊফের কোন কোন বক্তব্যের সাথে আমরা একমত নই। কিন্তু আমরা চাই হিংসা ও গোঁড়ামীর অবসান হৌক! উদারতা ও মানবতা জয়লাভ করুক! আল্লাহ আমাদের সহায় হৌন- আমীন! =(সঃ সঃ)।

দরসে কুরআন

জাতীয়তাবাদ

মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِّنْ ذَكَرٍ وَّأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوْبًا وَّقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوْا، إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللهِ أَتْقَاكُمْ ، إِنَّ اللهَ عَلِيْمٌ خَبِيْرٌ ○

১. উচ্চারণঃ ইয়া আইয়ুহান্না-সু ইন্না খালাক্বনা-কুম মিন যাকারিঁউ ওয়া উন্‌ছা, ওয়া জা'আলনা-কুম শু'উবাঁও ওয়া ক্বাবা-এলা লেতা'আ-রাফূ; ইন্না আকরামাকুম 'ইনদাল্লা-হি আৎক্বা-কুম; ইন্নাল্লা-হা 'আলীমুন খাবীর।

২. অনুবাদঃ হে মানবজাতি! আমরা তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছি পুরুষ ও নারী হ'তে এবং তোমাদেরকে বিভিন্ন সম্প্রদায় ও গোত্রে পরিণত করেছি, যাতে তোমরা পরস্পরে পরিচিত হ'তে পার। নিশ্চয়ই তোমাদের মধ্যে সর্বাধিক সম্মানিত ঐ ব্যক্তি যিনি তোমাদের মধ্যে সর্বাধিক আল্লাহ ভীরু'(হুজুরাত ১৩)।

৩. শাব্দিক ব্যাখ্যাঃ

(১) শু'উবাঁও ওয়া ক্বাবা-এলা (شُعُوْبًا وَّ قَبَائِلَ)ঃ 'সম্প্রদায় ও গোত্র সমূহে'। একবচনে الشَّعْبُ অর্থঃ জমা হওয়া। شَعَبْتُهُ اى جَمَعْتُهُ 'আমি তাকে জমা করেছি'। الشِّعْبُ অর্থ 'পাহাড়ের রাস্তা'। যার বহুবচন الشُّعُوْبُ اى الجُمَّاعُ، الشعابُ অর্থঃ বস্তুসমূহের মূল বা জড়। অর্থাৎ বংশের উৎপত্তিস্থল। এর দ্বারা মানুষের বিভিন্ন দলও অর্থ নেওয়া হয়েছে। ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, الشعوب اى الجمهور অর্থাৎ 'জনসাধারণ'। ইবনুল কালবী স্বীয় পিতা হ'তে বর্ণনা করেন যে, الشعب اكبر من القبيلة 'শা'ব' হ'তে 'ক্বাবীলা' বড়। সে কারণ আমরা অর্থ করেছি 'সম্প্রদায় ও গোত্র'। কেননা সম্প্রদায় অনেক বড় জনগোষ্ঠীর নাম, যার মধ্যে বহু গোত্র থাকতে পারে।

(২) লে তা'আ-রাফূ (لِتَعَارَفُوْا)ঃ 'তোমাদের পরস্পরে পরিচয়ের জন্য'। لام كَىْ -এর প্রথমে فعل مضارع আসাতে শেষ হরফ 'নূন' পড়ে গেছে ও حالت نصب হয়েছে। ছীগা جمع مذكر حاضر বাব مفاعلة। এই বাব-এর অর্থগত বৈশিষ্ট্য হ'ল, পরস্পরে কোন কাজ করা।

(৩) আকরামাকুম (أَكْرَمَكُمْ) 'তোমাদের মধ্যে সর্বাধিক সম্মানিত'। اسم تفضيل ছীগা واحدمذكر মাদ্দাহ الكَرَمُ সম্মান, দয়া ইত্যাদি।

(৪) আৎক্বা-কুম (أَتْقَاكُمْ) 'তোমাদের মধ্যে সর্বাধিক আল্লাহভীরু'। اسم تفضيل ছীগা واحدمذكر মাদ্দাহ التقوى 'পরহেযগারী'।

(৫) আলীমুন খাবীরুন (عَلِيْمٌ خَبِيْرٌ) 'সর্বজ্ঞ, সর্বজ্ঞাতা'। فَعِيْلٌ -এর ওযনে مبالغه বা আধিক্য বোধক বিশেষ্য। অর্থাৎ যার জানা শোনার কোন কিছু বাকী থাকে না। আলোতে-আঁধারে, প্রকাশ্যে-নিভৃতে যা কিছুই করা হয়, সবই যার গোচরীভূত, তিনিই আল্লাহ।

৪. শানে নুযূলঃ

উক্ত আয়াতটি নাযিল হওয়ার পিছনে কতগুলি কারণ ও ঘটনা বর্ণিত হয়েছে। যেমন (১) আনছারদের বনু বায়া-যাহ গোত্রের জনৈক গোলাম আবু হিন্দ আব্দুল্লাহ্‌কে উক্ত গোত্রের কোন মহিলার সাথে বিয়ে দেওয়ার জন্য রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাদেরকে বলেন। এতে তারা বলে যে, আমরা আমাদের মেয়েদেরকে আমাদের গোলামদের সাথে বিয়ে দেব? তখন আল্লাহ পাক অত্র আয়াত নাযিল করেন।

যুহরী বলেন যে, আয়াতটি খাছ করে আবু হিন্দের ঘটনায় নাযিল হয়েছে। উল্লেখ্য যে, আবু হিন্দ পেশায় একজন নাপিত ছিলেন। তিনি বদর পরবর্তী সকল যুদ্ধে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর সাথে শরীক ছিলেন। ওমরাহ্‌র সময় রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর মাথা মুণ্ডন করে দেন। রাসূল (ছাঃ) তার দিকে ইঙ্গিত করে বলেন, যে ব্যক্তি এমন কোন ব্যক্তিকে দেখতে চায়, যার অন্তরে আল্লাহ পাক ঈমানকে চিত্রায়িত করে দিয়েছেন, সে যেন আবু হিন্দের দিকে দৃষ্টিপাত করে'।[১]

(২) ছাবিত বিন ক্বায়েস বিন শাম্মাস মজলিসে প্রবেশকালে জনৈক ব্যক্তিকে জায়গা ছেড়ে দেওয়ার নির্দেশ দিয়ে শ্লেষ ভরে বলেন, 'হে অমুক বেটির ছেলে' (يا ابن فلانة)! একথা শুনে রাসূল (ছাঃ) বললেন, কে একথা বলল? ছাবিত বললেন, আমি হে রাসূলুল্লাহ! তখন রাসূল (ছাঃ) উপস্থিত লোকদের দিকে অঙ্গুলির ইশারা দিয়ে ছাবেতকে

১. *আল-ইছাবাহ ইস্তি'আব সহ ৪/২১১, কুরতুবী ১৬/৩৪০; মানহাজুদ্দা'ওয়াহ পৃঃ ২২ হাশিয়া; আবুদাঊদ হা/২১০৩, ঐ, ছহীহ হা/১৮৫০।*

বললেন, কি দেখছ? ছাবেত বললেন, আমি দেখছি সাদা, কালো, লাল ইত্যাদি রংয়ের মানুষজন। রাসূল (ছাঃ) বললেন, এদের মধ্যে কোনই পার্থক্য নেই তাক্বওয়া ব্যতীত'। ঐ সময় অত্র আয়াত নাযিল হয় (কুরতুবী)।

(৩) ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, মক্কা বিজয়ের দিন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বেলালকে আযানের নির্দেশ দেন। তিনি কা'বা গৃহের ছাদে উঠে আযান দেন। তখন আত্তাব বিন আসীদ বিন আবিল 'ঈছ বলেন, 'যাবতীয় প্রশংসা সেই আল্লাহ্র জন্য যিনি আজকের এ দৃশ্য দেখার আগেই আমার আব্বাকে মৃত্যু দান করেছেন'। হারেছ বিন হেশাম নামক অন্য এক ব্যক্তি বলেন, মুহাম্মাদ কি এই কালো কাকটি ছাড়া অন্য কাউকে মুওয়াযযিন হিসাবে পাননি? সুহায়েল বিন আমর বলেন, আল্লাহ যদি চান তবে তাকে পরিবর্তন করুন! আবু সুফিয়ান বলেন, আমি কিছু বলব না। কেননা আমি ভয় পাই যে, সঙ্গে সঙ্গে আসমানের রব তাকে জানিয়ে দেবেন'। অতঃপর জিব্রীল (আঃ) এসে নবী (ছাঃ)-কে সবকিছু জানিয়ে দিলেন। রাসূল (ছাঃ) সবাইকে ডাকলেন ও জিজ্ঞেস করলেন। তারা সকলে সব কথা স্বীকার করলেন। তখন এই আয়াত নাযিল হয়। রাসূল (ছাঃ) তাদেরকে বংশের ও ধন-সম্পদের অহংকার না করার জন্য ও গরীবদের হীন মনে না করার জন্য কঠোরভাবে বলে দেন (কুরতুবী)।

(৪) জনৈক কৃষ্ণকায় ক্রীতদাস মারা গেলে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাকে গোসল ও কাফন-দাফন করান। বিষয়টিকে কিছু লোক খারাবভাবে নেয়। তখন উক্ত আয়াত নাযিল হয়।[২]

উপরোক্ত শানে নুযূল সমূহের কোন একটি ঘটনাকে উপলক্ষ্য করে আয়াতটি নাযিল হ'লেও এর বক্তব্য সকলের জন্য সর্বাবস্থায় উন্মুক্ত। ১১ ও ১২ নং আয়াতে মুমিনদের লক্ষ্য করে বক্তব্য রাখলেও ১৩ নং আয়াতের বক্তব্য মুমিন-মুশরিক সকল মানুষকে উদ্দেশ্য করে রাখা হয়েছে। যা মানুষের বিশ্ব জাতীয়তার প্রতি যেমন ইঙ্গিত করে, তেমনি কুরআনের বিশ্বগ্রন্থ হওয়ারও ইঙ্গিত বহন করে।

আয়াতের ব্যাখ্যাঃ

সূরায়ে হুজুরাতের অত্র আয়াত মানুষের বিশ্ব জাতীয়তার ভিত্তি হিসাবে নাযিল হয়েছে। অত্র আয়াতে মানুষে মানুষে বিভেদ-এর ভেদরেখা ভেঙ্গে চূর্ণ করে দিয়ে সকল মানুষকে এক আদমের সন্তান হিসাবে এক কাতারে দাঁড় করানো হয়েছে। কুরআনের এই বিশ্বধর্মী উদার দৃষ্টিভঙ্গি মানুষকে যেমন এক জাতি হিসাবে পরস্পরে মহব্বতের বন্ধনে আবদ্ধ করে, তেমনি সকলকে একক সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ্র গোলামীতে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার প্রতি ইঙ্গিত করে। সাথে সাথে মানুষকে বিভিন্ন গোত্র ও সম্প্রদায়ে বিভক্ত করার অন্তর্নিহিত কারণ হিসাবে বলা হয়েছে 'লে তা'আ-রাফূ' 'যাতে তোমরা পরস্পরে পরিচিত হ'তে পার'। পরস্পরের পরিচয় পরস্পরের প্রতি সাহায্যে উদ্বুদ্ধ করে। অতঃপর পারস্পরিক সহযোগিতা একটি সহমর্মিতাপূর্ণ বিশ্বসমাজ গড়ায় প্রেরণা যোগায়।

বংশ পরিচয়ের বিভিন্নতা মানুষকে যেন পারস্পরিক অহংকার ও হিংসা-বিদ্বেষে প্ররোচিত না করে, সেজন্য আয়াতের মধ্যেই গোপন ইঙ্গিত রয়েছে। অন্য আয়াতে 'ওয়া লা তাফার্রাকূ' অর্থাৎ বিভক্ত হয়োনা' বলে পরিষ্কার নির্দেশ এসেছে (আলে ইমরান ১০৩)। পারস্পরিক গর্ব ও অহংকারের বশে মানুষে মানুষে বিভক্ত হওয়া ও ভেদাভেদ করা গুরুতর অপরাধ হিসাবে চিহ্নিত করে হাদীছে কঠোরভাবে নিষেধাজ্ঞা এসেছে। বর্ণ, বংশ, অঞ্চল, ভাষা প্রভৃতির মাধ্যমে জাহেলী যুগে পৃথিবীর বিভিন্ন জনপদে যেসব জাতীয়তা গড়ে উঠেছিল, ইসলাম তার বিরুদ্ধে তীব্র ভাষায় প্রতিবাদ করেই কেবল ক্ষান্ত হয়নি। বরং শেষনবী মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ও তাঁর ছাহাবীগণ স্ব স্ব জীবনে তা বাস্তবায়ন করে দেখিয়ে গেছেন। তাই দেখা যায় রাসূল (ছাঃ)-এর ছাহাবীদের মধ্যে কুরায়েশ নেতা আবুবকর ও হাবশী গোলাম বেলাল ভাই ভাই হ'য়ে মিশে গেছেন। মক্কার মুহাজির ও মদীনার আনছারগণ সহোদর ভাইয়ের ভ্রাতৃত্ব বন্ধনকেও হার মানিয়ে দিয়েছেন। পৃথক বংশ ও আঞ্চলিকতা তাঁদেরকে বিভক্ত করতে পারেনি। আবার একই ধর্মের অনুসারী হওয়া সত্ত্বেও ব্যভিচারী পুরুষ বা ব্যভিচারিণী মুসলিম মহিলাকে পাথর মেরে মাথা ফাটিয়ে হত্যা করতেও তাঁরা কুণ্ঠিত হননি। এভাবে আদর্শিক জাতীয়তাবাদের ঝাণ্ডাকে অক্ষুন্ন রেখে মদীনার ইয়াহূদ-নাছারা ও পৌত্তলিকদের সাথে সমাজবদ্ধভাবে বসবাসের জন্য ঐতিহাসিক 'মদীনার সনদ' রচনা করতেও কোন বাধার সৃষ্টি হয়নি।

আধুনিক জাতীয়তাবাদ

একই স্বার্থ ও ভাবধারায় উদ্বুদ্ধ একটি বৃহৎ জনগোষ্ঠীকে একটি জাতি বলে। আর 'জাতি' ভিত্তিক মতবাদকে 'জাতীয়তাবাদ' বলে। যা নির্দিষ্ট একটি জাতির স্বার্থ সংরক্ষণের জন্য তৈরী হয়। জাতীয়তাবাদ প্রাচীন যুগে যে অর্থে ব্যবহৃত হ'ত, আজও সেই অর্থেই ব্যবহৃত হয়। প্রাচীন কালে যে সকল উপাদান দ্বারা জাতি গঠিত হ'ত, আজও সেই সকল উপাদান দিয়ে জাতি গঠিত হ'য়ে থাকে। পার্থক্য কেবল আধুনিক পদ্ধতি ও পরিভাষার। প্রাচীন ও আধুনিক জাতীয়তার মৌলিক উপাদান মূলতঃ ৬টিঃ বংশ,

২. *মানহাজুদ্দা 'ওয়াহ পৃঃ ২১; গৃহীতঃ ওয়াহেদী, আসবাবুন নুযূল ২য় সংস্করণ পৃঃ ২২৪।*

অঞ্চল, ভাষা, বর্ণ, অর্থনৈতিক ঐক্য ও শাসনতান্ত্রিক ঐক্য। বর্ণিত প্রত্যেকটি উপাদানই মানুষের মধ্যে চিরকাল বিদ্যমান আছে এবং তা মানুষকে পরস্পরে ঐক্যবদ্ধ হ'তে উদ্বুদ্ধ করে।

কিন্তু এই সব ঐক্য সংকীর্ণ জাতীয়তার জন্ম দিয়েছে। তা কখনোই বিশ্ব জাতীয়তায় মানুষকে উদ্বুদ্ধ করতে পারেনি। বক্ষকে অন্যের জন্য প্রসারিত করেনি। বরং বলা চলে যে, উপরোক্ত উপাদান সমূহের ভিত্তিতে গঠিত সংকীর্ণ জাতীয়তাবাদ পৃথিবী নামক এই ক্ষুদ্র গ্রহটিকে যার তিন চতুর্থাংশই বিশাল জলধিতে পূর্ণ- অসংখ্য রাষ্ট্রে ভেঙ্গে টুকরা টুকরা করে দিয়েছে। আল্লাহ্‌র যমীনে আল্লাহ্‌র বান্দাদের নির্বিঘ্ন চলাচলকে করেছে বাধাগ্রস্ত। জলে-স্থলে-অন্তরীক্ষে আল্লাহ্‌র সৃষ্ট নে'মত সমূহ ভোগ করা হ'তে বান্দাদের করেছে বিরত ও বাধাহত। ফলে পৃথিবীর একটি অঞ্চলে যখন ঘন বসতির কারণে মানুষের মাথা গোঁজার ঠাই হচ্ছে না, অন্য একটি অঞ্চলে তখন মানুষের অভাবে বিস্তীর্ণ ভূমি বিরান পড়ে থাকছে। ভূমিদাস হিসাবে কিংবা শিল্প শ্রমিক হিসাবে যদিও কিছুদিন অন্যদেশ থেকে কিছু লোককে সাময়িকভাবে সেখানে নেওয়া হচ্ছে। কিন্তু স্বার্থ উদ্ধার হওয়ার সাথে সাথে তাদেরকে স্বদেশে পাঠিয়ে দেওয়া হচ্ছে। আধুনিক রাষ্ট্রীয় জাতীয়তাবাদ এভাবেই স্বাধীন মানুষকে পশুর চাইতে নিকৃষ্ট গোলামে পরিণত করেছে। জাতীয়তাবাদী যুদ্ধের পরিণতিস্বরূপ প্রথিবীর প্রায় সিকি মানুষ এখন উদ্বাস্তু হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। এমনকি একই ধর্ম ও আদর্শের অনুসারী হ'য়েও ভাষাগত পার্থক্যের কারণে বাংলাদেশী মুসলিম সরকার এদেশে অবস্থানরত বিহারী মুসলমানদের গ্রহণ করছেনা। এরাই আবার পাকিস্তানে গিয়ে নিগৃহীত হচ্ছে ভাষা ও ধর্মগত ঐক্য সত্ত্বেও কেবলমাত্র অঞ্চলগত বৈষম্যের কারণে। দক্ষিণ আফ্রিকার সংখ্যাগুরু কালো মানুষগুলো সংখ্যালঘু সাদা চামড়ার ইংরেজদের হাতে মার খেয়ে খেয়ে এই সেদিন মাত্র স্বাধীন হল। এইভাবে সংকীর্ণ জাতীয়তাবাদের নিষ্ঠুর হামলায় বর্তমান পৃথিবী জ্বলছে। জ্বলছে কাশ্মীর, জ্বলছে শ্রীলংকা, জ্বলছে চেচনিয়া, বসনিয়া, কসোভো, সোমালিয়া, ফিলিস্তীনসহ পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চল। তাই আওয়ায উঠেছে একক বিশ্বরাষ্ট্র গড়ার, ভিসামুক্ত পৃথিবী গড়ার। কিন্তু তার ভিত্তি কি হবে?

বিশ্ব জাতীয়তার ভিত্তি

বিশ্ব জাতীয়তার ভিত্তি হবে 'আল-হুব্বু ফিল্লা-হ ওয়াল বুগ্‌যু ফিল্লা-হ' আল্লাহ্‌র জন্য ভালোবাসা ও আল্লাহ্‌র জন্য শত্রুতা'। খুনী, গুণ্ডা, ধর্ষক ও সন্ত্রাসীর সাথে যেমন কোন সমাজ নয়, সৃষ্টিকর্তা ও তার বিধানকে অস্বীকারকারী কাফির-মুশরিক ও মুনাফিকদের সাথে মিলে-মিশে তেমনি **কোন জাতীয়তা নয়**। সুন্দর ও সুশীল সমাজ গড়ার জন্য আল্লাহ ও সমাজ বিরোধী এইসব দুশমনদের বিরুদ্ধে আপোষহীন জিহাদী মনোভাব নিয়েই জাতি গঠনে মনোনিবেশ করতে হবে। সাদা-কালো, আরবী-আজমী, স্বদেশী-বিদেশী, স্বভাষী-ভিনভাষী ইত্যাদি জাহেলী যুগের সংকীর্ণ জাতীয়তাবাদী বিষাক্ত বক্তব্য পরিহার করতে হবে। মদীনার জাতীয়তাবাদী নেতা আবদুল্লাহ বিন উবাই আঞ্চলিকতার দোহাই দিয়ে মক্কা হ'তে আগত রাসূল (ছাঃ) ও মুহাজিরদের বিরুদ্ধে মদীনাবাসীকে ক্ষেপাতে চেষ্টা করেছিল। এমনকি সহায়-সম্বলহীন মুহাজিরদের জন্য কিছুই খরচ করবে না এবং খাযরাজ বংশীয়গণের মাধ্যমে মুহাজির মুসলমানদেরকে মদীনা থেকে বের করে দেবার হুমকি দিয়েছিল। যদিও সে পরে আল্লাহ্‌র কসম খেয়ে তা অস্বীকার করেছিল এবং রাসূল (ছাঃ) তার এই মিথ্যা শপথকে বিশ্বাসও করেছিলেন।[৩]

মোটকথা সকল মানুষ এক আল্লাহ্‌র সৃষ্টি এবং সকল মানুষ এক পিতা-মাতা আদম ও হাওয়ার সন্তান এই মনোভাব সদা জাগ্রত রাখতে হবে। সকল মানব সন্তানকে ভালবাসতে হবে। সকলের জন্য মনের দুয়ার খোলা রাখতে হবে। সৎ ও সততাকে আপন করে নিতে হবে। অসৎ ও অসত্যকে প্রত্যাখ্যান করতে হবে। মানুষে মানুষে পার্থক্য যদি কিছু হয়, তবে তা হবে কেবল তাক্বওয়া ও পরহেযগারীতে, আক্বীদা ও আমলে, বিশ্বাস ও কর্মে। বন্ধুত্ব ও বিচ্ছেদের ভিত্তি হবে স্রেফ তাওহীদ ও নেক আমল, অন্য কিছুই নয়। কেবলমাত্র এপথেই বিশ্ব জাতীয়তা গড়া সম্ভব এবং কেবলমাত্র এভাবেই বিশ্বরাষ্ট্র গড়ার স্বপ্ন বাস্তবায়িত হওয়া সম্ভব। হয়তবা এভাবেই একদিন বিশ্বনেতারা বাধ্য হবেন ভিসামুক্ত ও বাধাহীন উন্মুক্ত বিশ্বরাষ্ট্র গড়তে। কারু পক্ষে সম্ভব না হ'লে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী মেহদী (আঃ)-এর আগমনের পরে নিশ্চিতভাবে সে সুন্দর ও সুশীল বিশ্বব্যবস্থা একদিন অবশ্যই কায়েম হবে বলে মুসলিম উম্মাহ বিশ্বাস পোষণ করে থাকে।[৪]

জাতীয়তাবাদঃ ইসলামী হেদায়াত

উপরে বর্ণিত বিশ্বজাতীয়তাবাদই মূলতঃ ইসলামী জাতীয়তাবাদ। উক্ত মানবিক জাতীয়তাবাদ প্রতিষ্ঠার জন্যই ইসলাম দুনিয়াতে এসেছিল এবং মানুষে মানুষে সংকীর্ণ জাতীয়তাবাদী চেতনা সমূহের মূলে কুঠারাঘাত করে কুরাইশ-অকুরাইশ, মুহাজির-আনছার, সাদা-কালো, আরবী-আজমী সকল ভাষা, বর্ণ, বংশ ও অঞ্চলের মানুষকে এক জাতীয়তায় শামিল করতে সমর্থ হয়েছিল। উক্ত উদার জাতীয়তার ভিত্তিতেই অর্ধ জাহান ব্যাপী ইসলামী খেলাফত

৩. বুখারী, কুরতুবী ১৮/১২০-২১; মুনাফিকূন ৭-৮।
৪. আবুদাঊদ, মিশকাত হা/৫৪৫৩-৫৫; থিসিস পৃঃ ১২৩।

বা রাষ্ট্রব্যবস্থা কায়েম হয়েছিল। পরবর্তীকালে ইয়াহূদ-নাছারা পাশ্চাত্য পণ্ডিতদের উস্কে দেওয়া সংকীর্ণ জাতীয়তাবাদী চিন্তাধারার অনুপ্রবেশের ফলে বিংশ শতাব্দীর প্রথমদিকে এসে কামাল পাশার মাধ্যমে ১৯২৪ সালে তুরস্ক থেকে মুসলিম খেলাফতের নিবু নিবু শেষ রশ্মিটুকু নিভিয়ে দেওয়া হয়।

একই রাষ্ট্রের মধ্যে যেমন একাধিক রাষ্ট্রের অস্তিত্ব সম্ভব নয়। তেমনি একই ইসলামী জাতীয়তার মধ্যে বর্ণ, বংশ, গোত্র, অঞ্চল ও ভাষা ভিত্তিক জাতীয়তার অস্তিত্ব থাকা সম্ভব নয়। কিন্তু দুর্ভাগ্য এই যে, পরবর্তীকালে তাই হ'ল এবং সংকীর্ণ জাতীয়তাবাদী চিন্তাধারার বোমা মুসলিম খেলাফতকে ভেঙ্গে টুকরা টুকরা করে বর্তমানে অন্যূন ৫৫টি মুসলিম রাষ্ট্রে বিভক্ত করে দিয়েছে। যা মুসলিম উম্মাহকে ক্রমে দুর্বল থেকে দুর্বলতর করে দিচ্ছে।

বাঙ্গালী ও বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদ

বাঙ্গালী ও বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদ মূলতঃ একই ইসলাম বিরোধী চিন্তাধারা থেকে উৎসারিত। পার্থক্য এতটুকু যে, বাঙ্গালী হ'ল ভাষাভিত্তিক জাতীয়তাবাদ। যা হিন্দু-মুসলিম দ্বিজাতিতত্ত্বের ভিত্তিতে সৃষ্ট পূর্ব-পাকিস্তানী ভূখণ্ড, যা বর্তমানে স্বাধীন বাংলাদেশ নামে পরিচিত, তাকে পশ্চিমবঙ্গের বাঙ্গালীদের সঙ্গে মিলিয়ে বৃহৎ ভারত রাষ্ট্রের সাথে একীভূত হ'তে উদ্বুদ্ধ করে। পক্ষান্তরে বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদ হ'ল অঞ্চলভিত্তিক জাতীয়তাবাদ। যা বাংলাদেশ -এর ভূখণ্ডগত জাতীয়তাকে স্বাধীন ও অক্ষুন্ন রাখতে উদ্বুদ্ধ করে। কিন্তু ইসলামী জাতীয়তাবাদ বাংলাদেশ ও ভারত তথা মানবসৃষ্ট যেকোন রাষ্ট্রীয় সীমানা পেরিয়ে বিশ্বের তাবৎ আল্লাহভীরু সৎ মানুষকে বিশ্ব জাতীয়তা গঠনে উদ্বুদ্ধ করে। ইসলামের দৃষ্টিতে বাঙ্গালী খুনী ও বাংলাদেশী খুনীতে কোন পার্থক্য নেই। তাই বাংলাদেশকে টিকে থাকতে গেলে কেবলমাত্র ভূখণ্ডগত জাতীয়তাবাদের অন্ধ আবেগ সৃষ্টি করলেই চলবে না বরং তাকে ইসলামী জাতীয়তায় উদ্বুদ্ধ হ'তে হবে এবং ধর্ম-বর্ণ-অঞ্চল নির্বিশেষে দেশের সকল সুনাগরিকের সকল প্রকারের স্বাধীনতা ও নিরাপত্তার নিশ্চয়তা বিধানে এগিয়ে আসতে হবে। সাথে সাথে সকল সমাজ বিরোধী অপশক্তিকে কঠোর হস্তে দমন করার জন্য রাষ্ট্রকে সর্বশক্তি নিয়ে এগিয়ে আসতে হবে। নইলে 'দুষ্টের লালন ও শিষ্টের দমন নীতি' যা এখন সমাজে ব্যাপকতা লাভ করেছে এবং প্রতিবেশী রাষ্ট্রের গোপন ইন্ধন প্রতিনিয়ত যেভাবে দুষ্টদেরকে প্ররোচিত করছে, তাতে একদিন গোটা রাষ্ট্রশক্তিকে এরা চ্যালেঞ্জ করবে, একথা বিশ্বাস করার যথেষ্ট কারণ রয়েছে। পার্শ্ববর্তী ক্ষুদ্র দ্বীপরাষ্ট্র শ্রীলংকা তার একটি বাস্তব উদাহরণ।

রাষ্ট্রীয় জাতীয়তা বনাম ইসলামী জাতীয়তা

বর্তমানে জাতি ও জাতীয়তা শব্দটি ইংরেজী Nation ও Nationality-এর প্রতিশব্দ হিসাবে ব্যবহৃত হচ্ছে। আরবীতে বলা হয় القوم والقومية । বর্তমানে الجنس والجنسية । যার সার কথা হ'লঃ একটি রাষ্ট্রীয় ভূখণ্ডে বসবাসরত বিভিন্ন ধর্ম, বর্ণ ও ভাষার মানুষ একটি জাতি হিসাবে গণ্য হবে।

উক্ত বক্তব্যের পক্ষে অনেকে 'মদীনার সনদ'-কে দলীল হিসাবে পেশ করতে চান। যদিও দু'তিন বছরের মধ্যেই সে চুক্তির সমাধি রচিত হয়েছিল। মদীনার উক্ত চুক্তি ছিল মূলতঃ একটি পারস্পরিক মৈত্রী চুক্তি। যেখানে বলা হয়েছিল যে, ইহুদী, নাছারা, পৌত্তলিক, মুসলমান সকলে স্ব স্ব ধর্মবিশ্বাস ও কর্মে স্বাধীন থাকবে। তবে বহিঃশত্রুর হামলার সময় তারা একে অপরকে সাহায্য করবে। বিচার কার্যের ক্ষেত্রে আল্লাহ্র বিধান অনুযায়ী রাসূল (ছাঃ)-এর দেওয়া সিদ্ধান্তকে সকলে মেনে নিবে'। সেখানে সংখ্যাগুরু ইহুদীদের ধর্মীয় বিধান অনুযায়ী সমাজ পরিচালনার কথা বলা হয়নি, যেভাবে আজকের গণতান্ত্রিক বিধানে বলা হয়ে থাকে। কিংবা কোন সর্বদলীয় যুক্তফ্রন্টও গঠিত হয়নি। তারা এক রাষ্ট্র বা একজাতি বলেও পরিচিত হননি। তাই ভারতীয় স্বাধীনতা আন্দোলনের সময় কংগ্রেসী আলেমদের আনীত উক্তরূপ যুক্তি সমূহ ইসলামী জাতীয়তার উদার দৃষ্টি ভংগীতে বিন্দুমাত্র রেখাপাত করতে পারেনি। মোট কথা মদীনার সন্ধি চুক্তি ও বর্তমানকালের স্বাদেশিকতা বা রাষ্ট্রীয় জাতীয়তাবাদের মধ্যে কোন দূরতম সাদৃশ্যও নেই। বরং হিন্দু-মুসলমানকে একজাতি বানিয়ে ভারতীয় মুসলিম রাজশক্তিকে সংখ্যাগুরু হিন্দুদের অধীনস্ত করে ইসলাম ও মুসলমানকে ধ্বংস করার দূরদর্শী পাশ্চাত্য নীল নকশার বাস্তবায়নকে 'মদীনার সনদে'র অনুকরণ বলে চালিয়ে দেওয়া রীতিমত একটি ধোকাবাজি বৈ কিছুই নয়। রাষ্ট্রীয় জাতীয়তাবাদে সংখ্যাগরিষ্ঠতার নামে দল বা দলীয় প্রধানের মতামতকে জনগণের উপরে চাপিয়ে দেওয়া হয়। আল্লাহ প্রেরিত সত্য বিধানের কোন মূল্য সেখানে নেই। তাই আধুনিক রাষ্ট্রীয় জাতীয়তাবাদের সাথে ইসলামী জাতীয়তাবাদের কোন সম্পর্ক নেই।

ধর্মীয় জাতীয়তাবাদ বনাম পাশ্চাত্য জাতীয়তাবাদ

বিগত যুগে খৃষ্টানী জাতীয়তাবাদ যেমন মুসলমানদের বিরুদ্ধে প্রায় দু'শো বছর (১০৯৫-১২৯১ খৃঃ) ব্যাপী ক্রুসেড-এর জন্ম দিয়েছিল। বর্তমান যুগে তেমনি ইহুদী জাতীয়তাবাদ ফিলিস্তীনী মুসলমানদেরকে তাদের নিজ ভূখণ্ড থেকে উৎখাত করেছে ও বিগত ৫২ বছর যাবত

তাদেরকে প্রতিনিয়ত হত্যা করে চলেছে। অনুরূপভাবে আধুনিক খৃষ্টানী জাতীয়তাবাদ বসনিয়া, সোমালিয়া, কসোভোতে মুসলিম নিধন যজ্ঞে মেতেছে। ভারতীয় হিন্দু জাতীয়তাবাদ সংখ্যাগরিষ্ট কাশ্মীরী মুসলিম জনগণকে বিগত ৫২ বছর ধরে নিষ্পিষ্ট ও নিশ্চিহ্ন করায় মত্ত রয়েছে। সংখ্যালঘু মুসলমানদের মসজিদ সমূহ ধ্বংস করছে। তাদের উপরে সর্বত্র নিষ্ঠুরতা অব্যাহত রেখেছে। এমনকি উচ্চ বর্ণের হিন্দুদের অত্যাচারে নিম্নবর্ণের হিন্দু ও শিখেরা প্রতিনিয়ত নির্যাতিত ও নিগৃহীত হচ্ছে। নিপীড়িত হচ্ছে পশ্চিমবঙ্গ ও আসামের মুসলমানেরা। শুধু তাই নয় পুশইন ও পুশব্যাক-এর শিকার হ'য়ে বাঙ্গালী মুসলমানেরা ভারতীয় সীমান্তরক্ষীদের নিষ্ঠুর নির্যাতনের শিকার হচ্ছে অহরহ। এমনকি সীমান্ত পেরিয়ে এসে তারা বাংলাদেশ ভূখণ্ডের মুসলমানদের হত্যা করছে ও তাদের সম্পদ লুণ্ঠন করছে। বর্তমানে হিন্দু জাতীয়তাবাদীরা তাদের দেশের সংখ্যালঘু খৃষ্টানদের উপরেও হামলা শুরু করেছে।

মানব রচিত হিন্দুধর্ম ও ইহুদী-খৃষ্টানদের বিকৃত ধর্ম আসলে কোন ধর্মই নয়। আল্লাহ প্রেরিত সর্বশেষ এলাহী ধর্ম 'ইসলাম' আগমনের পরে বিগত সকল ধর্ম রহিত হয়ে গেছে। একমাত্র ইসলামের মধ্যেই বিশ্বপরিচালনার বিধান ও নীতিমালা বিধৃত রয়েছে। ইসলাম তাই বিশ্বধর্ম এবং সেকারণেই ইসলামী জাতীয়তাবাদ হ'ল বিশ্ব জাতীয়তাবাদ, যা অন্য কোন ধর্মের সাথে তুলনীয় নয়।

পক্ষান্তরে পাশ্চাত্য জাতীয়তাবাদ ধর্মহীন বস্তুবাদের উপরে প্রতিষ্ঠিত। সংকীর্ণ দুনিয়াবী স্বার্থের নিরিখে এই জাতীয়তাবাদ রচিত হয়েছে এবং সেভাবেই সারা বিশ্বকে টুকরো টুকরো করে শোষণ ও লুণ্ঠন করে যাচ্ছে। এই জাতীয়তাবাদ ধার্মিক-অধার্মিক, মুমিন-কাফির সকলকে এক জাতিতে পরিণত করেছে। ইসলামের সাথে যার কোন প্রকার সামঞ্জস্য নেই।

বিভাগ-পূর্ব ভারতে হিন্দু জাতীয়তাবাদীদের বিপরীতে মুসলমানদের মধ্যে দু'ধরণের জাতীয়তাবাদের প্রাদুর্ভাব ঘটেছিল। ১- জাতীয়তাবাদী মুসলিম ২- মুসলিম জাতীয়তাবাদী।

প্রথমোক্তগণ ভারতে সকল ধর্ম ও সংস্কৃতির মানুষের মিশ্র জাতীয়তায় বিশ্বাসী ছিলেন। এরা কংগ্রেসী রাজনীতির সাথে যুক্ত ছিলেন। দ্বিতীয় মতের লোকেরা কেবল মুসলিম হওয়ার কারণে নিজেদের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক স্বাতন্ত্র্যে বিশ্বাসী ছিলেন। যদিও ইসলামী নীতি-আদর্শ ও ইসলামী জাতীয়তা সম্পর্কে তাদের তেমন কোন ধ্যান-ধারণা ছিল না। ফলে হিন্দু জাতীয়তাবাদীগণ যেমন ক্ষমতার আসনে কোন হিন্দুর নাম শুনলে খুশী হয়, মুসলিম জাতীয়তাবাদীগণও তেমনি ক্ষমতায় কোন মুসলমানকে দেখলে খুশী হয়। তার কাজকর্ম একজন অমুসলমানের কাজকর্মের অনুরূপ কিংবা তার চাইতে মন্দ হ'লেও আপত্তি নেই। এই ধরণের চিন্তাধারা ইসলামের মূল আদর্শিক চিন্তাধারা হ'তে অনেক দূরের। যা অবশ্যই পরিত্যাজ্য। বলা বাহুল্য আজও বাংলাদেশ ও ভারতে এধরণের চিন্তাধারার লোকের কোনই অভাব নেই। যারা কেবল নাম নিয়েই সন্তুষ্ট থাকতে চান। আদর্শ চেতনা তাদের উপরে কোনই প্রভাব ফেলতে পারে না।

জাতীয়তাবাদের পরিণতি

(১) জাতীয়তাবাদেরপরিণতিতে একজাতির মানুষ আরেক জাতির মানুষের শত্রু হিসাবে গণ্য হয়। (২) নিজেদের মধ্যে বড়ত্বের অহংকার মাথাচাড়া দেয়। বংশ, বর্ণ, ভাষা, আঞ্চলিকতা ও স্বাদেশিকতার অহমিকায় মানুষ অন্ধ হয়ে যায়। গ্রীক বিজ্ঞানী এরিষ্টটলের মত বিশ্ববিখ্যাত চিন্তাবিদও এই অহমিকাবোধ এড়াতে পারেননি। গ্রীকরা অগ্রীকদের 'বর্বর' বলে মনে করত। এরিষ্টটলও স্বীয় Politics গ্রন্থে একইরূপ মত প্রকাশ করে বলেন, 'অসভ্য ও বর্বর জাতিগুলি গোলামী করার জন্যই সৃষ্টি হয়েছে'। তাঁর মতে 'এইসব লোকদের গোলাম বানাবার জন্য যুদ্ধ করা অর্থোপার্জনের অন্যতম উপায়'।[৫] হিন্দু জাতীয়তাবাদী বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরও স্বীয় কাব্যের মধ্যে মুসলমানকে লক্ষ্য করে 'যবন ম্লেচ্ছ' বলে গালি দিয়ে মনের ঝাল মিটিয়েছেন।[৬] কারণ এই মানুষগুলি স্ব স্ব ক্ষেত্রে বিশ্বের অন্যতম সেরা ব্যক্তিত্ব হ'লেও তাঁদের সম্মুখে উন্নততর কোন এলাহী আদর্শ ছিল না। যা কেবলমাত্র ইসলামের কাছে রয়েছে। অন্য কোথাও নেই।

উপরোক্ত পরিণতি বর্তমানে মুসলিম সমাজেও পরিদৃষ্ট হচ্ছে। আরবরা এখন 'আরব জাতীয়তাবাদ'-এর গুণগান করতে শুরু করেছে। মিশরীয়গণ ফেরাঊনকে তাদের 'জাতীয় বীর' আখ্যায়িত করছে। তুরস্কবাসীরা বাগদাদের খেলাফত ধ্বংসকারী হালাকু খাঁনের সাথে নিজেদের আত্মীয়তা অনুভব করছে। ইরানীরা কাদেসিয়ার যুদ্ধে কাফের বাহিনীর নেতৃত্ব দানকারী রুস্তমকে ও এসফানদিয়ারকে 'জাতীয় বীর' ভাবতে শুরু করেছে। এসবই যে সংকীর্ণ জাতীয়তাবাদের দুঃখজনক পরিণতি তা বলার অপেক্ষা রাখে না।

পারস্পরিক সম্পর্কনীতি

অমুসলিমদের সাথে ইসলামী আদর্শবাদীদের সম্পর্কের দু'টি দিক রয়েছে। ১- মানুষ হিসাবে মুসলিম-অমুসলিম সকলেই সমান। সেকারণ মুসলমানগণ অমুসলমানদের সাথে

৫. মওলানা মওদূদী, ইসলাম ও জাতীয়তাবাদ পৃঃ ৮১।
৬. হিং টিং ছট কবিতা, সোনার তরী পৃঃ ২৫-৩৩।

যাবতীয় মানবিক সম্পর্ক বজায় রেখে চলবে। অমুসলমানদের ধর্ম বিশ্বাস ও ধর্মীয় কাজকর্মের ব্যাপারে কোনরূপ হস্তক্ষেপ করবেনা। তাদের সাথে সর্বদা উদার ও সহানুভূতিশীল আচরণ করবে। যতক্ষণ না তারা ইসলামের সাথে দুশমনী করে।

২- ঈমান ও কুফরের সম্পর্কের কারণে মুসলমানগণ অমুসলমানদের থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র আদর্শের অনুসারী একটি পৃথক জাতি। ফলে অন্যান্য জাতীয়তা যখন বর্ণ, বংশ, ভাষা, অঞ্চল প্রভৃতির উপরে ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে, ইসলামী জাতীয়তা তখন স্রেফ ঈমানের উপরে জাতীয়তার ভিত্তি স্থাপন করেছে। যা প্রচলিত জাতীয়তা সমূহের সংকীর্ণ সীমানা পেরিয়ে বিশ্বের সকল প্রান্তের ঈমানদারগণকে একসূত্রে গেঁথে ফেলতে সমর্থ হয়েছে। এমনকি এই ঈমানী সম্পর্কের বিনিময়ে সে অন্য যাবতীয় সম্পর্ক ছিন্ন করতেও দ্বিধাবোধ করেনা।[৭]

ইসলাম ও জাতীয়তাবাদ

ইসলাম ও প্রচলিত জাতীয়তাবাদের মধ্যে মৌলিক পার্থক্য এই যে, ইসলাম বিশ্ব মানবতাকে ঈমানের বন্ধনে আবদ্ধ করে জীবনের সর্বক্ষেত্রে পরস্পরের সহমর্মী ও সহযোগীতে পরিণত করতে চায়। পক্ষান্তরে প্রচলিত জাতীয়তাবাদ বংশীয়, গোত্রীয়, ভাষা ও আঞ্চলিক তথা ভৌগলিক বৈষম্যের ক্ষুরধার তরবারি দ্বারা সকল মানবিক সম্পর্ক ছিন্নভিন্ন করে দেয় এবং হিংসা ও বিদ্বেষ সৃষ্টি করে মানব জাতিকে পরস্পরের শত্রু ও প্রতিদ্বন্দ্বীতে পরিণত করে।

মোটকথা আদম সন্তানের পরস্পরের মধ্যে স্বাধীন ও কল্যাণময় সম্পর্ক স্থাপনে উদার অবকাশ সৃষ্টি করাই ইসলামী জাতীয়তাবাদের মূল লক্ষ্য। কেননা মানব সভ্যতার ক্রমবিকাশ ও প্রতিষ্ঠালাভ মানুষের পারস্পরিক ভালোবাসা ও দৃঢ় সম্পর্কের উপরেই নির্ভর করে। কিন্তু প্রচলিত জাতীয়তাবাদ এই উদার ও মানবিক সম্পর্ক স্থাপনে প্রবল বাধার সৃষ্টি করে। ফলে এক জাতির প্রভাবিত এলাকায় অন্য জাতির প্রবেশাধিকার নিষিদ্ধ হয়। অথবা সেখানে বসবাস করা অসম্ভব হ'য়ে পড়ে।

ইসলামের দৃষ্টিতে বিশ্ব জাতীয়তা

বর্তমান বিশ্বের প্রায় ৫০০০ ভাষা ও ২৫৯টি ধর্মের মানুষকে কিভাবে এক জাতিতে পরিণত করা যাবে? এছাড়াও রয়েছে বিভিন্ন অঞ্চল ও ভূভাগগত পার্থক্য। ইসলাম তার সমাধান দিয়েছে এভাবে-

প্রথমতঃ সকল মানুষকে এক আদমের সন্তান হিসাবে চিন্তা করতে হবে। দ্বিতীয়তঃ মাটির তৈরী আদমের সন্তান হিসাবে যাবতীয় গর্ব-অহংকার থেকে দূরে থাকতে হবে এবং মানুষ হিসাবে সকলের সমানাধিকারে বিশ্বাস রাখতে হবে। তৃতীয়তঃ মানুষের সৃষ্টিকর্তা হিসাবে আল্লাহকে স্বীকার করতে হবে। চতুর্থতঃ নিজেদেরকে আল্লাহ্র গোলাম হিসাবে ভাবতে হবে। পঞ্চমতঃ নিরপেক্ষ আইন হিসাবে আল্লাহ প্রেরিত সর্বশেষ অহি-র বিধানকে সকল মানুষের জন্য সমভাবে প্রযোজ্য শরীয়ত হিসাবে গ্রহণ করতে হবে। ষষ্ঠতঃ উত্তম-অনুত্তমের মানদণ্ড হবে স্রেফ তাক্বওয়া বা আল্লাহভীতি। রক্ত, বর্ণ, ভাষা, অঞ্চল, সম্পদ বা পদমর্যাদা নয়।

আবুদাউদ ও তিরমিযী ইবনু ওমর (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন যে, মক্কা বিজয়ের দিন উটনীর পিঠে সওয়ার হ'য়ে ত্বাওয়াফ করার সময় দাঁড়িয়ে জনগণের উদ্দেশ্যে ভাষণ দিতে গিয়ে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'হে জনগণ! আল্লাহ পাক তোমাদের মধ্য থেকে জাহেলী যুগের গর্বসমূহ এবং পিতৃবংশের বড়াই ও আভিজাত্যের অহংকার দূরীভূত করেছেন। এক্ষণে মানুষ কেবল দু'জনঃ নেককার ও বদকার فالناسُ رَجُلانِ: رجلٌ برٌّ تقىٌّ .. وفاجرٌ شقىٌّ । তবে ছহীহ বর্ণনায় এসেছে مؤمن تقىّ وفاجر شقىّ، أنتم بنو آدم وآدم من تراب 'মুমিন পরহেযগার ও বদমাশ বদকার। তোমরা সবাই আদমের সন্তান এবং আদম হ'লেন মাটির তৈরী'। অতঃপর তিনি অত্র আয়াতটি পাঠ করে শুনান।[৮]

ইসলামের দৃষ্টিতে মানুষের ভাষা ও বর্ণের প্রার্থক্য আল্লাহ্র সৃষ্টিকৌশলের অন্যতম নিদর্শন মাত্র। গর্ব বা অহংকারের বস্তু নয়। যেমন আল্লাহ বলেন,

وَمِنْ ايٰتِهٖ خَلْقُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَ أَلْوَانِكُمْ، إِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَأيَاتٍ لِّلْعَالِمِيْنَ O

'তাঁর অন্যতম নিদর্শন হ'ল নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের সৃষ্টি এবং তোমাদের ভাষা ও বর্ণের বৈচিত্র্য। নিশ্চয়ই এতে জ্ঞানীদের জন্য নিদর্শনসমূহ রয়েছে' (রূম ২২)।

আবু নাযরাহ (রাঃ) প্রত্যক্ষদর্শীদের বরাত দিয়ে বলেন যে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বিদায় হজ্জের সময় আইয়ামে তাশরীক্বের মধ্যে মিনা প্রান্তরে উটের পিঠে দাঁড়িয়ে জনগণের উদ্দেশ্যে ভাষণ দিতে গিয়ে বলেন,

يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَلاَ إِنَّ رَبَّكُمْ وَاحِدٌ، لاَ فَضْلَ لِعَرَبِىٍّ عَلَى عَجَمِىٍّ وَلاَ لِعَجَمِىٍّ عَلَى عَرَبِىٍّ وَلاَ لِأَسْوَدَ عَلَى أَحْمَرَ وَلاَ لِأَحْمَرَ عَلَى أَسْوَدَ إِلاَّ بِالتَّقْوَى، إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ أَتْقَاكُمْ ، أَلاَ هَلْ بَلَّغْتُ؟ قَالُوا: بَلَى يَا رَسُولَ اللّٰهِ، قَالَ فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ O

'হে জনগণ! হুঁশিয়ার হও! তোমাদের প্রভু মাত্র একজন। তোমাদের পিতাও একজন। সাবধান হও! আরবীয়ের জন্য আজমীর উপরে কোন প্রাধান্য নেই। আজমীর জন্য আরবীয়ের উপরে কোন প্রাধান্য নেই। কালোর উপরে

৭. *মুমতাহিনা ৪; মুজাদালাহ ২২।*

৮. *কুরতুবী, ইবনু কাছীর, মানহাজুদ্দা'ওয়াহ পৃঃ ১২৯।*

লালের বা লালের উপরে কালোর কোন প্রাধান্য নেই, তাক্বওয়া ব্যতীত। নিশ্চয়ই আল্লাহ্র নিকটে তোমাদের মধ্যে সর্বাধিক সম্মানিত সেই ব্যক্তি, যিনি সর্বাধিক আল্লাহ ভীরু। হে জনগণ! আমি কি পৌঁছে দিয়েছি? লোকেরা বলল, হাঁ। রাসূল (ছাঃ) বললেন, উপস্থিতগণ অনুপস্থিত গণের নিকটে পৌঁছে দিয়ো'।[৯]

আবু হুরায়রাহ (রাঃ) হ'তে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, إِنَّ اللهَ لاَ يَنْظُرُ إِلَى صُوَرِكُمْ وَ أَمْوَالِكُمْ وَلَكِنْ يَّنْظُرُ إِلَى قُلُوْبِكُمْ وَ أَعْمَالِكُمْ 'নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদের চেহারা ও মাল-সম্পদ দেখবেন না। তিনি দেখবেন তোমাদের অন্তর ও আমল সমূহ'।[১০]

আলী (রাঃ) হ'তে উপরোক্ত মর্মে লিখিত প্রসিদ্ধ কবিতা নিম্নরূপঃ

النا سُ من جِهَةِ التمثال أكفاءُ + ابوهم آدم والأم حواء

نفس كنفس وأرواح مشاكلة + وأعظمٌ خُلِقَتْ فيهم وأعضاء

فإن يكن لهم فى أصلهم حسبٌ + يفاخرون به فالطين والماء

অর্থাৎ আকৃতির দিক দিয়ে সকল মানুষ সমান। তাদের সকলের পিতা আদম ও মাতা হাওয়া। একটি প্রাণ আরেকটি প্রাণের ন্যায় এবং আত্মাগুলি পরস্পরে সামঞ্জস্যশীল। তার মধ্যে কেবল হাড়-গোড় ও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সৃষ্টি করা হয়েছে মাত্র। যদি মৌলিকভাবে তাদের মধ্যে গর্ব করার মত কিছু থাকে, তবে তা হ'ল মাটি ও পানি' (কুরতুবী)।

অতএব আসুন! প্রচলিত জাতীয়তাবাদের সংকীর্ণ গণ্ডী পেরিয়ে ইসলামী আদর্শের ভিত্তিতে বিশ্বজাতীয়তা প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে আত্মনিয়োগ করি। আল্লাহ আমাদের সহায় হৌন- আমীন!

৯. *ইবনু জারীর, আহমাদ ৫/৪১১, কুরতুবী ১৬/৩৪২; মানহাজুদ্দা 'ওয়াহ পৃঃ ১৭৭।*
১০. *মুসলিম, ইবনু কাছীর ৪/২৩২।*

بسم الله الرحمن الرحيم
মানিক জুয়েলার্স
সর্বাধুনিক অলঙ্কার বিতান
হোটেল মুক্তার নিচতলায়
মালোপাড়া, পোঃ ঘোড়ামারা, রাজশাহী
ফোনঃ ৭৭২৭৫০।

দরসে হাদীছ

কথা ও কাজ

-মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব

عن أُسامةَ بْنِ زيدٍ قال قال رسول اللّه صلى اللّه عليه و سلم: يُجاءُ بالرجلِ يومَ القيامةِ فيُلقى فى النارِ ، فتندلِقُ أقتابُهُ فى النار ، فيُطحَنُ فيها كطحنِ الحمارِ برحاه ، فيجتمعُ أهلُ النار عليه فيقولون : أىْ فلانُ ! ماشأنُك ؟ أليس كنتَ تأمرُنَا بالمعروف وتنهانا عن المنكرِ؟ قال : كنتُ آمُرُكم بالمعروف ولا آتيْهِ ، وأنهاكم عن المنكرِ وآتيْهِ ، متفق عليه –

অনুবাদঃ উসামা বিন যায়েদ (রাঃ) হ'তে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এরশাদ করেন যে, ক্বিয়ামতের দিন জনৈক ব্যক্তিকে আনা হবে। অতঃপর তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে। আগুনে তার নাড়ীভুঁড়ি বেরিয়ে যাবে। তখন সে ঐ নাড়ীভুঁড়ির চারদিকে ঘুরতে থাকবে। যেমনভাবে গাধা ঘানির চারদিকে ঘুরে থাকে। এই অবস্থা দেখে জাহান্নাম বাসীরা তার চারপাশে জড়ো হবে ও তাকে লক্ষ্য করে বলবেঃ হে অমুক! তোমার একি অবস্থা? তুমি না সর্বদা আমাদেরকে ভাল কাজের উপদেশ দিতে ও মন্দ কাজ থেকে নিষেধ করতে? তখন লোকটি জওয়াবে বলবেঃ আমি তোমাদেরকে ভাল কাজের আদেশ করতাম। কিন্তু নিজে তা করতাম না। আমি তোমাদেরকে মন্দ কাজ থেকে নিষেধ করতাম। কিন্তু আমি নিজেই সে কাজ করতাম'।[১]

হাদীছের ব্যাখ্যাঃ

হাদীছটিতে মুসলিম উম্মাহ্র ব্যক্তিগত, পারিবারিক ও সামাজিক জীবনের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক নির্দেশনা রয়েছে। হাদীছটি সকলের জন্য সর্বাবস্থায় প্রযোজ্য হ'লেও বিশেষভাবে সমাজের বিভিন্ন স্তরে নেতৃত্ব দানকারীদের জন্য সুনির্দিষ্ট হেদায়াত রয়েছে। কারণ সমাজের ভাঙ্গা ও গড়া অনেকাংশে নির্ভর করে সমাজ নেতাদের উপরে। কিন্তু যে সমাজে অসৎ ও মুনাফিক নেতৃত্ব রয়েছে, সে সমাজ অপেক্ষাকৃত মন্দ ও দুষ্কৃতিপরায়ণ। আর নেতাদের দুষ্কৃতির কারণেই পুরা সমাজের উপরে আল্লাহ্র গযব নেমে আসে।

১. *মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৫১৩৯ 'সৎ কাজের নির্দেশ' অনুচ্ছেদ।*

যেমন আল্লাহ বলেন,

وَإِذَا أَرَدْنَا أَنْ نُّهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوْا فِيْهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنهَا تَدْمِيْرًا O

'যখন আমি কোন জনপদকে ধ্বংস করার ইচ্ছা করি, তখন তার অবস্থাপন্ন লোকদেরকে উদ্বুদ্ধ করি। অতঃপর তারা পাপাচারে মেতে ওঠে। তখন সে জনগোষ্ঠীর উপরে আদেশ অবধারিত হয়ে যায়। অতঃপর আমরা সেটিকে বিধ্বস্ত করে দেই' (বনী ইস্রাঈল ১৬)। অন্য আয়াতে স্পষ্টভাবে কেবল নেতাদের কথা বলা হয়েছে। যেমন আল্লাহ বলেন,

وَكَذلِكَ جَعَلْنَافِىْ كُلِّ قَرْيَةٍ اَكبِرَمُجْرِمِيْهَا لِيَمْكُرُوْا فِيْهَا ط وَمَا يَمْكُرُوْنَ اِلاَّ بِاَنْفُسِهِمْ وَمَا يَشْعُرُوْنَ O

'আর এমনিভাবে আমরা প্রত্যেক জনপদে অপরাধীদের কিছু নেতা নিয়োগ করেছি। যেন তারা সেখানে চক্রান্ত করে। মূলতঃ তাদের সেই চক্রান্ত তাদের নিজেদের বিরুদ্ধেই। কিন্তু তারা তা উপলব্ধি করতে পারে না' (আল-আন'আম ১২৩)।

কথা ও কাজের অমিল যদি ইচ্ছাকৃত হয়, তবে সেটাই সবচেয়ে বড় গোনাহ হিসাবে আল্লাহ্র নিকটে পরিগণিত হয়। যেমন তিনি বলেন,

يَاَيُّهَاالَّذِيْنَ اَمَنُوْا لِمَ تَقُوْلُوْنَ مَالاَ تَفْعَلُوْنَ O كَبُرَمَقْتًا عِنْدَاللّٰهِ اَنْ تَقُوْلُوْا مَالاَ تَفْعَلُوْنَ O

'হে মুমিনগণ! তোমরা কেন ঐসব কথা বল যা তোমরা করো না? আল্লাহ্র নিকটে সবচেয়ে বড় গোনাহ হ'ল তোমাদের ঐসব কথা বলা যা তোমরা করো না' (ছফ ২-৩)। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর হাতে ইসলামের বায়'আত গ্রহণ করার পরেও একদল লোক তাঁর প্রকাশ্য ও গোপন বিরোধিতায় লিপ্ত হয়েছিল। এরাই 'মুনাফিক্ব' বলে খ্যাত। যাদের চক্রান্ত সম্পর্কে অবহিত করে পবিত্র কুরআনে 'মুনাফিকূন' নামে একটি পৃথক সূরা নাযিল হয়েছে। ইসলামের অগ্রগতিতে এরাই ছিল সবচেয়ে বড় সমস্যা। 'অহি' মারফত এদের যাবতীয় অপতৎপরতা সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) অবহিত হ'তেন। তবুও বাহ্যিকভাবে তারা মুসলমান হওয়ার কারণে কঠোর শাস্তিমূলক কোন ব্যবস্থা তিনি নিতে পারতেন না। যদিও ওমর ফারূক (রাঃ) কয়েকবার তাদেরকে হত্যা করতে চেয়েছিলেন।

আজও একই সমস্যা বিরাজ করছে। ইসলামী আন্দোলন হৌক আর বস্তুবাদী আন্দোলন হৌক সর্বত্র কথা ও কাজের অমিল প্রকটভাবে পরিদৃষ্ট হয়। এর ক্ষতি স্তরবিশেষে কমবেশী হয়। সাধারণ নেতাদের ভুলে সাধারণ ক্ষতি হয়। কিন্তু জাতীয় নেতাদের ভুলে জাতীয় ক্ষতি হয়। অনুরূপ বিশ্বনেতাদের ভুলে বিশ্বব্যাপী প্রতিক্রিয়া হয়। তাই স্ব স্ব স্তরের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের স্ব স্ব দায়িত্ব বোধ নিয়ে কাজ করা অত্যন্ত যরূরী।

বিশেষ করে যারা সমাজে ইসলামের বাস্তব প্রতিফলন দেখতে আগ্রহী, তাদেরকে এ বিষয়ে সবচেয়ে হুঁশিয়ার হওয়া কর্তব্য। যেন নিজেদের কথা ও কাজে মিল থাকে। মুখে বলছি কুরআন ও সুন্নাহ্র আইন চাই। অথচ নিজের আমল ও আচরণে তার কোন প্রতিফলন নেই। নিজ পরিবার ও কর্মস্থলে তার কোন বাস্তবায়ন নেই। এটা নিঃসন্দেহে গুরুতর অপরাধের শামিল। এতে আল্লাহ নারায হন। আর আল্লাহ যার উপরে নারায হন, বান্দা তার উপরে রাযী হ'তে পারে না। হ'লেও তা টিকে না। বরং আল্লাহ্র রেযামন্দীর বিনিময়ে বান্দার সকল নারাযী বরদাশত করা যেতে পারে। নবীগণ যেটা সারা জীবন দিয়ে প্রমান করে গিয়েছেন।

অনুরূপভাবে মুখে বলছি নবীর তরীকায় শান্তি। অথচ চলছি অন্যের বানাওটি তরীকায়। কুরআন ও ছহীহ হাদীছের সাথে যার কোন মিল নেই। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ও ছাহাবায়ে কেরামের তরীকার সাথে যার কোন সামঞ্জস্য নেই। তবুও চলছি স্রোত যেভাবে চলছে।

মুখে বলছি দেশ ও দশের মঙ্গলের জন্য রাজনীতি করছি। বাস্তবে দেখা যায় নিজের স্বার্থরক্ষা কিংবা পেটপূর্তিই হ'ল মূল লক্ষ্য। জনগণের আমানতের কিছু অংশের দায়িত্ব পেলেই সেটাকে লুফে নিচ্ছি। দিনে-দুপুরে পুকুরচুরি করছি। শুধু তাই নয়, গদী রক্ষার জন্য দেশ বিক্রি করতেও আপত্তি নেই। অথচ সর্বদা শান্তি ও স্বাধীনতার বুলি আওড়াচ্ছি। মুখে গণতন্ত্র ও মানবাধিকারের কথা বলছি। অথচ কাজের বেলায় নিজে প্রতিনিয়ত মানবাধিকার লংঘন করছি। বিশ্বনেতা থেকে শুরু করে নিম্নস্তরের নেতা পর্যন্ত সবাই একই রোগে ভুগছি। কথা ও কাজের মিল পাওয়া বিশেষ করে বর্তমান ক্বিয়ামতের যুগে বড়ই দুষ্কর হ'য়ে উঠেছে। আল্লাহ পাক তাই বলেন, اَتَاْمُرُوْنَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ اَنْفُسَكُمْ وَاَنْتُمْ تَتْلُوْنَ الْكِتٰبَ ط اَفَلاَتَعْقِلُوْنَ O 'তোমরা লোকদের ভাল কাজের নির্দেশ দাও এবং নিজেদের বেলায় সেটা ভুলে যাও। অথচ তোমরা কিতাব পাঠ করে থাক। তোমরা কি বুঝ না'? (বাক্বারাহ ৪৪)।

মিথ্যুক ও পেটপূজারী বক্তৃতাবাজ লোকদের অবস্থা সম্পর্কে নিম্নের হাদীছটি প্রণিধানযোগ্যঃ

সা'দ বিন আবী ওয়াক্কাছ (রাঃ) রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) হ'তে বর্ণনা করেন যে, لاَ تَقُوْمُ السَّاعَةُ حَتّٰى يَخْرُجَ قَوْمٌ يَأْكُلُوْنَ بِأَلْسِنَتِهِمْ كَمَا تَأْكُلُ الْبَقَرَةُ بِأَلْسِنَتِهَا 'অতদিন ক্বিয়ামত হবে না, যতদিন না একদল লোক বের

হবে, যারা তাদের যবান দিয়ে খাবে। যেমন গরু তার জিহ্বা দিয়ে খেয়ে থাকে'।[২] অন্য হাদীছে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, هَلَكَ الْمُتَنَطِّعُوْنَ قَالَهَاثَلاثًا 'ভাণকারীরা ধ্বংস হৌক' তিনি এটা তিনবার বলেন।[৩] মোল্লা আলী ক্বারী হানাফী (রহঃ) বলেন, এরা হ'ল ঐসব বক্তা যারা সুন্দরভাবে বক্তব্য উপস্থাপন করে ও কণ্ঠনালীর গভীর থেকে শব্দ বের করে শ্রোতার মন জয় করার চেষ্টায় রত থাকে'। ইমাম নববী (রহঃ) বলেন, এরা হ'ল ঐসব লোক যারা সকল কাজে বাড়াবাড়ি করে থাকে'।[৪] ধর্মীয় ও রাজনৈতিক বক্তা ও দায়িত্বশীল নেতৃবৃন্দের জন্য উপরোক্ত হাদীছে যথেষ্ট শিক্ষনীয় বিষয় রয়েছে। নিজে যা নয়, তা প্রকাশকারী ও নিজের দুর্বলতা ও অযোগ্যতা ঢেকে রাখায় পারঙ্গম ব্যক্তিদের সংশ্রব থেকে দ্বীনদার মুক্তাক্বী লোকদের দূরে থাকাই শ্রেয়। ভাণকারী লোকদের কথা বার্তায়, পোষাকে-আষাকে তাদের ভণিতা যেকোন সচেতন ব্যক্তির নযরে ধরা পড়ে। ভাণকারী ব্যক্তিরা কখনোই কারো হৃদয়ে আসন করে নিতে পারেনা। এমনকি ছোট্ট কচি শিশুও ভাণ করা নকল স্নেহ চিনতে পারে। ভাণকারী বকধার্মিকদের ভিড় থেকে আসল-নকল বাছাই করে তাদের সঙ্গে হৃদয়ের সম্পর্ক গড়ে তুলতে হবে। কেননা ক্বিয়ামতের মাঠে 'প্রত্যেকে তার সঙ্গে উঠবে, যে যাকে মহব্বত করে'।[৫] আর আল্লাহ পাক ভাণকারীদের পসন্দ করেন না।

দুর্ভাগ্য এই যে, সত্যকে ঢেকে রাখা, যাকে শী'আ পরিভাষায় 'তাক্বিয়া' (تقية) বলা হয়, সেটা তাদের মর্ধীয় বিশ্বাসের অন্তর্ভুক্ত হ'য়ে গেছে। বিভিন্ন মাযহাব ও তরীকায় বিশ্বাসী আলেম ও পীর-মাশায়েখ-মুরব্বীগণ যিনি যেটাতে আছেন, সেটাকে কঠোরভাবে ধরে আছেন। এর বিপরীত সত্য তাঁর জানা থাকলেও সেটা লুকিয়ে রাখেন দুনিয়াবী মান-সম্মান, টাকা-পয়সা, পদমর্যাদা বা বিভিন্ন গোঁড়ামীর কারণে। অথচ মুখে সব সময় ইসলাম, কুরআন-সুন্নাহ, নবীর তরীকা ইত্যাদির বক্তব্য চলছে। ছহীহ হাদীছের কোন সিদ্ধান্ত সামনে এলেই বিভিন্ন অজুহাতে সেটাকে এড়িয়ে গিয়ে নিজের লালিত রেওয়াজকেই তিনি টিকিয়ে রাখেন। সাধারণ মুসলমানদের চেয়ে আলেম ও পীর-মাশায়েখ-মুরব্বী লকবধারী ব্যক্তিদের মধ্যে এই গোঁড়ামী খুবই প্রকট ভাবে রয়েছে। তাদের কথা ও কাজে অমিল যেন ক্রমেই বেড়ে চলেছে।

শাহ অলিউল্লাহ (রহঃ) বহু পূর্বেই এ বিষয়ে হুঁশিয়ার করে গেছেন। জীবন সন্ধ্যায় প্রদত্ত অছিয়াত নামায় তিনি বলেন, ফক্বীরের প্রথম অছিয়ত এই যে, উম্মতকে আক্বীদা ও আমলে কিতাব ও সুন্নাতের সাথে যুক্ত থাকতে হবে। এ দু'টি বিষয়ে গবেষণায় মশগুল থাকতে হবে। প্রতিদিন এ দু'টি হ'তে কিছু অংশ পাঠ করতে হবে। যদি পড়ার ক্ষমতা না থাকে, তাহ'লে এ দু'টি হ'তে কিছু অংশ শ্রবণ করতে হবে। আক্বীদার বিষয়ে আহলে সুন্নাতের প্রথম যুগের প্রাচীন বিদ্বানদের পথ এখতিয়ার করতে হবে।... প্রশাখাগত বিষয়ে ফিক্হ ও হাদীছের ইল্‌মে পারদর্শী উলামায়ে মুহাদ্দেছীন-এর অনুসরণ করতে হবে। ফিক্হের প্রশাখাগত বিষয়গুলিকে সর্বদা কিতাব ও সুন্নাতের সম্মুখে পেশ করতে হবে। যা অনুকূলে পাওয়া যাবে, তা গ্রহণ করতে হবে। নতুবা পিছনে ছুঁড়ে মারতে হবে। ইজতিহাদী বিষয়সমূহকে বর্তমান সময়ে কিতাব ও সুন্নাতের সম্মুখে পেশ করা ব্যতীত উম্মতের কোন গত্যন্তর নেই। 'ফক্বীহ' হবার মৌখিক দাবীদার যারা আলিমদের তাক্বলীদ করাকে দস্তাবেয বানিয়ে নিয়েছে, হাদীছে অনুসন্ধান প্রচেষ্টা পরিত্যাগ করেছে, -এদের কথা শুনবেনা। এদের দিকে দৃকপাত করবেনা। এদের হ'তে দূরে থেকেই আল্লাহ্‌র নৈকট্য অনুসন্ধান করবে'।[৬] গোঁড়ামীর এই রোগ আলেমদের থেকে সংক্রমিত হয় তাদের অনুসারীদের মধ্যে। ফলে এটা একটা সামাজিক ব্যধিতে পরিণত হয়েছে। এই রোগ থেকে মুক্তি পেতে গেলে সত্যকে জানা ও বুঝার জন্য প্রবল ইচ্ছাশক্তির প্রয়োজন। সেই শক্তি অর্জনের জন্য জান্নাত পিয়াসী ঈমানদার মুসলমানকে খালেছ অন্তরে আল্লাহ্‌র নিকটে তাওফীক কামনা করতে হবে। কেননা একমাত্র তিনিই হেদায়াত দানের মালিক। আল্লাহ আমাদের সহায় হৌন এবং কথায় ও কাজে মিল রেখে জীবন পরিচালনার তাওফীক দান করুন- আমীন!!

২. *আহমাদ, সনদ হাসান, মিশকাত হা/৪৭৯৯ 'বক্তৃতা ও কবিতা' অনুচ্ছেদ।*
৩. *মুসলিম, মিশকাত হা/৪৭৮৫।*
৪. *মিশকাত, ঐ হাশিয়া।*
৫. *মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৫০০৮ 'আদাব' অধ্যায়।*
৬. *শাহ অলিউল্লাহ, 'অছিয়াতনামা' (ফারসী) পৃঃ ১।*

হোটেল এশিয়া
(আবাসিক)
✆ (০৭২১) ৭৭৩৭২১
HOTEL ASIA
(RESIDENTIAL)
✆ (0721) 773721
* মনোরম পরিবেশ
* রুচিসম্মত আবাসিক সুবিধা
* গাড়ি পার্কিং-এর সু-ব্যবস্থা
ইয়াসিন সুপার মার্কেট, ষ্টেশন রোড,
গোরহাঙ্গা, রাজশাহী।

প্র ব ন্ধ

বাংলাদেশে দারিদ্র্য বিমোচন ও মানব সম্পদ উন্নয়নে যাকাতের ব্যবহার

*-শাহ মুহাম্মাদ হাবীবুর রহমান**

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

[৪]

বাংলাদেশে যাকাত খাত হ'তে প্রাপ্য এই বিপুল অর্থ দিয়ে যেসব ত্রাণ ও পুনর্বাসনমূলক এবং প্রশিক্ষণ ও কর্মসংস্থানমূলক কর্মসূচী গ্রহণ করা সম্ভব, সে বিষয়ে নীচে আলোকপাত করা গেল। অবশ্য এটা একেবারেই প্রাথমিক পর্যায়ের Action plan। বাস্তবে অর্থাৎ প্রয়োগ করার সময়ে এর বেশ পরিবর্তন হ'তে পারে এবং আরও লাগসই ও যথাযথ কর্মসূচী উদ্ভাবিত হ'তে পারে। ত্রাণ ও কল্যাণধর্মী যেসব পদক্ষেপ গ্রহণ করা যেতে পারে তার মূল লক্ষ্য হবে অবশ্যই দারিদ্র্য বিমোচন বা দারিদ্র্য দূরীকরণ। আশা করা যায়, এসব পদক্ষেপ গ্রহণ করার ফলে আগামী দশ বছরের মধ্যে বাংলাদেশ হ'তে দারিদ্র্য সত্যিকার অর্থেই বিদায় নেবে। তবে এই শর্ত অবশ্যই মনে রাখতে হবে যে, যাদেরকে যে উদ্দেশ্যে সহযোগিতা করা হবে তারা অবশ্যই সেসব উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে প্রকৃতই আন্তরিক ও উদ্যোগী হবে। ভবিষ্যতে তারা পরমুখাপেক্ষী হবে না বা তাদের উপর যে বিশ্বাস স্থাপন করা হয়েছে তার অন্যথা হবে না।

বাংলাদেশের দারিদ্র্য বিমোচন ও মানব সম্পদ উন্নয়নের কেন্দ্রবিন্দু হওয়া উচিৎ পল্লী। সামাজিক ও সাংস্কৃতিক কারণেই এটি অপরিহার্য। তাই প্রস্তাবিত কর্মসূচীগুলি অবশ্যই শহরের বস্তির পরিবর্তে পল্লীকেন্দ্রিক হবে এবং এর উপর সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপিত হ'তে হবে। শহরের বস্তিতে এসব উদ্যোগ নিলে গ্রাম হ'তে শহরে অভিবাসন যেমন আরোও দ্রুত হবে তেমন এনজিওগুলোর প্রিয় বস্তির সংখ্যাও হু হু করে বেড়ে যেতে থাকবে। এর প্রতিবিধান ও প্রতিরোধের জন্যে পল্লী উন্নয়নের উপরেই জোর দিতে হবে। এজন্যে যাকাতভিত্তিক কর্মকাণ্ডের মৌল উদ্দেশ্য হবে মানব কল্যাণ ও মানব সম্পদ উন্নয়ন।

(ক) ত্রাণ ও কল্যাণধর্মী কর্মসূচীঃ

১। **বিধবা/বিকলাঙ্গদের কল্যাণঃ** বাংলাদেশে বিধবা এবং নানাভাবে বিকলাঙ্গ হয়ে যাওয়া পরিবার প্রধানদের পরিবারের দুর্দশার সীমা-পরিসীমা নেই। ভিক্ষুকের মতোই এদের জীবন যাপন অথবা ভিক্ষাবৃত্তিই এদের একমাত্র সম্বল। এদের এই অসহায় অবস্থা দূর করার জন্যে প্রাথমিকভাবে দেশের প্রতিটি ইউনিয়ন (৪৪৫১টি) এবং পৌর কর্পোরেশনের অধীনস্থ ওয়ার্ডের (৫৮৪টি) প্রতিটি হ'তে যদি কমপক্ষে কুড়ি জন করে বিধবা/বিকলাঙ্গ পরিবার বেছে নেয়া হয় তাহ'লে সর্বমোট ১,০০,৭০০টি পরিবারকে সহায়তা প্রদান করা যাবে। এদেরকে মাসিক ন্যূনতম টাঃ ২,০০০/- করে সাহায্য করলে বার্ষিক ২৪১ কোটি ৬৮ লক্ষ টাকার প্রয়োজন হবে।

২। **বৃদ্ধদের জন্যে মাসোহারাঃ** এদেশে সরকারী, আধা-সরকারী ও স্বায়ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠান হ'তে যারা অবসর নেয় শুধুমাত্র তারাই পেনশন পেয়ে থাকে। কিন্তু লক্ষ লক্ষ শ্রমজীবির বার্ধক্যে কোন আর্থিক সংস্থান নেই। এদের জন্যে কিছু করা খুবই যরূরী। অনেক সময় নিজেদের পরিবারের কাছেও এরা গলগ্রহ। সুতরাং প্রতিটি ইউনিয়ন ও ওয়ার্ডে প্রতি বছর যদি অন্ততঃ পঞ্চাশ জনকে মাসিক টাঃ ১,০০০/- হিসাবে আর্থিক সহায়তা দেয়া যায় তাহ'লে ২,৭১,৭৫০ জন উপকৃত হবে। তাদের ন্যূনতম প্রয়োজনের খানিকটা পূরণ হবে। এজন্যে প্রয়োজন হবে বার্ষিক ৩০২ কোটি ১০ লক্ষ টাকা।

সম্প্রতি সকল ইউনিয়ন ও পৌরসভার ওয়ার্ডপিছু ৫ জন সহায়-সম্বলহীন বৃদ্ধ ও বিধবাদের টাঃ ১০০/- হারে সরকারীভাবে মাসোহারা দেওয়ার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। কিন্তু ইতিমধ্যেই খবরের কাগজে প্রকাশিত রিপোর্ট হ'তে জানা যায় জনকল্যাণের চেয়ে পলিটিক্যাল স্টান্টবাজিই এর পেছনে বেশী কাজ করছে। সাহায্যপ্রার্থীরা বিশেষ এক রাজনৈতিক দলের সমর্থক কি-না তালিকাভূক্তির ক্ষেত্রে সেটাই বিশেষ প্রাধান্য পাচ্ছে। যাকাতের অর্থ বন্টনের ক্ষেত্রে এধরনের উদ্দেশ্য কোনক্রমেই কাঙ্খিত হবে না।

৩। **মৌলিক পারিবারিক সাহায্যঃ** এদেশের গ্রামাঞ্চলে তো বটেই, শহরতলীতেও বহু পরিবারের মশার আক্রমণ হ'তে রক্ষা পাওয়ার জন্যে যেমন মশারী নেই তেমনি শীতের প্রকোপ হ'তে বাঁচার জন্যে লেপ বা কম্বল নেই। শিশু ও বৃদ্ধদের কষ্ট শীতকালে অবর্ণনীয় হয়ে দাঁড়ায়। নিষ্ঠুর শীতের আক্রমণে প্রতি বছর বহু শিশু ও বৃদ্ধ মৃত্যুবরণ করে। এ ছাড়া নানা অসুখের শিকার তো হয়ই। এর প্রতিবিধানের জন্যে যদি প্রতি ইউনিয়ন ও ওয়ার্ড হ'তে প্রতি বছর কমপক্ষে পঞ্চাশটি পরিবারকে বেছে নিয়ে তাদের একটা করে বড় মশারী (৫´´×৭´´) ও একটা বড় লেপ (৬´×৭.৫´) দেয়া যায় তাহ'লে তারা দীর্ঘদিনের জন্যে মশার আক্রমণ ও শীতের প্রকোপ হ'তে রক্ষা পাবে। এ জন্যে চাই সত্যিকার উদ্যোগ ও আন্তরিকতা। যদি প্রতিটি মশারীর গড় মূল্য টাঃ ২২০/- ও লেপের মূল্য টাঃ ৪৩০/- হয় তাহ'লে এজন্যে প্রয়োজন হবে ১৬ কোটি ৩৬.৫ লক্ষ টাকার। বিনিময়ে দশ বছরে ২৫ লক্ষ ১৭ হাযারেরও বেশী পরিবার উপকৃত হবে।

* *প্রফেসর, অর্থনীতি বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।*

৪। **কন্যাদায়গ্রস্তদের সাহায্যঃ** আমাদের দেশে বিদ্যমান সামাজিক সমস্যাসমূহের অন্যতম প্রকট সমস্যা মেয়ের বিয়ে। যৌতুকের কথা বাদ দিলেও মেয়েকে মোটামুটি একটু সাজিয়ে শ্বশুর বাড়ীতে পাঠাবার সাধ থাকলেও সাধ্য নেই হাযার হাযার পরিবারের। এছাড়া বিয়ের দিনের আপ্যায়ন ও অপরিহার্য কিছু খরচও রয়েছে, যা যোগাবার সাধ্য অনেকেরই নেই। এসব কারণে বিয়ের সম্বন্ধ এলেও বিয়ে দেওয়া হয়ে উঠে না। পিতা বেঁচে না থাকলে বিধবা মায়ের পক্ষে এই দায়িত্ব পালন করা আরও কঠিন হয়ে পড়ে। অভিজ্ঞতা হ'তে দেখা গেছে ন্যূনতম টাঃ ৩০০০/- সহযোগিতা করলে একজন মেয়েকে স্বামীর ঘরে পৌঁছে দেওয়া সম্ভব। যদি দেশের সকল ইউনিয়ন ও ওয়ার্ডে প্রতি বছর দশটি করে মেয়ের বিয়ের জন্যে এধরনের সহযোগিতা দেয়া যায় তাহ'লে বছরে ব্যয় হবে ১৫ কোটি ১০.৫ লক্ষ টাকা। দশ বছরে বিয়ে হবে ৫,০৩,৫০০ মেয়ের। ফলে যে বিপুল সামাজিক কল্যাণ অর্জিত হবে অর্থমূল্যে তা পরিমাপ করা সম্ভব নয়।

৫। **ঋণগ্রস্ত কৃষকদের জমি অবমুক্তকরণঃ** বাংলাদেশের পল্লী এলাকায় এমন গ্রামের সংখ্যাই বেশী যেখানে বর্তমানের ভূমিহীন কৃষকদের অনেকেই কয়েক বছর পূর্বেও ছিল মোটামুটি স্বচ্ছল এবং কৃষি জমির মালিক। কিন্তু পারিবারিক কোন বড় ধরনের ব্যয় নির্বাহের জন্যে ব্যাংক বা গ্রামীণ মহাজনের নিকট হ'তে টাকা ঋণ নেয়ার ফলে তার শেষ সম্বল চাষের জমিটুকুও বেহাত হয়ে গেছে। প্রান্তিক ও ক্ষুদে কৃষকরাই এই তালিকায় সংখ্যাগুরু। মেয়ের বিয়ে, বৌয়ের চিকিৎসা বা প্রাকৃতিক দুর্বিপাকের ফলে শস্যহানির ক্ষতিপূরণের জন্যে শেষ সম্বল দুই বা তিন বিঘা চাষের জমি তারা রেহেন বা বন্ধক রাখে। এসব ঋণ গ্রহীতাদের অধিকাংশই এ ঋণ আর শুধতে পারে না। ফলে তাদের জমি চলে যায় মহাজনের হাতে। এর প্রতিবিধানের জন্যে যাকাতের অর্থ হ'তেই এদের সাহায্য করা যায়। যদি সর্বোচ্চ পাঁচ হাযার টাকা করে প্রতি ইউনিয়নে গড়ে কুড়ি জন কৃষককেও সাহায্য করা যায় তাহ'লে ৮৯,০২০ জন কৃষককে প্রতি বছর ঋণমুক্ত করা যায়। জমি ফেরত পেয়ে তারা আবার চাষ আবাদ করতে ও জমির মালিক হিসাবে নিজেদের উপর আস্থা ফিরে পেতে পারে। এতে বার্ষিক ব্যয় হবে ৪৪ কোটি ৫১ লক্ষ টাকা এবং দশ বছরের মধ্যে অধিকাংশ ক্ষুদে ও প্রান্তিক কৃষক ঋণমুক্ত হয়ে যাবে।

৬। **দরিদ্র শিশুদের পুষ্টি সাহায্যঃ** বাংলাদেশের গ্রামাঞ্চলে তো বটেই শহরেও বস্তি এলাকাতে অগণিত শিশু নিদারুণ পুষ্টিহীনতার শিকার। ফলে এরা যৌবনেই নানা দুরারোগ্য ব্যধিতে আক্রান্ত হয়ে পড়ে। অনেকে সারাজীবনের মতো রাতকানা, স্কার্ভি, রিকেট, ম্যারাসমাস, ঘ্যাগ, পাইলস প্রভৃতি নানা রোগের শিকার হয়ে পড়ে। এর প্রতিবিধানের জন্যে যাদের বয়স দুই থেকে পাঁচ বছরের মধ্যে তাদের ভিটামিন 'এ' ক্যাপসুল, ভিটামিন 'সি' ট্যাবলেট, আয়োডিনযুক্ত লবণের প্যাকেট ইত্যাদি সরবরাহ করতে হবে। এজন্যে প্রাথমিক পর্যায়ে যদি প্রতি ইউনিয়ন ও ওয়ার্ডে ২ হ'তে ৫ বছর বয়সের ১০০ জন শিশুকে বাছাই করা হয় তবে প্রতিবছর ৫,০৩,৫০০ জন শিশু এর আওতায় আসবে। পাঁচ বছর পূর্ণ হ'লে এই সাহায্য বন্ধ হয়ে যাবে। এজন্যে শিশু প্রতি মাসিক ব্যয় যদি ন্যূনতম টাঃ ৬০/- ধরা হয় তাহ'লে বছরে খরচ হবে ৩৬ কোটি ২৫ লক্ষ টাকা।

৭। **প্রসবকালীন সহযোগিতাঃ** প্রসূতি মাতা ও ৬ সপ্তাহ বয়সের মধ্যের শিশুদের মৃত্যু উন্নয়নশীল বিশ্বে উঁচু হারে মৃত্যুর অন্যতম কারণ হিসাবে গণ্য হয়ে আসছে। আমাদের গ্রামাঞ্চলে এখনও গর্ভবতী ও প্রসূতি মায়েদের যথাযথ পরিচর্যা, সেবা-যত্ন ও পুষ্টিকর খাবার যোগানোর ব্যাপারে একদিকে যেমন বিপুল অমনোযোগিতা ও অশিক্ষা বিদ্যমান, অন্যদিকে সামর্থ্যের অভাবও স্বীকৃত। এর ফলে গর্ভবতী মায়েদের শেষের ছয় সপ্তাহে যখন পুষ্টিকর খাবারের বেশী প্রয়োজন তখন তারা তা যেমন পায়না, প্রসবের পরেও সেই অবস্থার কোন উন্নতি ঘটেনা। যদি ঘটনাক্রমে উপর্যুপরি দ্বিতীয় বা তৃতীয় কন্যা সন্তানের জন্ম হয় তাহ'লে প্রসূতির অনাদর-অবহেলার সীমা থাকে না। উপরন্তু প্রসবকালে যে পরিচ্ছন্ন ও জীবাণুমুক্ত কাপড়-চোপড়, জীবাণুনাশক সামগ্রী ও ঔষধপত্র প্রয়োজন দরিদ্র পরিবারে তার খুব অভাব। এর প্রতিবিধান করতে পারলে গর্ভবতী ও প্রসূতি মায়ের কল্যাণ হবে, তাদের অকাল মৃত্যুর হার কমে যাবে। একই সাথে নবজাতকের মৃত্যুর হারও কমে আসবে। এজন্যে ইউনিয়ন ও ওয়ার্ডপিছু যদি ২০টি দরিদ্র পরিবারের গর্ভবতী মাকে বেছে নেয়া হয় এবং টাঃ ১০০০/- সহযোগিতা দেয়া যায়, তাহ'লে বছরে প্রয়োজন হবে মোট ১০ কোটি ৭ লক্ষ টাকা।

৮। **মুসাফিরদের সাহায্যঃ** নিঃস্ব মুসাফিরের জন্যেও সহযোগিতার হাত বাড়াতে হবে আমাদের। কারণ এ হ'লো আল্লাহ্‌র বিধান। দেশের শহরগুলির মসজিদে তো বটেই, থানা পর্যায়ের মসজিদেও প্রায়ই ছালাত শেষে দেখা যায় দু-একজন মুসাফির দাঁড়িয়ে যায়, যার সব সম্বল শেষ। চিকিৎসা করতে এসে বাড়ী ফেরার মত অর্থ নেই, কাজের খোঁজে এসে কাজ না পেয়ে ফিরতে হচ্ছে কর্পদকশূন্য অবস্থায় অথবা দুর্বৃত্তের খপ্পরে পড়ে সর্বস্ব খুইয়েছে। এদের বাড়ীতে ফিরে যাবার ব্যবস্থা করা আমাদের শরঈ দায়িত্ব। এজন্যে মসজিদের ইমাম ছাহেবদের সাহায্য নিলে সবচেয়ে ভাল ফল পাওয়া যাবে। তাদের হাতে গড়ে মাসে টাঃ ২০০০/- এই উদ্দেশ্যে তুলে দিলে এধরনের মুসাফিরদের নিজ এলাকায় ফেরত যাওয়ার ব্যবস্থা করা সহজ হবে।

দেশের ৬৪টি যেলা শহরে গড়ে পাঁচটি ও প্রতি থানা সদরে একটি করে মসজিদ বাছাই করা হ'লে মোট মসজিদের সংখ্যা দাঁড়াবে ৩২০+৪৬০=৭৮০। এসব মসজিদে মুসাফিরদের জন্যে গড়ে মাসে টাঃ ২০০০/- হারে ব্যয় করলে বছরে খরচ হবে ১ কোটি ৮৭ লক্ষ টাকা। এর ফলে যে কী বিপুল সামাজিক উপকার হবে তা বলে শেষ করার নয়।

৯। **ইয়াতীমদের প্রতিপালনঃ** বাংলাদেশে প্রায় প্রতিটি যেলা সদরে সরকারী শিশুসদন রয়েছে। কিন্তু দেশের অগণিত ইয়াতীম শিশু-কিশোরদের স্থান সংকুলান এসব শিশুসদনে হওয়ার কথা নয়। উপরন্তু এখানে কিশোর নির্যাতন এবং তাদের আহার ও পোষাকের যে দুঃখবহ চিত্র মাঝে-মধ্যেই ফাঁক-ফোকর গলিয়ে বেরিয়ে আসে তা হৃদয় বিদারক। তাছাড়া শতাব্দীর ভয়াবহ বন্যায় কত যে শিশু-কিশোর ইয়াতীম ও নিঃস্ব হয়েছে তার সঠিক চিত্র পাওয়া সম্ভব নয়। এদের অন্ন-বস্ত্র-বাসস্থান ও শিক্ষার ব্যবস্থা করা সমাজের বিত্তশালীদের নৈতিক দায়িত্ব। সেই দায়িত্ব পালনে যাকাতের অর্থ ব্যয় করা খুবই উপযুক্ত পদক্ষেপ হ'তে পারে। এজন্যে নতুন ইয়াতীমখানা তৈরী ও ইয়াতীমদের ভরণ-পোষণ ও সার্বিক তত্ত্বাবধান এবং সাধারণ শিক্ষাসহ বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে। যদি ১০০ জন ইয়াতীমের একটি প্রতিষ্ঠানের জন্যে বার্ষিক ন্যূনতম সার্বিক ব্যয় বারো লক্ষ টাকা ধরা হয়, তবে এরকম পঞ্চাশটি ইয়াতীমখানার জন্যে বছরে ব্যয় হবে ৬ কোটি টাকা।

১০। **ইউনিয়ন মেডিক্যাল সেন্টারঃ** এদেশের পল্লী এলাকায় চিকিৎসা ও স্বাস্থ্য সেবার সুবিধা যে কত অপ্রতুল ও অবহেলিত তা ভুক্তভোগী মাত্রই জানে। এদেশের গ্রামীণ জনগণ সুচিকিৎসার সুযোগের অভাবে তাবিজ-তুমার, ঝাড়-ফুঁক ইত্যাদির উপর বিশ্বাস করে অথবা হাতুড়েদের হাতে জীবন সঁপে দিয়ে ধুঁকে ধুঁকে অকাল মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ে। দেশের এই বৃহৎ জনগোষ্ঠীর অধিকাংশই দরিদ্র। এদেরকে সুস্থভাবে বাঁচার সুযোগ দিতে হ'লে আধুনিক চিকিৎসা সুবিধা পল্লী এলাকায় পৌঁছে দিতে হবে। এজন্যে দেশের প্রতিটি ইউনিয়নে ন্যূনতম সুযোগ-সুবিধাসম্পন্ন মেডিক্যাল সেন্টার গড়ে তোলা প্রয়োজন। এদেশে জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ ও পরিবার পরিকল্পনার ব্যাপক প্রসারের উদ্দেশ্যে সরকার 'স্যাটেলাইট ক্লিনিক' নামে ইউনিয়নভিত্তিক কর্মসূচী চালু করেছেন আজ হ'তে দুই দশক আগে। সে ধাঁচেই প্রস্তাবিত ইউনিয়নকেন্দ্রিক এই সেন্টার গড়ে উঠতে পারে। এটি হবে মূলতঃ ভ্রাম্যমান বা মোবাইল। এখানে থাকবে একজন এমবিবিএস ডাক্তার, একজন করে পুরুষ মেডিক্যাল এসিস্ট্যান্ট ও মহিলা স্বাস্থ্য কর্মী এবং পল্লী এলাকায় সব ঋতুতে ব্যবহার ও চলাচল উপযোগী বিশেষভাবে তৈরী ভ্যান। এই ভ্যানেই থাকবে প্রয়োজনীয় ঔষধপত্র ও চিকিৎসার অপরিহার্য সামগ্রী বা সরঞ্জাম। ইউনিয়নের অন্তর্ভুক্ত গ্রামগুলিতে পালা করে নির্দিষ্ট দিনে হাযির হবে এই ভ্রাম্যমান মেডিক্যাল সেন্টার। জনসংখ্যা ও দূরত্বের বিচারে কোথাও এই সেন্টার একই দিনে দুই গ্রাম আবার কোথাও বা দুই দিন একই গ্রামে যাবে। বিনামূল্যে চিকিৎসা সুবিধা এবং স্বাস্থ্য ও পুষ্টি বিষয়ে পরামর্শ পাবে গ্রামীণ দরিদ্র জনগণ। সঙ্গতিপন্ন লোকেরা মূল্য দিয়ে ঔষধ কিনতে পারবে এ সুবিধাও এখানে থাকবে। এখানে রেফারাল সুবিধার ব্যবস্থাও করা যেতে পারে। এর ফলে পরবর্তী পর্যায়ে একই উদ্দেশ্যে যেলা সদরে প্রতিষ্ঠিত উন্নতমানের হাসপাতালগুলিতে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে রোগীর দ্রুত ও উপযুক্ত চিকিৎসা নিশ্চিত হবে। ইউনিয়নপিছু কেন্দ্রের গড় মাসিক ব্যয় (ডাক্তার, স্বাস্থ্যকর্মী, ভ্যানচালকের বেতন ও ঔষধসহ) কুড়ি হাযার টাকা ধরলে দেশের ৪৪৫১টি ইউনিয়নের জন্যে বার্ষিক ব্যয় দাঁড়াবে ১০৬ কোটি ৮২ লক্ষ টাকা।

১১। **স্বাস্থ্যসম্মত শৌচাগারঃ** দেশের পল্লী এলাকায় তো বটেই, শহরতলীতেও স্বাস্থ্যসম্মত শৌচাগারের অভাব প্রকট। হাযার হাযার পরিবারের ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও স্বাস্থ্যসম্মত শৌচাগার বানাবার আর্থিক সামর্থ্য নেই। সেজন্যেই যেখানে সেখানে প্রস্রাব ও পায়খানার কদর্য ও স্বাস্থ্যবিধি বহির্ভূত অভ্যাস আরও বেশী প্রসার লাভ করে চলেছে। ফলে সহজেই পানি দূষিত হচ্ছে, সংক্রামক ব্যাধি বিস্তার লাভ করেছে, পুঁতিগন্ধময় পরিবেশের সৃষ্টি হচ্ছে। উপরন্তু গ্রামাঞ্চলে মহিলাদের পক্ষে ইযযত-আবরু বজায় রেখে প্রাকৃতিক এই প্রয়োজন পূরণ করা খুবই দুরুহ। দেশের উত্তরাঞ্চলে এই সমস্যা সবচেয়ে বেশী। এর প্রতিবিধানের উদ্দেশ্যে দরিদ্র পরিবারসমূহের জন্যে স্বাস্থ্যসম্মত শৌচাগারের ব্যবস্থা করা যরূরী। এজন্যে প্রয়োজন একটা প্যানসহ স্লাব ও সিমেন্টের ২ বা ৩টা রিং। এজন্যে সর্বোচ্চ খরচ পড়বে সাড়ে তিনশ টাকা। গ্রহীতারা নিজেরাই পাটখড়ি শুকনা কলাপাতা বা পলিথিন দিয়ে এটা ঘিরে নিতে পারে। যদি প্রতি ইউনিয়ন ও ওয়ার্ডে বছরে ৫০টি করে পরিবারকে এই সুবিধা দেয়া যায় তাহ'লে প্রয়োজন হবে ৮ কোটি ৮১ লক্ষ টাকা। এভাবে ১০ বছরে ২৫,১৭,৫০০ পরিবার এই কর্মসূচীর আওতায় চলে আসবে। পর্দা, স্বাস্থ্যরক্ষা ও পরিবেশদূষণ রোধে এর ফলাফল হবে সুদূরপ্রসারী।

১২। **নওমুসলিম পুনর্বাসনঃ** দেশে প্রতি বছরই বিভিন্ন যেলায় কিছু কিছু ব্যক্তি বা পরিবার ইসলাম গ্রহণ করছে। ইসলাম গ্রহণের সাথে সাথেই এরা পারিবারিক সম্পদ ও সহযোগিতা হ'তে বঞ্চিত হয়। এদের সন্তান-সন্ততিরাও

লেখা-পড়ার সুযোগ পায়না। এদের সম্মানজনক পুনর্বাসনের জন্যে সহযোগিতার উদ্যোগ নেয়া আমাদের দ্বীনি দায়িত্ব। তবে ধর্মান্তরিত খৃষ্টানদের মতো এদের জন্যে পৃথক কোন অঞ্চল গড়ে তোলার চেষ্টা না করে বরং সমাজের মূল স্রোতধারার সাথে মিশে যেতে সাহায্য করাই শ্রেয়। যদি গোটা দেশে প্রতি বছর অন্ততঃ পঞ্চাশটি নওমুসলিম পরিবারকে এ উদ্দেশ্যে ন্যূনতম মাসিক টাঃ ৫০০০/- হারে একবছর ভাতা প্রদান ও কর্মসংস্থানের জন্যে এককালীন দশ হাযার টাকা সাহায্য করা যায় তাহ'লে বছরে ব্যয় হবে ৩৫ লক্ষ টাকা।

(খ) শিক্ষা ও প্রশিক্ষণমূলক কর্মসূচীঃ

১। **দ্বীনি শিক্ষা অর্জনে সহযোগিতাঃ** ইসলামী শিক্ষা অর্জন ব্যতিরেকে প্রকৃত মুমিন হওয়া অসম্ভব। কিন্তু এদেশে ক্রমেই সেই সুযোগ সংকুচিত হয়ে আসছে। দ্বীনি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হিসাবে মাদরাসাগুলো কোনক্রমে টিকে রয়েছে। সরকারী পরিসংখ্যান হ'তে দেখা যায় এদেশে ১৯৯১-৯২ সালে দাখিল মাদরাসার সংখ্যা ছিল ৪৪৬৬। এ সংখ্যা ১৯৯৪-৯৫ সালে ৪১২১ এ এসে দাঁড়িয়েছে। অর্থাৎ তিনবছরে মাদরাসা সংখ্যা কমেছে ৩৪৫টি। সরকার প্রাথমিক শিক্ষা সম্প্রসারণের জন্যে প্রাইমারী স্কুল ও হাইস্কুলের প্রাইমারী অংশের ছাত্র-ছাত্রীদের পাঠ্যবই বিনামূল্যে সরবরাহ করে থাকে। উপরন্তু শিক্ষার বিনিময়ে খাদ্য (শিবিখা) কর্মসূচীও চালু রয়েছে। কিন্তু মাদরাসাগুলো এসব সুযোগ হ'তে সম্পূর্ণ বঞ্চিত। সরকারের এই বিমাতাসুলভ আচরণের প্রতিবাদের পাশাপাশি মাদরাসাগুলোতে ছাত্র-ছাত্রী ধরে রাখতে হ'লে তাদের জন্যেও অনুরূপ সুযোগ-সুবিধার ব্যবস্থা করতে হবে। বিনামূল্যে পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত বই প্রদানের পাশাপাশি প্রয়োজনীয় পোষাক ও অপরিহার্য ঔষধপত্রের যোগান দিতে হবে। এজন্যে যদি দাখিল মাদরাসাগুলোসহ আলিম ও ফাযিল মাদরাসার পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত পড়ুয়া ছাত্র-ছাত্রীদের বেছে নেয়া হয় তাহ'লে এদের সংখ্যা দাঁড়াবে ১০ লাখের মতো। এদের বই সরবরাহ করতে গড়ে মাথাপিছু টাঃ ১৫০/- হিসাবে দরকার হবে ১৫ কোটি টাকা। এক সেট পোশাক সরবরাহ করলে খরচ পড়বে গড়ে মাথাপিছু টাঃ ২০০/- হারে ২০ কোটি টাকা। এছাড়া স্বাস্থ্য রক্ষার জন্যে ভিটামিন ও আয়রণ ট্যাবলেট সরবরাহ করলে প্রয়োজন হবে আরও ১০ কোটি টাকার। সর্বসাকুল্যে এই ৪৫ কোটি টাকার বিনিময়ে মানব সম্পদ উন্নয়নের যে স্থায়ী ভিত রচিত হবে তার ভবিষ্যৎ মূল্য অপরিসীম। এসবের পাশাপাশি মাদরাসার লিল্লাহ বোর্ডিংগুলোতেও খাদ্যমান বাড়াবার জন্যে যাকাতের অর্থ ব্যবহার করতে হবে।

প্রসঙ্গতঃ মনে রাখা দরকার ইসলামের প্রচার ও প্রসার এবং ইসলামী জীবনব্যবস্থা কায়েমের জন্যে দ্বীনি প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা ও সেসবের বিকাশের কোন বিকল্প নেই। যেকোন আন্দোলন বা জীবন ব্যবস্থার প্রতিষ্ঠা ও সাফল্য নির্ভর করে তার Institution building ক্ষমতার উপরে। সে জন্যেই মাদরাসাসহ অন্যান্য যেসব প্রতিষ্ঠান দ্বীনের কাজে সক্রিয়ভাবে লিপ্ত, তাদের সহযোগিতায় এগিয়ে আসতে হবে। মাদরাসার ছাত্র-ছাত্রীদের আর্থিক সাহায্যের ব্যাপারে বাংলাদেশে কোন কোন জায়গায় ভ্রান্ত ধারণা প্রচলিত রয়েছে। সে সবের সমালোচনায় না যেয়ে বর্তমান শতাব্দীর প্রখ্যাত মুফতী আল্লামা ইউসুফ কারাযাবী (রঃ)-এর বক্তব্য তুলে ধরাই হবে অধিকতর যুক্তিযুক্ত। তিনি বলেন-

'যাকাত খাতের সমস্ত আয় সাংস্কৃতিক, প্রশিক্ষণমূলক ও প্রচারধর্মী কার্যাবলীতে ব্যয় করাই এ কালে উত্তম।... সঠিক ইসলামী দাওয়াত প্রচারের কেন্দ্র স্থাপন এবং অমুসলিমদের মধ্যে ইসলাম প্রচারের দায়িত্ব পালন এ কালে সব কয়টি মহাদেশেই একান্ত কর্তব্য। কেননা এ কালে বিভিন্ন ধর্ম ও মতবাদের মধ্যে প্রচণ্ড দ্বন্দ্ব ও সংঘর্ষ চলছে। একাজও 'জিহাদ ফী সাবীলিল্লাহ' রূপে গণ্য হ'তে পারে। দেশের অভ্যন্তরে ইসলাম প্রচার কেন্দ্র গড়ে তোলা এবং মুসলিম যুবসমাজকে একাজে নিয়োজিত ও প্রতিপালন করা একান্ত আবশ্যক। ... খালেস ইসলামী মতবাদ ও চিন্তাধারামূলক বই-পুস্তক ও পত্র-পত্রিকা প্রচার করাও গুরুত্বপূর্ণ কাজ। তা প্রতিহত করবে বিধ্বংসী ও বিভ্রান্তিকর চিন্তা-বিশ্বাসের ধারক বই-পুস্তক ও পত্র-পত্রিকার যাবতীয় কারসাজি। তার ফলেই আল্লাহ্‌র কালেমা প্রাধান্য লাভ করতে পারে এবং সত্য সঠিক চিন্তা সর্বত্র প্রচারিত হ'তে পারে। এ কাজও আল্লাহ্‌র পথে জিহাদ।... ঘুমন্ত মুসলিম জনগণকে জাগ্রত করা এবং খৃষ্টান মিশনারী ও নাস্তিকতার প্রচারকদের মুকাবিলা করা নিশ্চয়ই ইসলামী জিহাদ ফী সাবীলিল্লাহ'।[১]

২। **ছাত্রদের জন্যে বৃত্তিঃ** দেশের মাদরাসা, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে যেসব ছাত্র-ছাত্রী পড়াশুনা করছে তাদের বিরাট অংশ ক্ষুদে ও মাঝারি কৃষক পরিবারের সন্তান। সে কারণেই নিদারুণ আর্থিক সংকটের শিকার। এদের লেখাপড়ার ব্যয় নির্বাহের জন্যে মাতাপিতাকে শেষ সম্বল চাষের জমিটুকুও বিক্রি করতে হয় অথবা বন্ধক রাখতে হয়। অনেককে নিরুপায় হয়ে লেখাপড়া বন্ধ করে দিতে হয়। এদের মধ্যে থেকে উচ্চ মাধ্যমিক, সম্মান ও মাষ্টার্স শ্রেণী, মাদ্রাসার ক্ষেত্রে আলিম, ফাযিল ও কামিল শ্রেণী, প্রকৌশল ও মেডিক্যাল কলেজ এবং পলিটেকনিক ও ভকেশনাল ইনস্টিটিউটগুলোতে অধ্যয়নের ব্যয় নির্বাহের উদ্দেশ্যে যদি প্রতিবছর পঞ্চাশ হাযার ছাত্র-ছাত্রীকে বাছাই করা হয় এবং মাসিক টাঃ ১,৫০০/- হারে বৃত্তি দেয়া হয় তাহ'লে বার্ষিক ব্যয় হবে ৯০ কোটি টাকা। এভাবে দশ বছরে পাঁচ লক্ষ ছাত্র-ছাত্রীকে শিক্ষার একটা পর্যায় পর্যন্ত পৌঁছে দেয়া সম্ভব।

---

১. ইউসুফ আল-কারাযাবী, ইসলামে যাকাত বিধান, ২য় খণ্ড, অনুবাদঃ মুহাম্মাদ আব্দুর রহীম, (ইসলামী ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৮৩); পৃঃ ১৭৫-১৭৬।

উল্লেখ্য, যেহেতু দ্বিতীয় বছরে নতুন ছাত্র-ছাত্রীরা এ প্রকল্পের আওতায় আসবে এবং পুরাতনরাও অধ্যয়নরত থাকবে সেহেতু তখন প্রয়োজন হবে ১৮০ কোটি টাকা। তৃতীয় বছরে এর পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়াবে ২৭০ কোটি টাকা। চতুর্থ বছর হ'তে প্রয়োজন হবে ৩৬০ কোটি টাকার। সম্ভাব্য বৃত্তিভোগীদের বাছাই করার সময়ে মেধার পাশাপাশি প্রকৃতই পারিবারিক আর্থিক অনটন রয়েছে এমন প্রত্যয়ন পত্রের প্রয়োজন হবে। এলাকার দু'জন বিশিষ্ট ইসলামী ব্যক্তিত্ব সংশ্লিষ্ট ছাত্র-ছাত্রীর আমল-আখলাক ও তাকওয়া সম্বন্ধে গোপনে প্রত্যয়ন করবেন। উপরন্তু বৃত্তিভোগীরা কর্মজীবনে প্রবেশ করে প্রাপ্ত অর্থের অন্ততঃ ৫০% ওয়াকফ তহবিলে কিস্তিতে পরিশোধ করবে এরকম বিধান করাও সম্ভব।

৩। **মহিলাদের আত্মকর্মসংস্থানমূলক প্রশিক্ষণ কেন্দ্রঃ** মহিলাদের ঘরে বসেই জীবিকা উপার্জনের পথ করে দেবার জন্যে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ খুবই যরূরী। বিভিন্ন ধরনের সেলাই, কাটিং, নিটিং, এমব্রয়ডারী, বুটিক, ফেব্রিকস প্রিন্ট, ফুল, চামড়া ও কাপড়ের সৌখিন সামগ্রী, উলের কাজ ইত্যাদি শেখানোর জন্যে যেলা ও থানাভিত্তিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র গড়ে তোলা যেতে পারে। এখানে শিক্ষিত-অশিক্ষিত সকল মহিলাই কাজ শেখার সুযোগ পাবে। এজন্যে বড় বড় শহরে একাধিক এবং ছোট যেলা ও বড় থানাগুলোতে প্রাথমিক পর্যায়ে একটি করে মোট ১০০টি কেন্দ্র গড়ে তোলা যেতে পারে। এসব কেন্দ্রে প্রশিক্ষকের বেতন, শিক্ষার উপকরণ ও অন্যান্য আনুষাঙ্গিক ব্যয়সহ মাসিক ন্যূনতম গড় ব্যয় টাঃ ৮০০০/- ধরলে বছরে ব্যয় হবে ৯৬ লক্ষ টাকা। বিনিময়ে হাযার হাযার মহিলা আত্মকর্মসংস্থানের মাধ্যমে নিজেদের পায়ে দাঁড়াবার সুযোগ পাবে। তাদের আর্থিক শ্রীবৃদ্ধি ঘটবে, পরিবারের ভাঙ্গনও রোধ হবে।

৪। **কম্পিউটার প্রশিক্ষণঃ** ব্যাপক কর্মসংস্থানের লক্ষ্যে কম্পিউটার প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন অতীব গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ হিসাবে বিবেচিত হচ্ছে। বাংলাদেশে রয়েছে বিপুল সংখ্যক শিক্ষিত বেকার। এদের যদি ডাটা এন্ট্রি অপারেটর হিসাবে প্রশিক্ষণ দেয়া যায়, তাহ'লে এদের কর্মসংস্থানের সুযোগ খুলে যাবে। এ ব্যাপারে প্রতিবেশী দেশ ভারত ইতিমধ্যেই কাজ শুরু করে দিয়েছে। সে দেশের সরকার উদ্যোগ নিয়ে V-Sat চ্যানেলের সংযোগ নিয়েছে এবং শুধুমাত্র ডাটা এন্ট্রি করেই প্রতিবছর বিপুল পরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রা উপার্জন করছে। আমাদেরও আগামী শতাব্দীর চাহিদার প্রতি লক্ষ্য রেখে এখনই যুগপৎ প্রশিক্ষণ ও যোগাযোগ অবকাঠামো (Communication infrastructure) গড়ে তোলার উদ্যোগ নেয়া উচিৎ। যদি প্রাথমিকভাবে দেশব্যাপী ১০০টি সঠিক মানের কম্পিউটার প্রশিক্ষণ কেন্দ্র গড়ে তোলা যায় তাহ'লে বছরে ন্যূনতম ১২,০০০ জনকে প্রশিক্ষণ দেয়া যাবে। এজন্যে প্রথম বছরে ৫ কোটি টাকার মতো ব্যয় হ'লেও শেষে এটা বছরে দুই কোটি টাকার নীচে নেমে আসবে। তবে Communication infrastructure তৈরীর জন্যে প্রাথমিকভাবে বড় অংকের অর্থ ব্যয়ের প্রয়োজন হবে। গার্মেন্টস শিল্পে এ দেশে তুলনামূলকভাবে কম মজুরীতে শ্রম পাওয়া যায় বলেই আমাদের তৈরী পোশাক বিদেশে বিক্রি হয়। ডাটা এন্ট্রির ক্ষেত্রেও উন্নত বিশ্বের তুলনায় আমাদের দেশে মজুরীর হার কম। তাই এর চাহিদা ক্রমাগত বাড়তে থাকবে। সাম্প্রতিক এক হিসাবে জানা যায় পৃথিবীব্যাপী এখনই দুই লক্ষ ডাটা এন্ট্রি অপারেটরের চাহিদা রয়েছে। এই চাহিদা ভবিষ্যতে আরও বাড়বে। একটু উদ্যোগ নিলেই এই বাজারে ঢোকা সম্ভব।

(গ) কর্মসংস্থান ও পুনর্বাসনমূলক কর্মসূচীঃ

১। **গরু/বলদ ক্রয়ে সাহায্যঃ** গ্রাম বাংলায় কৃষি কাজের প্রধান অবলম্বন চাষের বলদ। একই সঙ্গে পুষ্টি ও উপার্জনের সহায়ক হ'লো দুধের গাই। অথচ বহু কৃষকের জমি থাকলেও এক জোড়া বলদ নেই। গৃহস্থের দুধের গাই নেই। কেনারও সামর্থ্য নেই। এদের হালের বলদ বা দুধের গাই কিনে দিয়ে স্থায়ীভাবে সাহায্য করা যেতে পারে। প্রতিটি গরু বা বলদের দাম যদি গড়ে টাঃ ৭,৫০০/- ধরা যায় এবং প্রতি ইউনিয়নে গড়ে ২০ জনকেও সাহায্য করা যায় তাহ'লে প্রতি বছর ব্যয় হবে ৬৬ কোটি ৭৬.৫ লক্ষ টাকা। এ কর্মসূচী দশ বছর চালু থাকলে চাষাবাদ ও দুধের মাধ্যমে উপার্জন ও পুষ্টির ক্ষেত্রে বিপুল ইতিবাচক পরিবর্তন সূচিত হবে। গতিবেগ সঞ্চারিত হবে গ্রামীণ অর্থনীতিতেও।

২। **অন্যান্য পেশাগত কর্মসংস্থানঃ** শহরতলীসহ বাংলাদেশের গ্রামীণ এলাকায় নিদারুণ বেকারত্ব বিদ্যমান। দেশে কর্মরত এনজিওগুলি (গ্রামীণ ব্যাংকসহ) এসব বেকারদের বিশেষতঃ মহিলাদের আত্মকর্মসংস্থানের জন্যে নানা ধরনের উপকরণ সংগ্রহের উদ্দেশ্যে ঋণ দিচ্ছে। দুঃখের বিষয়, এ ঋণ নিয়ে তারা স্বনির্ভর হয়েছে, না এনজিওগুলো সুকৌশলে তাদের শুষে নিয়ে নিজেরাই ফুলে ফেঁপে বড় হচ্ছে সেই বিচার আজ বড় হয়ে দাঁড়িয়েছে। এর বিপরীতে যাকাতের অর্থ দিয়ে যদি নীচের খাতগুলিতে উপকরণ/সরঞ্জাম কিনে সাহায্য করা যেত তাহ'লে কি পরিমাণ উপকার হ'তে পারতো তার একটা সংক্ষিপ্ত চিত্র তুলে ধরা হলো।-

গ্রামবাংলার ইউনিয়নসমূহ ও শহরতলীর এলাকাগুলিতে যেসব পেশায় অধিক সংখ্যক লোকের কাজের সুযোগ রয়েছে সেগুলো হলোঃ

(ক) **ক্ষুদ্র আকারের উৎপাদনঃ** চাল/চিড়া/মুড়ি/মোয়া/খই তৈরী, পাট তৈরী, চাটনী/আচার/মোরব্বা তৈরী, মিঠাই তৈরী, লুঙ্গি/তোয়ালে/গামছা বোনা, বাঁশ-বেতের কাজ, নকশী কাঁথা তৈরী, খেলনা তৈরী, হাঁস-মুরগী পালন, মাছের চাষ, সব্জী চাষ ইত্যাদি।

(খ) **পেশাগত সরঞ্জাম ক্রয়, সংযোজন ও মেরামতঃ** রিক্সা ও রিক্সাভ্যান তৈরী ও মেরামত, সেলাই মেশিন

ক্রয়/মেরামত, জাল তৈরী, গরু ও ঘোড়ার গাড়ীর চাকা তৈরী ও মেরামত, চাষাবাদের সরঞ্জাম তৈরী ও মেরামত, ইলেকট্রিক সামগ্রী মেরামত, স্যালো মেশিন মেরামত ইত্যাদি।

(গ) **ক্ষুদ্র আকারের ব্যবসাঃ** মুদী দোকান, মনিহারী দোকান, এ্যালুমিনিয়াম/মাটির তৈজসপত্রের দোকান, চায়ের দোকান, দর্জির দোকান, মাছের ব্যবসা, সব্জীর ব্যবসা, মৌসুমী ফলের ব্যবসা, ফেরীওয়ালা ইত্যাদি।

উপরে উল্লেখিত চল্লিশ ধরনের কাজের মধ্যে যদি প্রতিটি ইউনিয়ন ও পৌরসভার প্রতিটি ওয়ার্ডে অন্ততঃ যেকোন দশটি পেশায় প্রতি বছর গড়ে দশ জন হিসাবে একশত জন বেকার অথচ উদ্যোক্তা পুরুষ ও নারীকে গড়ে পাঁচ হাযার টাকা মূল্যের আর্থিক সহযোগিতা করা যায় অর্থাৎ উপকরণ কিনে দেয়া যায়, তাহ'লে বছরে প্রয়োজন হবে সর্বমোট ২৫১ কোটি ৭৫ লক্ষ টাকা। এ সুযোগ একজন লোক মাত্র একবারই পাবে। ফলে প্রতি বছর কর্মসংস্থান হবে ৫,০৩,৫০০ জনের। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য, বাংলাদেশে ডিসেম্বর ১৯৯৭ পর্যন্ত গ্রামীণ ব্যাংক বাদে উল্লেখযোগ্য এনজিওগুলোর প্রদত্ত ঋণের ক্রমপুঞ্জীভূত পরিমাণ ছিল ৪৩৯৮ কোটি ৭৪ লক্ষ টাকা। পক্ষান্তরে শুধুমাত্র ১৯৯৭ সালে প্রদত্ত ঋণের পরিমাণ ছিল ১৫০৯ কোটি ৯ লক্ষ টাকা। এবছরে ঋণগ্রহীতাদের গৃহীত মাথাপিছু ঋণের পরিমাণ ছিল মাত্র টাঃ ২২৩৮/-।[২] এই ঋণ সবটাই শুধতে হয়েছে সূদসহ, যার হার খুবই চড়া। গ্রামীণ ব্যাংকের ক্ষেত্রেই এ হার ১২২% হ'তে ১৭৩%, এমনকি ক্ষেত্র বিশেষে ২১৯% পর্যন্ত।[৩] এরই বিপরীতে ইসলামী পদ্ধতিতে উপকরণ গ্রহীতাকে সাহায্য করা হচ্ছে সম্পূর্ণ নিঃস্বার্থভাবে এবং মূল অর্থও (যার পরিমাণ এনজিওগুলো প্রদত্ত গড় অর্থের দ্বিগুণেরও বেশী) রয়ে যাচ্ছে তার কাছে মূলধন আকারেই।

৩। **গৃহায়ণ কর্মসূচীঃ** বাংলাদেশে গ্রামাঞ্চলে প্রতি তিন জনের একজনেরই মাথা গোঁজার ঠাঁই নেই। প্রতি বছর অগ্নিকাণ্ড, বন্যা ও নদী ভাঙনের ফলে ক্রমেই এই সংখ্যা বাড়ছে। শহর রক্ষাকারী বাঁধ, রেল লাইনের দু'পাশ, নদীর উঁচু পাড়, বেড়ী বাঁধ প্রভৃতি জায়গায় কোন রকমে খুঁটির মাথায় পলিথিন, চট, সিমেন্টের ব্যাগ দিয়ে আচ্ছাদন তৈরী করে বাস করছে দুর্গত বনি আদমরা। সেখানে না আছে আলোবাতাস, না আছে পয়ঃনিষ্কাশনের ব্যবস্থা। লেখাপড়া বা চিত্ত বিনোদনের কথা নাই বা উল্লেখ করা হ'লো। এছাড়া অফিস-আদালত ও স্কুল-কলেজের বারান্দায়, রেল স্টেশন ও বাস টার্মিনালে বিপুল সংখ্যক ছিন্নমূল নারী-পুরুষ রাত কাটায়। এদের মাথা গোঁজার ঠাঁই করতে এগিয়ে আসতে হবে। সরকারী খাস জমি বা জেগে ওঠা নতুন চরে এদের বহুজনেরই বাসস্থানের ব্যবস্থা করা সম্ভব। সেজন্যে প্রয়োজন ন্যূনতম তিন বান টিন, গোটা দশেক বাঁশ ও অন্যান্য সরঞ্জাম। এছাড়া বেড়াও দিতে হবে। বিশুদ্ধ পানির জন্যে প্রয়োজন টিউবওয়েলের। হাযার বিশেক টাকার মধ্যে এসব প্রয়োজন পূরণ সম্ভব। দেশের ৫০৩৫ টি ইউনিয়ন ও ওয়ার্ডে প্রতিবছর যদি অন্ততঃ পাঁচটি করে পরিবারকে ঘর বেঁধে দেয়া যায় তাহ'লে উপকৃত হবে ২৫,১৭৫টি পরিবার, ব্যয় হবে ৫০ কোটি ৩৫ লক্ষ টাকা।

এভাবে কর্মসংস্থান ও পুনর্বাসনের ব্যবস্থা ছাড়াও দীর্ঘ মেয়াদী বৃহৎ বিনিয়োগ কর্মসূচী গ্রহণ করে যেমন স্থায়ী কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা যায়, তেমনি এসব বিনিয়োগ হ'তে নিয়মিত ও স্থায়ী উপার্জনেরও সুযোগ হয়। এর ফলে পুরাতন ত্রাণ ও পুনর্বাসনমূলক কর্মসূচীগুলি অব্যাহত রাখা সম্ভব হবে। উদাহরণতঃ পরিবহন শিল্পের কথা ধরা যেতে পারে। দেশে সড়ক যোগাযোগের যে অভূতপূর্ব উন্নতি হয়েছে তার প্রেক্ষিতে আন্তঃযেলা ও রাজধানীর সাথে সড়ক পথে যাতায়াতের পরিমাণ বহুগুণ বেড়েছে, অদূর ভবিষ্যতে এটা আরও বাড়বে। এই সুযোগ গ্রহণ করে যদি আধুনিক ২০০ বাস (এয়ারকণ্ডিশন নয়) রাস্তায় নামানো যায়, তাহ'লে সর্বসাকুল্যে ব্যয় হবে ১০০ কোটি টাকা। এ থেকে যে আয় হবে তা যেমন পুনরায় বিনিয়োগ করা যাবে তেমনি বিপুল সংখ্যক লোকেরও কর্মসংস্থান হবে। ড্রাইভার, কন্ডাকটর, হেলপার, ওয়েলম্যান, মেকানিক, ওয়ার্কশপ ইত্যাদি মিলে বিরাট সংখ্যক লোক কর্মব্যস্ত থাকার সুযোগ পাবে।

এ পর্যন্ত যেসব কর্মসূচী বাস্তবায়নের প্রস্তাব করা হয়েছে তাতে সর্বসাকুল্যে চৌদ্দশত কোটি টাকার বেশী ব্যয় হচ্ছে না। অবশিষ্ট যে বিপুল অর্থ হাতে রয়ে যাবে তা দিয়ে আরও কল্যাণধর্মী উদ্যোগ গ্রহণের পাশাপাশি দীর্ঘস্থায়ী উপার্জনের উদ্দেশ্যে বড় আকারে বিনিয়োগ কর্মসূচী গ্রহণ করা সম্ভব। এই অর্থ দিয়ে গড়ে তোলা সম্ভব আধুনিক ছাপাখানা, রেশম শিল্প, জুতা শিল্প, সাবান শিল্প, সূতা শিল্প, গার্মেন্টস শিল্প, আসবাবপত্র তৈরীর প্রতিষ্ঠান এমনকি চিনির কল, কাপড়ের কল প্রভৃতি বৃহদায়তন কারখানাও। এজন্যে দরকার দৃঢ় সংকল্প ও যথাযথ পরিকল্পনার। একই সঙ্গে দরকার ঈমানী চেতনায় উদ্বুদ্ধ প্রত্যয়দৃঢ় মানুষের।

[৫]

উপরের আলোচনা হ'তে এ সত্য দিবালোকের মতই স্পষ্ট যে, বাংলাদেশের অভ্যন্তরেই আল্লাহ্‌র দেওয়া বিপুল সম্পদ রয়েছে। এর সঠিক ব্যবহার করতে পারলে দারিদ্র্য বিমোচন ও মানব সম্পদ উন্নয়নের জন্যে কোন আলাউদ্দীনের চেরাগের দরকার নেই। দরকার নেই বিদেশী সাহায্যের। যা দরকার তা হ'লো ইসলামের প্রকৃত শিক্ষা ও দাবী সম্বন্ধে জনগণের ওয়াকিফহাল হওয়া, যাকাত আদায় ও বিলি-বন্টন সম্পর্কে সাংগঠনিক প্রক্রিয়া ও সরকারী নীতি-নির্দেশনা এবং একটি সুদূরপ্রসারী কার্যকর পরিকল্পনা। তাহ'লে এনজিওদের কবলমুক্ত এবং সূদের

২. *তথ্যসূত্রঃ CDF Statistics, Vol. 5, December 1997, Credit and Development Forum, Dhaka, p-60।*
৩. *ইনকিলাব, ৯ ও ১৬ নভেম্বর, ১৯৯৭।*

অভিশাপমুক্ত হয়ে সুখী ও সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়া সম্ভব।

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য যে, যাকাত আদায় ও তা বিলিবন্টনের জন্যে সরকার বা কোন সংস্থার বাড়তি অর্থ ব্যয়ের প্রয়োজন নেই। যাকাত আদায়কারীই যেহেতু আল-কুরআনের নির্দেশ অনুসারে যাকাতের অর্থ পেতে পারে (সূরা তওবা ৬০) সেহেতু আদায়কৃত যাকাত হ'তেই আদায়কারীকে এর একটা অংশ সম্মানী বা বেতন হিসাবে দেয়া যেতে পারে। কোন প্রতিষ্ঠান একাজে এগিয়ে এলে তাকেও এ অর্থ দেয়া সম্ভব। এর ফলে বেশ কিছু লোকের কর্মসংস্থান হবে। উপরন্তু দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চল পর্যন্ত তথ্য সংগ্রহ ও অর্থ-সামগ্রী বিতরণ করার কাজটিও সহজ হবে।

এ ব্যাপারে আজ প্রয়োজন দেশের ওলামা-মাশায়েখদের ঐক্যবদ্ধ, সক্রিয় ও বলিষ্ঠ ভূমিকা গ্রহণের। তাঁরা ঐক্যবদ্ধভাবে সঠিক পদ্ধতিতে যাকাত ও উশর আদায় এবং তার সর্বোচ্চ কল্যাণমূখী ব্যবহারের জন্যে জনগণকে আহ্বান জানাতে পারেন। একই সঙ্গে সরকারকেও প্রয়োজনীয় অবকাঠামো গঠনের জন্যে বলতে পারেন। তবে সবচেয়ে কার্যকর উপায় হ'লো দেশের শিক্ষিত ও উদ্যমী যুব সমাজকে একাজে উদ্বুদ্ধ করা এবং দায়িত্ব দেয়া। এতে তারা যেমন নিজেরা কর্মসংস্থানের সুযোগ পাবে তেমনি দেশের দুঃস্থ, দুর্গত বিধবা ও বেকার লোকদের জীবনে ইতিবাচক পরিবর্তন আসবে।

আলোচনার ইতি টানার পূর্বে একটি সহজ অথচ কার্যকর বিকল্প উপায়ের প্রস্তাব দেশের ইসলামপ্রিয় জনগণের কাছে রাখতে চাই। বিভিন্ন সেমিনার-সিম্পোজিয়াম ও নানা তথ্য বিবরণী হ'তে জানা যায় যে, রাজধানী শহর হ'তে শুরু করে দেশের প্রত্যন্ত পল্লী এলাকা পর্যন্ত ইতিমধ্যেই গড়ে ওঠা মসজিদের সংখ্যা তিন লক্ষ অতিক্রম করে যাবে। এ থেকে একেবারেই মানসম্পন্ন নয় অথবা ওয়াক্তিয়া ছালাতে গড় হাযিরা পঞ্চাশ জনের কম এবং রেলস্টেশন, লঞ্চঘাট, বাস টার্মিনাল, ফেরীঘাট প্রভৃতি জায়গার মসজিদ (যার মুছল্লীরা অনিয়মিত ও অস্থানীয়) বাদ দেয়ার জন্যে সর্বোচ্চ এক লক্ষ মসজিদকে বাদ দেয়া যেতে পারে। যদি বাকী দুই লক্ষ মসজিদে কমপক্ষে গড়ে ৫০ জন মুছল্লী নিয়মিত ছালাত আদায় করেন তাহ'লে মোট মুছল্লীর সংখ্যা দাঁড়াবে এক কোটি। এ মুছল্লীরা যদি গড়ে পঁচিশ জন মিলে মাত্র একজন লোকের দারিদ্র্য বিমোচনের উদ্যোগ নেয়, তাহ'লে প্রতি বছর চার লক্ষ লোক নিজের পায়ে দাঁড়াতে পারবে। সেই একজন হ'তে পারে আত্মীয়-স্বজনদের মধ্যের কেউ, হ'তে পারে নিজের প্রতিবেশীদের কেউ। এভাবে দশ বছরে চল্লিশ লক্ষ লোককে নিজের পায়ে দাঁড় করিয়ে দেয়া কোন অসম্ভব ব্যাপার নয়। এজন্যে দরকার একটু আন্তরিকতা, একটু উদ্যম এবং পরিকল্পনামাফিক কর্মপ্রয়াস চালিয়ে যাওয়া। তাহ'লে এসব বনি আদমের জীবনে নেমে আসবে স্বস্তি, এদের মুখে ফুটবে সন্তুষ্টি ও তৃপ্তির অনাবিল হাসি। তাই হোক আমাদের সকলের কাম্য।।

[সমাপ্ত]

মানফালূতীর ছোট গল্প 'আল-ইক্বাব' এর আলোকে মিসরীয় সমাজ চিত্র

*-শামীমা আখতারা**

ভূমিকাঃ বিশ্বের প্রচলিত ভাষা সমূহের মধ্যে আরবী একটি প্রাচীনতম ভাষা। প্রাক ইসলামী যুগ থেকেই এ ভাষা সাহিত্যিক রূপ পরিগ্রহ করে বিশ্বজোড়া খ্যাতি অর্জন করে। কালক্রমে আরবী সাহিত্য উন্নত থেকে উন্নততর হ'তে থাকে। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধ হ'তে এ সাহিত্য আধুনিক রূপ ধারণ করতে থাকে। এ সময়কালকে আরবী সাহিত্যের নবজাগরণের যুগ বলা হয়। এ যুগের কবি সাহিত্যিকগণ অতীতের রচনা পদ্ধতি ও বিষয়বস্তুর সংস্কার সাধনের মাধ্যমে সম্পূর্ণ নতুন পদ্ধতিতে সাহিত্য সৃষ্টিতে ব্রতী হন। ফলে এ সময় আরবী গদ্য সাহিত্যে সম্পূর্ণ নতুন আঙ্গিকে ছোটগল্প, নাটক, উপন্যাস প্রভৃতি শাখার উদ্ভব ঘটে। এ যুগে ছোটগল্প রচনার মাধ্যমে যারা বিশেষ খ্যাতি অর্জন করে আরবী সাহিত্য জগতে অমর হয়ে আছেন, তাঁদের মধ্যে মানফালূতী অন্যতম। তিনি বিভিন্ন বিষয়ের উপর অসংখ্য ছোটগল্প রচনা করেছেন। তার মধ্যে 'আল-ইক্বাব' একটি প্রসিদ্ধ ছোটগল্প। এ গল্পে স্বপ্নে দেখা একটি ঘটনা বর্ণনার মধ্য দিয়ে তিনি মিসরের ক্ষমতাসীন ব্যক্তিবর্গের প্রতি কটাক্ষ করেছেন। এ প্রবন্ধে মানফালূতীর সংক্ষিপ্ত পরিচয়, 'আল-ইক্বাব' গল্পের সংক্ষিপ্ত রূপ এবং এ গল্পে মিসরের সামাজিক অবক্ষয়ের যে চিত্র তুলে ধরা হয়েছে, তার বাণীচিত্র অংকনের প্রয়াস পাব।

পরিচয়ঃ মোস্তফা লুৎফী আল-মানফালূতী ১৮৭৬ খ্রীঃ মিসরের 'মানফালূত' নামক স্থানে এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন।[১] জন্মস্থানের নামানুসারে তিনি 'মানফালূতী' নামেই পরিচিত।[২] তাঁর পিতা মুহাম্মাদ লুৎফী ছিলেন আরবীয় এবং মাতা ছিলেন তুর্কী বংশোদ্ভূত। পিতার দিক থেকে তিনি হযরত মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর দৌহিত্র হযরত হুসাইন (রাঃ)-এর বংশধর ছিলেন। এ সম্পর্কে 'The New Encyclopaedia Britannica'-তে বর্ণিত হয়েছেঃ "Al-Manfaluti was born of a half-Turkish, half-Arab family claiming descent from Husayn, grandson fo the prophet Muhammad"[৩]

শৈশবকাল থেকেই 'মানফালূতী' অসাধারণ স্মৃতি শক্তি ও তীক্ষ্ণ বুদ্ধির অধিকারী ছিলেন। স্থানীয় এক মক্তবে ধর্মীয় শিক্ষার মধ্য দিয়ে তাঁর শিক্ষা জীবন শুরু হয়। তথায় তিনি পবিত্র কুরআন মুখস্থ করেন এবং হাদীছ, তাফসীর, ফিক্‌হ,

---

* *সহকারী অধ্যাপিকা, আরবী বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।*

১. *William Benton, The New Encyclopaedia Britannica, (Chicago: 1986), v-7. P. 770.*

২. *হান্না আল-ফাখূরী, তারীখুল আদাবিল আরাবী, (বৈরুতঃ দারুল জীল, ১৯৮৬), ৩য় খণ্ড পৃঃ ২০১।*

৩. *William Benton, op. cit., P. 770.*

উছূল প্রভৃতি বিষয়ে বিশেষ দক্ষতা অর্জন করেন। প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনান্তে উচ্চ শিক্ষার উদ্দেশ্যে তিনি মিসরের বিখ্যাত 'আল-আযহার' বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হন।[৪] তথায় সুদীর্ঘ দশ বছর অধ্যয়ন করে তিনি আরবী ভাষা ও সাহিত্যে যথেষ্ট বুৎপত্তি অর্জন করেন। এখানে অধ্যয়নকালে মুফতী মুহাম্মাদ আব্দুহু ও সা'দ জাগলুল পাশার সাহচর্য ও অনুপ্রেরণা তাঁকে সাহিত্য চর্চায় বিশেষভাবে অনুপ্রাণিত করে। ফলে অধীর আগ্রহ ও মনযোগ সহকারে তিনি সাহিত্য চর্চায় আত্মনিয়োগ করেন। এ সময় থেকে কায়রোর বিখ্যাত সাপ্তাহিক 'আল-মুয়াইয়িদ' পত্রিকায় তিনি কবিতা, প্রবন্ধ, ছোটগল্প প্রভৃতি লিখতে শুরু করেন।[৫] অল্পদিনের মধ্যেই একজন উদীয়মান সাহিত্যিক হিসাবে তাঁর সুখ্যাতি চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ে। ১৮৯৭ খ্রীঃ তিনি খেদীভ দ্বিতীয় আব্বাস (১৮৯২-১৯১৪ খ্রীঃ) সম্পর্কে একটি ব্যঙ্গ কবিতা রচনা করেন। ফলে তাঁকে দীর্ঘদিন যাবৎ কারাভোগ করতে হয়।[৬] কারামুক্তির পর তিনি শুনতে পান যে, তাঁর প্রধান উপদেষ্টা মুহাম্মাদ আব্দুহু ইন্তেকাল করেছেন। এ দুঃসংবাদে তিনি মানসিকভাবে ভেঙ্গে পড়েন এবং নিরাশ হয়ে জন্মভূমি 'মানফালূতে' ফিরে যান। তথায় তিনি দীর্ঘদিন যাবৎ সাহিত্য চর্চা অব্যাহত রাখেন।[৭] অবশেষে সা'দ জাগলুল পাশা মিসরের শিক্ষামন্ত্রীর পদে অধিষ্ঠিত হয়ে 'মানফালূতীকে' শিক্ষা দপ্তরে 'কাতিব' পদে নিয়োগ দান করেন।[৮] মিসরে নতুন সংসদীয় সরকার গঠিত হ'লে সা'দ জাগলুল পাশা তাঁকে মন্ত্রণালয়ের সচিব পদে নিযুক্ত করেন। এ পদে কর্মরত অবস্থায় ১৯২৪ খ্রীঃ তিনি কায়রোতে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।[৯]

আধুনিক আরবী সাহিত্যের বিভিন্ন শাখায় মানফালূতীর অবদান অপরিসীম। তিনি আরবী কবিতা, ছোটগল্প, প্রবন্ধ, উপন্যাস প্রভৃতিতে যথেষ্ট কৃতিত্বের স্বাক্ষর রেখেছেন। তবে তিনি কাব্য সাহিত্যের তুলনায় গদ্য সাহিত্যে অধিক পারদর্শিতা প্রদর্শন করেছেন।[১০] বিশেষকরে ছোটগল্প রচয়িতা হিসাবে তিনি আরবী সাহিত্য জগতে খ্যাতির শীর্ষে আরোহণ করেছেন। ছোটগল্প রচনায় অসামান্য কৃতিত্বের জন্য তিনি আরবী সাহিত্যে পথিকৃৎ হয়ে রয়েছেন।[১১] এতদ্ব্যতীত ফরাসী ভাষার কয়েকটি বিখ্যাত উপন্যাস আরবীতে অনুবাদ করেও তিনি কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন। তাঁর রচনাবলীর মধ্যে 'আন-নাযারাত', 'আল-মুখতারাত' ও 'আল-আবারাত' গ্রন্থগুলো বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।[১২] 'আল-ইক্বাব' হ'ল 'আল-আবারাত' গ্রন্থের একটি মর্মস্পর্শী ছোটগল্প। 'আল-ইক্বাব' অর্থ শাস্তি।[১৩] লেখক এ গল্পে তিনজন অপরাধীর লঘু পাপে গুরুদণ্ড ভোগের মর্মান্তিক দৃশ্য তুলে ধরেছেন।

গল্পটির সংক্ষিপ্ত রূপঃ এক রাতে লেখক স্বপ্নে দেখেন যে, তিনি এক অজানা শহরের এক বিশাল রাজপ্রাসাদের সামনে দিয়ে গমন করছেন। এমন সময় তিনি দেখতে পান যে, অগণিত মানুষ রাজবিচার দর্শনের জন্য উক্ত প্রাসাদে সমবেত হচ্ছে। কৌতুহলবশে তিনি এ বিচার সভায় উপস্থিত হন। তথায় তিনি লক্ষ্য করেন যে, দেশের আমীর, কাযী ও পাদরী বিচারকের আসনে সমাসীন রয়েছেন। বিচারকার্য শুরু হ'লে একজন অতিশয় বৃদ্ধকে অপরাধী হিসাবে দরবারে হাযির করা হয়। আমীর তার অপরাধের কথা জানতে চাইলে গির্জা প্রধান পাদরী জানান যে, বৃদ্ধটি গির্জা থেকে একটি ময়দার বস্তা চুরি করেছে। এ কথা শুনে উপস্থিত জনতা উচ্চৈঃস্বরে বৃদ্ধটির দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দাবী করে। পাদরীর ইঙ্গিতে গির্জার সন্ন্যাসীগণ অপরাধীর বিরুদ্ধে চুরির সাক্ষ্য দেয়। পাদরী এ সময় আমীরকে কান কথা বলে প্রভাবান্বিত করেন। ফলে আমীর রায় ঘোষণা করে বলেন যে, বৃদ্ধটিকে বধ্যভূমিতে নিয়ে গিয়ে কেটে টুকরো টুকরো করে হত্যা করা হৌক। এ রায় শুনে বৃদ্ধটি আত্মপক্ষ সমর্থনে কিছু বলতে উদ্যত হয়। কিন্তু প্রহরীগণ তাকে কথা বলার সুযোগ না দিয়েই কারাগারে নিক্ষেপ করে।

অতঃপর প্রহরীগণ দ্বিতীয় অপরাধী হিসাবে এক যুবককে আমীরের সম্মুখে নিয়ে আসে। আমীর তার অপরাধ জানতে চাইলে বলা হয় যে, অপরাধী একজন হত্যাকারী। একদিন আমীরের জনৈক কর্মচারী তার কাছে গিয়ে 'কর' দাবী করে। কিন্তু সে কর না দিয়ে স্বীয় তরবারী দ্বারা কর্মচারীকে হত্যা করে। একথা শুনে সমবেত জনগণ উচ্চৈঃস্বরে অপরাধীর কঠোর শাস্তি দাবী করে। আমীর সাক্ষীদেরকে সাক্ষ্য প্রদানের আহ্বান জানালে নিহত কর্মচারীর সংগীগণ অপরাধীর বিরুদ্ধে হত্যার সাক্ষ্য প্রদান করে। কিছুক্ষণ চিন্তাভাবনার পর আমীর রায় ঘোষণা করে বলেন যে, অপরাধীকে বধ্যভূমিতে নিয়ে শূলী কাষ্ঠে চড়িয়ে হত্যা করা হৌক। এ রায় শ্রবণে যুবকটি নিজেকে নির্দোষ প্রমাণের জন্য কিছু বলার চেষ্টা করে। কিন্তু প্রহরীগণ তার কথায় কর্ণপাত না করে তাকে টেনে হেঁচড়ে কারাগারে নিয়ে যায়।

এরপর প্রহরীগণ তৃতীয় অপরাধী হিসাবে একজন সুন্দরী যুবতীকে বিচার স্থলে নিয়ে আসে। আমীর তার অপরাধের কথা জানতে চাইলে কাযী বলেন, সে একজন ব্যাভিচারিনী। এ কথা শুনে উপস্থিত জনগণ সমস্বরে বলে উঠে যে, তাকে নির্মমভাবে হত্যা করা হৌক। আমীর

৪. হান্না আল-ফাখূরী, *প্রাগুক্ত, পৃঃ ২০১।*
৫. আহমাদ হাসান আয-যাইয়াত, *তারীখুল আদাবিল আরাবী (মিসরঃ দারুন নাহযাত), পৃঃ ৪৬১।*
৬. *তদেব, পৃঃ ৪৬১।*
৭. হান্না আল-ফাখূরী, *প্রাগুক্ত, পৃঃ ২০১।*
৮. ডক্টর মুহাম্মদ মুজিবুর রহমান, *মিসরের ছোটগল্প (ঢাকাঃ লায়ন্স পাবলিকেশন্স, ১৯৮২), পৃঃ ৮৩।*
৯. হান্না আল-ফাখূরী, *প্রাগুক্ত, পৃঃ ২০১।*
১০. এ.এম. মুহাম্মদ আব্দুল গফুর চৌধুরী, *আরবী সাহিত্যের ইতিবৃত্ত (চট্টগ্রামঃ কিতাব ঘর, ১৯৮২), পৃঃ ৩৪।*
১১. গোলাম সামদানী কোরায়শী, *আরবী সাহিত্যের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস (ঢাকাঃ বাংলা একাডেমী, ১৯৭৭), পৃঃ ১৭৯।*
১২. আব্দুস সাত্তার, *আধুনিক আরবী গল্প (ঢাকাঃ মুক্তধারা, ১৯৭৫), পৃঃ ৮।*
১৩. *Hans Wehr, A Dictionary of Modern Written Arabic (London: 1976), P. 627.*

সাক্ষীদেরকে সাক্ষ্যদানের আহ্বান জানান। তখন যুবতীটির এক নিকটাত্মীয় তার বিরুদ্ধে ব্যাভিচারের সাক্ষ্য দেয়। এ সময় আমীরের কানে কাযী ফিস্‌ফিস্ করে কিছু বলে তাঁকে প্রভাবান্বিত করেন। ফলে আমীর রায় ঘোষণা করে বলেন যে, অপরাধীকে বধ্যভূমিতে নিয়ে পাথর মেরে হত্যা করা হৌক।

উক্ত বিচার সভায় এভাবে তিনজন কথিত অপরাধীর অপরাধের শাস্তি নির্ধারণ করা হয়। উপস্থিত জনগণ অপরাধীদের ব্যাপারে আমীরের এ রায় শুনে খুশী হয়। তাঁর কঠোর বিচার ও অবিচল সিদ্ধান্তে তারা মুগ্ধ হয়। অতঃপর তারা বিচারকদের জন্য দো'আ করে সন্তুষ্টচিত্তে সভাস্থল ত্যাগ করে।

লেখক ঐ অদ্ভুত বিচারকার্য দর্শনে বিস্মিত হন। যাতে অভিযুক্তদেরকে আত্মপক্ষ সমর্থনের কোন সুযোগ দেয়া হ'ল না এবং অপরাধের পরিমাণ অনুযায়ী যথাযোগ্য শাস্তি নির্ধারণ করা হ'ল না। আমীরের প্রতি জনগণের সীমাহীন আনুগত্য ও অগাধ ভক্তি দেখে তিনি অবাক হয়ে যান। তাঁর বিচারের প্রতি তাদের দৃঢ় প্রত্যয় ও অন্ধ বিশ্বাস দর্শনে তিনি বিস্ময়াভিভূত হয়ে পড়েন। অতঃপর তিনি এ বিস্ময়কর বিচার সম্পর্কে চিন্তা করতে করতে বিষন্ন মনে পথ চলতে থাকেন। সারাদিন পথ চলার পর সন্ধ্যায় এক নির্জন, অন্ধকার ও ভয়াবহ বধ্যভূমিতে উপনীত হন। কিছুদূর অগ্রসর হয়ে তিনি দেখতে পান যে, সদ্য রায় ঘোষিত বৃদ্ধটির লাশ ছিন্নভিন্ন অবস্থায় পড়ে রয়েছে। সাজা প্রাপ্ত যুবকটির লাশ এক গাছের সঙ্গে ঝুলন্ত রয়েছে। অপরাধী যুবতীটির রক্তাক্ত মৃতদেহ পাথরের স্তুপে পড়ে আছে। আর এ তিনজন অসহায় হতভাগার রক্তে পরিপূর্ণ হয়ে আছে তথাকার একটি ছোট গর্ত।

এ ভয়াবহ দৃশ্য দেখে লেখক সংজ্ঞা হারিয়ে ফেলেন। গভীর রাতে জ্ঞান ফিরে পেয়ে তিনি তথায় এক দরিদ্র বৃদ্ধাকে দেখতে পান। বৃদ্ধাটি তথায় একটি কবর খুঁড়ে বৃদ্ধের লাশটি দাফন করে। অতঃপর সে কবর পাশে দাঁড়িয়ে কান্নাবিজড়িত কণ্ঠে বৃদ্ধের জন্য দো'আ করে। এ দৃশ্য দেখে লেখক মর্মাহত হয়ে বৃদ্ধার নিকট এ করুণ পরিণতির কারণ জানতে চান। বৃদ্ধা জানায় যে, এ বৃদ্ধটি তার দরিদ্র স্বামী। সারাজীবন সে কঠোর পরিশ্রম করে বৈধ উপার্জনে জীবিকা নির্বাহ করে। এক সময় বার্ধক্যের দরুন সে কর্মক্ষমতা হারিয়ে ফেলে। ঠিক সে সময় তার উপার্জনক্ষম একমাত্র পুত্র নিজের পাঁচটি ছোট শিশু রেখে অকালে মৃত্যুবরণ করে। ফলে তাদের সংসারে চরম অভাব নেমে আসে। কয়েকদিন অনাহারে থাকার পর ক্ষুধার্ত শিশুদের আহাজারী সহ্য করতে না পেরে বৃদ্ধ নিজেই একদিন ভিক্ষা করতে বেরিয়ে পড়ে। সারাদিন দ্বারে দ্বারে ঘুরে সন্ধ্যা বেলায় সে শূন্য হাতে বাড়ী ফিরে। তাকে খালি হাতে ফিরতে দেখে ক্ষুধার্ত শিশুরা অধিক জোরে কান্না শুরু করে। তাদের কান্না সহ্য করতে না পেরে অসহায় বৃদ্ধটি কিছু সাহায্যের আশায় লাঠিতে ভর দিয়ে গির্জায় রক্ষিত দরিদ্র ভাণ্ডার থেকে কিছু সাহায্য প্রার্থনা করে। কিন্তু পাদরী তাকে তিরস্কার করে শূন্যহাতে ফিরিয়ে দেন। বিফল হয়ে গির্জা থেকে ফেরার সময় তার মানসপটে ভেসে উঠে কান্নারত ক্ষুধার্ত শিশুদের করুণ চিত্র। ঠিক সেই মুহূর্তে গরীবদের জন্য রক্ষিত তথাকার আটার বস্তাগুলোর প্রতিও তার দৃষ্টি নিবদ্ধ হয়। এগুলোকে সে তার মত অসহায় নিঃস্বদেরই সম্পদ মনে করে একটি আটার বস্তা পিঠে নিয়ে বাড়ীর দিকে রওয়ানা হয়। কিছুদূর অগ্রসর না হ'তেই সে মাটিতে পড়ে গিয়ে অজ্ঞান হয়ে পড়ে। গির্জার সন্ন্যাসীগণ বস্তাসহ তাকে পড়ে থাকতে দেখে চোর বলে সন্দেহ করে। ফলে তারা তাকে বন্দী করে কারাগারে নিক্ষেপ করে। আর এ চুরির অপরাধে তাকে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়। এ কাহিনী বর্ণনার পর বৃদ্ধাটি তার নিহত স্বামীকে শেষ বিদায় জানিয়ে নিজ গন্তব্যে ফিরে যায়।

বৃদ্ধার প্রত্যাবর্তনের কিছুক্ষণ পরই লেখক দেখতে পান যে, একজন ক্রন্দনরতা যুবতী শূলী কাষ্ঠে নিহত যুবকটির নিকট আগমণ করে এবং তার লাশ দেখে চেতনা হারিয়ে ফেলে। মেয়েটির ব্যথায় ব্যথিত হয়ে লেখকও কান্নায় ভেঙ্গে পড়েন। লেখকের কান্নার শব্দ শুনে মেয়েটি জ্ঞান ফিরে পেলে তিনি তার নিকট এ যুবকের করুণ পরিণতির প্রকৃত কারণ জানতে চান। মেয়েটি জানায় যে, এ নিহত যুবকটি তার আপন ভাই। একদিন আমীরের জনৈক কর্মচারী দলবলসহ তাদের গ্রামে গিয়ে তার এ ভাইয়ের নিকট করের টাকা দাবী করে। সে সময় তার ভাইয়ের হাতে কোন অর্থ না থাকায় সে তাদের নিকট আরো কয়েকদিন সময় চায়। কিন্তু তারা তার এ আবেদন প্রত্যাখ্যান করে করের পরিবর্তে তার এ যুবতী বোনকে (বর্ণনাকারিনীকে) জোরপূর্বক ধরে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে। তখন তার ভাই তাদেরকে বাধা দিলে তারা তাকে আক্রমণ করতে উদ্যত হয়। নিরুপায় হয়ে সে নিজের জীবন ও বোনের সম্ভ্রম রক্ষার্থে স্বীয় তরবারী দ্বারা এক কর্মচারীর মাথায় আঘাত করে। ফলে কর্মচারীটি তৎক্ষণাৎ মৃত্যুমুখে পতিত হয়। তখন আমীরের লোকজন তার এ ভাইকে ধরে এনে কারাগারে নিক্ষেপ করে। আর এ হত্যার অপরাধে তাকে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়। এ কাহিনী বর্ণনার পর মেয়েটি লেখকের সহায়তায় তার ভাইয়ের লাশটি দাফন করে। অতঃপর সে লেখকের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানিয়ে এবং মৃত ভাইকে শেষ বিদায় দিয়ে উক্ত স্থান ত্যাগ করে।

মেয়েটি চলে যাবার পর লেখক বধ্যভূমিতে পড়ে থাকা যুবতীর লাশটি দাফন করতে উদ্যত হন। এমন সময় এক যুবক এসে লাশটি দেখে কান্নায় ফেটে পড়ে এবং মেয়েটির জন্য উচ্চৈঃস্বরে কিছুক্ষণ দো'আ করে। অতঃপর তারা উভয়ে মিলে লাশটির দাফন কার্য সমাপ্ত করেন। এ কাজে সহায়তার জন্য যুবকটি লেখককে ধন্যবাদ জানিয়ে ফিরে যেতে উদ্যত হয়। সে সময় লেখক তার নিকট যুবতীটির প্রকৃত অপরাধ জানতে চান। তখন যুবকটি জানায় যে, এ নিষ্পাপ মেয়েটি তার প্রেমিকা। তারা উভয়ে শৈশবকাল

থেকেই পরস্পরকে ভালবাসত। অতঃপর যৌবনে পদার্পণ করলে তাদের বিয়ের ব্যাপারটি পাকাপাকি হয়ে যায়। সে সময় মেয়েটির বাবা হঠাৎ মারা গেলে তাদের বিয়ে এক বছর পিছিয়ে যায়। বছর পূর্তির কয়েকদিন পূর্বে তথাকার কাযী মেয়েটির অপরূপ সৌন্দর্য দর্শনে মোহিত হয়ে পড়েন। মেয়েটিকে বিয়ে করার জন্য তিনি অর্থের বিনিময়ে মেয়েটির চাচাকে বশ করেন। অর্থলোভী চাচা মেয়েটির অমতেই কাযীর সঙ্গে তার বিয়ের দিন ধার্য করে। নির্ধারিত দিনের সন্ধ্যাকালে মেয়েটি বাধ্য হয়ে বাড়ী থেকে পালিয়ে গিয়ে বাগদত্ত যুবকের গৃহে আশ্রয় নেয়। কিছুক্ষণের মধ্যেই মেয়েটির চাচা এবং কাযীর লোকজন সে বাড়ীটি তল্লাশী করে মেয়েটিকে খুঁজে বের করে। তারা ব্যাভিচারের অপবাদ দিয়ে তাকে ধরে নিয়ে গিয়ে কারাগারে নিক্ষেপ করে। যুবকটি বাধা দেয়ার চেষ্টা করলে তারা তার মাথায় সজোরে আঘাত করে। ফলে জ্ঞান হারা হয়ে সে কয়েকদিন বিছানায় পড়ে থাকে। এ সময়ের মধ্যেই মেয়েটিকে মিথ্যা অপবাদে অপরাধী সাব্যস্ত করে হত্যা করা হয়। আজ সন্ধ্যায় জ্ঞান ফেরার পর এ যুবকটি (বর্ণনাকারী) তার প্রেমিকার করুণ পরিণতির কথা জানতে পারে। তাই সে তাকে শেষ বিদায় জানানোর জন্য এখানে এসেছে। এ কাহিনী বর্ণনার পর যুবকটি বিদায় নিয়ে নিজ পথে রওয়ানা দেয়।

যুবকটির প্রস্থানের অল্পক্ষণ পরেই চাঁদ অস্তমিত হয়। বধ্যভূমিটি কৃষ্ণ ছায়ায় আচ্ছন্ন হয়ে পড়ে। গভীর রাতের নির্জনতা ভয়াবহরূপ ধারণ করে। ফলে ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে লেখক তথাকার এক উঁচু টিলায় আশ্রয় নেন। চিন্তিত মনে পাথরে মাথা রেখে তিনি আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকেন। হঠাৎ তিনি দেখতে পান যে, রক্তপূর্ণ গর্তটির ঠিক উপরে আকাশ হ'তে একটি উজ্জ্বল তারকা নেমে আসছে। কিছুদূর এসে সেটি এক আযাবের ফেরেশতার রূপ ধারণ করে। ভূ-পৃষ্ঠের নিকটবর্তী হয়ে কোথাও কোন পবিত্র অবতরণস্থল না পেয়ে সে কবর তিনটির পার্শ্ববর্তী বৃক্ষে অবতরণ করে। অতঃপর সে বজ্রকণ্ঠে বলতে থাকে, 'এ গোটা পৃথিবী পাপে পরিপূর্ণ হয়ে গেছে। ফেরেশতা নামার মত এখানে কোন পবিত্র স্থান অবশিষ্ট নেই। পৃথিবীর সর্বত্রই আল্লাহ্‌র গযব নেমে আসুক। রক্তের বন্যায় এ পৃথিবী ভেসে যাক। আর জগতবাসী এ বন্যায় ডুবে মরুক'।

ফেরেশতার এ অভিশাপ শেষ হ'তে না হ'তেই লেখক দেখতে পান যে, রক্তের গর্তটি হযরত নূহ (আঃ)-এর চুল্লীর মত উথলিয়ে উঠছে। সে রক্ত সজোরে প্রবাহিত হয়ে গোটা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়ছে। ধীরে ধীরে এ রক্তের বন্যা উপরের দিকে ফেঁপে উঠছে। এক এক করে তা পৃথিবীর সবকিছুকে ডুবিয়ে দিচ্ছে। অবশেষে ইহা লেখকের আশ্রয়স্থল টিলাটির শীর্ষচূড়া পর্যন্ত উত্থিত হয় এবং এর একটি প্রচণ্ড ঢেউ টিলাটির উপরিভাগে আঘাত হানে। ঢেউয়ের এ ভয়াবহ দৃশ্য দেখে লেখক সজোরে চিৎকার দেন। এর মধ্য দিয়ে তাঁর ঘুম ভেঙ্গে যায়।[১৪]

সমাজ চিত্রঃ সাহিত্য হ'ল সমাজের প্রতিচ্ছবি। বিশ্বের প্রতিটি সাহিত্যেই কোন না কোন সমাজের প্রতিচ্ছবি প্রতিফলিত হয়। সকল দেশ ও সকল ভাষার সাহিত্যিকগণ স্বীয় সমাজের দোষত্রুটি জনসম্মুখে তুলে ধরেন। সে ধারা অক্ষুন্ন রেখে মিসরের খ্যাতনামা সাহিত্যিক 'মানফালূতী'ও স্বীয় লেখনীর মাধ্যমে মিসরের সমাজ চিত্রকে পাঠকদের নিকট তুলে ধরেছেন। আলোচ্য 'আল-ইক্বাব' গল্পে তিনি মিসরীয় সমাজের নিঃস্ব-অসহায় লোকদের প্রতি বিত্তবান ক্ষমতাশালীদের নিষ্ঠুর ও অমানবিক আচরণের করুণ চিত্র ফুটিয়ে তুলেছেন। এ গল্পে তিনি মিসরের জনগণকে তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করেছেন। প্রথম শ্রেণীর মানুষ হ'ল সমাজের ক্ষমতাশীল সমাজপতিগণ। দ্বিতীয় শ্রেণীর লোক হ'ল ক্ষমতাশালীদের দলীয় লোকগণ। আর তৃতীয় শ্রেণীর মানুষ হ'ল সমাজের নিঃস্ব, অসহায় ও নির্যাতিত জনগণ। প্রথম শ্রেণীর ক্ষমতাশালীগণ দ্বিতীয় শ্রেণীর দাসানুদাস অনুসারীদের সমর্থনে ক্ষমতায় সমাসীন হন। আর তাদের সহায়তায় অধীনস্ত তৃতীয় শ্রেণীর নিঃস্ব লোকদের উপর তারা অমানবিক নির্যাতন চালান। ক্ষমতাসীনদের দলীয় সমর্থকদের সম্পর্কে লেখক আলোচ্য গল্পে বর্ণনা করেছেন, 'এসব লোক আমীরদেরকে কুকর্মে, কাযীগণকে অত্যাচারের ব্যাপারে এবং ধর্মীয় নেতাদেরকে চুরির কাজে সহায়তা করছে।'[১৫]

আলোচ্য 'আল-ইক্বাব' গল্পে লেখক মিসরীয় সমাজের তিনজন ক্ষমতাধর ব্যক্তির স্বেচ্ছাচারিতা, নিষ্ঠুরতা ও নির্যাতনের কথা তুলে ধরেছেন। এরা হ'লেন সে দেশের রাষ্ট্রপ্রধান আমীর, গির্জাপ্রধান পাদরী এবং প্রধান বিচারক কাযী। এ তিনজন স্বৈরাচারীর স্বেচ্ছাচারিতা ও নিষ্ঠুরতা তিনটি পরিবারের তিনজন অসহায় মানুষকে নৃশংসভাবে হত্যা করে কিভাবে পরিবার গুলোকে ধ্বংসের দিকে ঠেলে দিয়েছে- এ গল্পে লেখক তা সুন্দরভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন।

মিসরীয় সমাজে গির্জাপ্রধান পাদরী হ'লেন একজন ধর্মীয় নেতা ও গরীবদের জীবিকা বন্টনকারী। ধর্ম প্রচার ও ন্যায়-নীতির মাধ্যমে দরিদ্রদের মাঝে সুসম সম্পদ বন্টন করাই হ'ল তাঁর প্রধান দায়িত্ব। কিন্তু তিনি তাঁর এ পবিত্র দায়িত্ব থেকে দূরে সরে গিয়ে স্বেচ্ছাচারিতার মাধ্যমে গরীবদের জীবিকা নিয়ে ছিনিমিনি খেলছেন। গরীবদেরকে বঞ্চিত করে ঐ সম্পদকে তিনি যথা ইচ্ছা তথায় ব্যয় করছেন। তাঁর ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানকে তিনি চোরাই মালের আস্তানায় পরিণত করছেন। এ আস্তানায় উপবিষ্ট থেকে গরীবদের সম্পদকে চোরাই পথে নিজেই আত্মসাৎ করে তিনি বিলাসবহুল জীবন যাপন করছেন। ধর্মীয় নেতাদের

১৪. *মোস্তফা লুৎফী আল-মানফালূতী, আল-'আবারাত (বৈরুতঃ দারুল হুদাল ওয়াতানিইয়া, ১৯৪৬), পৃঃ ৯৯-১১৬।*

১৫. *هاهم الناس جميعا قد أصبحوا أعوانا للاء على شهواتهم والقضاة على ظلمهم- وزعماء الاديان على لصوصيتهم- ঐ, পৃঃ ১১৬।*

আচরণ সম্পর্কে লেখক বলেন, 'এসব ধর্মীয় নেতা পার্থিব নেতায় পরিণত হয়েছেন। তাঁরা তাঁদের উপাসনালয় গুলোকে চোরের আড্ডাখানায় পরিণত করেছেন। গরীবদের সম্পদ চুরি করে তথায় তাঁরা ধনের ভাণ্ডার গড়ে তুলেছেন'।[১৬]

'আল-ইক্বাব' গল্পে আমরা লক্ষ্য করি যে, একজন ক্ষুধার্ত বৃদ্ধ দু'মুঠো অন্নের আশায় পাদরীর নিকট গমন করে গির্জায় রক্ষিত দরিদ্রদের সম্পদ থেকে কিছু সাহায্য প্রার্থনা করে। কিন্তু পাদরী তাকে কোন সাহায্য না দিয়েই গির্জা থেকে তাড়িয়ে দেন। তখন বৃদ্ধটি অনাহারী মৃতপ্রায় সন্তানদের জীবন রক্ষার শেষ প্রচেষ্টা হিসাবে গির্জা থেকে একটি আটার বস্তা চুরি করে। পাদরী যদি বৃদ্ধটিকে কিছু সাহায্য করতেন, তাহ'লে সে চুরির কাজে পা বাড়াতনা। পাদরীর নিষ্ঠুরতার কারণেই সে চুরি করতে বাধ্য হয়েছে। তাই এ চুরির অপরাধের জন্য প্রকৃতপক্ষে পাদরীই দায়ী। এ জন্য তিনিই এ অপরাধের শাস্তি পাবার যোগ্য। কিন্তু শুধুমাত্র সমাজের নেতা হওয়ার সুবাদেই তিনি অপরাধী হিসাবে গণ্য হ'লেন না। বরং তিনি স্বীয় প্রভাব বলে নিজ অপরাধকে অসহায় বৃদ্ধটির ঘাড়ে চাপিয়ে দেন। স্বপক্ষীয় লোকদের সহায়তায় তিনি বৃদ্ধটিকে দোষী সাব্যস্ত করেন। এ কাজে আমীরকে হাতিয়ার রূপে ব্যবহার করে তিনি বৃদ্ধটিকে নৃশংসভাবে হত্যা করেন। এভাবে তিনি একটি অসহায় পরিবারকে অনিবার্য ধ্বংসের দিকে ঠেলে দেন।

আমীর হ'লেন মিসরীয় সমাজের সর্বপ্রধান কর্মকর্তা। প্রজাদের জান-মাল ও মান-সম্ভ্রম রক্ষা করাই তাঁর প্রধান কর্তব্য। কিন্তু তিনি তাঁর এ পবিত্র কর্তব্য ভুলে গিয়ে অসহায় জনগণের উপর অত্যাচারের ষ্টীম রোলার চালাচ্ছেন। তিনি সমাজের সাধারণ মানুষের কাঁধে ভর করে রাজ সিংহাসনে উপবিষ্ট হয়েছেন। তথায় আরোহণ করে তিনি মানুষের জান-মাল নিয়ে ছিনিমিনি খেলছেন। ফলে দেশের জনগণের জান-মাল ও মান-সম্ভ্রম হচ্ছে ভূলুণ্ঠিত। আর সাধারণ প্রজাগণ হচ্ছে তাঁর অত্যাচারের অসহায় শিকার। আমীরের কার্যকলাপ সম্পর্কে লেখক বলেন, 'এসকল আমীর আল্লাহ্র সঙ্গে ন্যায় প্রতিষ্ঠার অঙ্গীকার ভঙ্গ করেছেন। সত্য ও ন্যায় প্রতিষ্ঠার আল্লাহ প্রদত্ত তরবারীকে তাঁরা কোষবদ্ধ করেছেন। আর অত্যাচারের তরবারী ধারণ করে নিজেদের মনোবাসনা চরিতার্থ করছেন।'[১৭]

এ গল্পে আমরা প্রত্যক্ষ করি যে, আমীরের নির্দেশে তাঁর কর্মচারীগণ এক দরিদ্র যুবকের কাছে গিয়ে কর দাবী করে। অর্থের অভাবে যুবকটি তৎক্ষণাৎ কর পরিশোধ করতে অক্ষমতা প্রকাশ করলে তারা করের বিনিময়ে যুবকটির এক সুন্দরী বোনকে জোরপূর্বক ধরে নিয়ে যেতে উদ্যত হয়। তখন যুবকটি তরবারী দ্বারা এক কর্মচারীর মাথায় আঘাত করলে সে কর্মচারীটি নিহত হয়। আমীর যদি তার কর্মচারীদেরকে করের পরিবর্তে যুবতীটিকে ধরে আনার নির্দেশ না দিতেন, তাহ'লে তারা যুবতীটিকে বন্দী করার দুঃসাহস পেত না। আর পরিণামে যুবকটির দ্বারা রাজকর্মচারী হত্যার অবাঞ্ছিত ঘটনাটিও সংঘটিত হ'ত না। তাই যুবকটি রাজকর্মচারীকে হত্যা করলেও সে এ ব্যাপারে পুরোপুরি দায়ী নয়। কারণ সে আমীরের লোকদের অত্যাচারের কবল থেকে আত্মরক্ষার জন্য বাধ্য হয়েই আমীরের কর্মচারীকে হত্যা করেছে। সুতরাং এ ব্যাপারে প্রকৃত দোষী হ'লেন আমীর নিজেই। অথচ আমীর অপরাধী বলে গণ্য না হয়ে সুকৌশলে নিজের দোষ অসহায় যুবকটির ঘাড়ে চাপিয়ে দেন। বিচারে তিনি যুবকটিকে দোষী সাব্যস্ত করে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করেন। নিরপরাধ হত্যাকারীকে হত্যার নির্দেশ দিয়ে তিনিও হত্যাকারীর মতই অপরাধ করেছেন। অথচ তিনি এ অপরাধের দায়ে দণ্ডিত না হয়ে প্রজাদের নিকটে ন্যায়বিচারক হিসাবে পরিগণিত হন।

কাযী হ'লেন মিসরীয় সমাজের প্রধান বিচারক। ন্যায় পরায়ণতার সাথে সুষ্ঠু বিচার কার্য পরিচালনা করাই তাঁর পবিত্র কর্তব্য। কিন্তু তিনি তাঁর এ পবিত্র দায়িত্বকে জলাঞ্জলি দিয়ে নিজ খেয়ালখুশী মত বিচার কার্য পরিচালনা করছেন। স্বীয় স্বার্থ চরিতার্থের জন্য তিনি সাধারণ মানুষের উপরে অন্যায়-অত্যাচার করে চলেছেন। কেউ তাঁর স্বার্থে ব্যাঘাত ঘটালে তিনি তাকে মিথ্যা অপবাদে দোষী সাব্যস্ত করে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করছেন। অথচ তাঁর অপরাধের কোন বিচার হচ্ছে না। কাযীর নির্মম কার্যকলাপ সম্পর্কে লেখক বলেন, 'এসব কাযী লোভী ও অত্যাচারী হয়ে পড়েছেন। তাঁরা আইনকে ঢাল স্বরূপ ব্যবহার করে আইনের আড়াল থেকে জনগণকে আঘাত হানছেন অথচ নিজেরা আক্রান্ত হচ্ছেন না।[১৮]

আলোচ্য গল্পে আমরা দেখতে পাই যে, এক বাগদত্তা যুবতীকে কাযী অন্যায়ভাবে জোর পূর্বক বিয়ে করার বন্দোবস্ত করেন। তাই মেয়েটি নিরুপায় হয়ে বাড়ী থেকে পালিয়ে গিয়ে তার বাগদত্তা প্রেমিকের গৃহে আশ্রয় নেয়। কিন্তু কাযী সেখান থেকে মেয়েটিকে জোর করে ধরে আনেন। আর ব্যাভিচারের মিথ্যা অপবাদে মেয়েটিকে দোষী সাব্যস্ত করে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করেন। কাযী যদি মেয়েটিকে তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে বিয়ে করার ব্যাপারে শক্তি প্রয়োগ না করতেন, তবে মেয়েটিকে এভাবে পালাতে হ'ত না। আর এ অপরাধে তাকে ব্যভিচারের মিথ্যা অপবাদের শিকারও হ'তে হ'ত না। কাজেই এ ব্যাপারে প্রকৃত অপরাধী হ'লেন কাযী নিজেই। কিন্তু তিনি স্বীয় ক্ষমতাবলে নিজ অপরাধকে অসহায় মেয়েটির উপর চাপিয়ে দেন।

---

১৬. هاهم زعماء الدين قد أصبحوا زعماء الدنيا، فحوّلوا معابدهم الى مغاور لصوص يجمعون فيها ما يسرقون من أموال العباد-
ঐ, পৃঃ ১১৬।

১৭. هاهم الامراء قد خانوا عهد الله وخفروا ذمامه، فاغمدوا السيوف التى وضعها الله فى ايديهم لاقامة العدل والحق وتقلدوا سيوفا غيرها- وينالون منها ما يريدون-
ঐ, পৃঃ ১১৫।

১৮. هاهم القضاة قد طمعوا وظلموا- ووضعوا القانون ترسا امام اعينهم يصيبون من ورائه ولا يصابون-
ঐ, পৃঃ ১১৬।

ফলে এ নিরপরাধ মেয়েটিকে অপবাদের বোঝা কাঁধে নিয়ে এ সুন্দর পৃথিবী থেকে বিদায় নিতে হয়। নিরপরাধ মেয়েটিকে হত্যার নির্দেশ দিয়ে কাযী মূলতঃ হত্যা করারই অপরাধ করেন। অথচ তিনি এ অপরাধের দায়ে দণ্ডিত না হয়ে জনসমাজে একজন ন্যায়বিচারক হিসাবে পরিগণিত হন।

এমনিভাবে মিসরীয় সমাজে ক্ষমতাবান অপরাধীগণ নিরপরাধীতে পরিণত হচ্ছে। আর অসহায় নিরপরাধীগণ অপরাধীতে পরিণত হয়ে অহেতুক শাস্তি ভোগ করছে। অথচ তাদেরকে যাঁরা অপরাধের দিকে ঠেলে দিয়ে প্রকৃত অপরাধ করছেন, তাঁরা স্বীয় প্রভাব বলে শাস্তি থেকে রেহাই পেয়ে যাচ্ছেন। উপরন্তু তাঁরাই বিচারক সেজে নিঃস্ব নিরপরাধীদের জীবন নিয়ে ছিনিমিনি খেলছেন। এ সমাজের অভিনব বিচার ব্যবস্থায় এক অপরাধের শাস্তি আর একটি অপরাধের মাধ্যমে দেয়া হচ্ছে। এখানে হত্যাকারীকে শাস্তি দেয়া হচ্ছে তাকে হত্যার মাধ্যমে। সামান্য চুরির অপরাধে চোরকে অঙ্গ-প্রতঙ্গ কেটে মৃত্যুদণ্ড দেয়া হচ্ছে। ব্যাভিচারের মিথ্যা অভিযোগে অভিযুক্ত অপরাধীর স্বপক্ষীয় কোন বক্তব্য শোনা হচ্ছে না। অপরাধের প্রকৃত কারণ অনুসন্ধান করা হচ্ছে না। তাদেরকে ভাল হওয়ার সুযোগ না দিয়ে সামান্য অপরাধে গুরুদণ্ড প্রদান করা হচ্ছে।

আগুন দিয়ে যেমন আগুন নিভানো যায় না, বিষপানের মাধ্যমে যেরূপ বিষপানকারীর চিকিৎসা হয় না, ডান হাত কর্তিত ব্যক্তির চিকিৎসা যেমন হাত কর্তনের মাধ্যমে সম্ভব নয়, ঠিক তেমনিভাবে একটি খারাপ কাজকে আর একটি খারাপ কাজ দ্বারা নির্মূল করাও সম্ভব নয়। আগুন নিভানোর জন্য যেমন পানির দরকার, বিষপানকারীর ও হাতকাটা ব্যক্তির জন্য যেমন উপযুক্ত চিকিৎসার প্রয়োজন, ঠিক তেমনি অপরাধ দমনের জন্যও প্রয়োজন অপরাধীর প্রতি সহানুভূতি ও ক্ষমা প্রদর্শন। ক্ষমার মাধ্যমে একজন অপরাধী সংশোধিত হওয়ার সুযোগ পায়। এ পৃথিবীতে চলার পথে প্রতিটি মানুষ যেমন একেবারেই নিষ্পাপ নয়, ঠিক তেমনি মিসরের আমীর, পাদরী, কাযী কেউ-ই নবীদের মত নিষ্পাপ নন কিংবা ফেরেশতাদের মত পূত-পবিত্র নন। কিন্তু তাঁরা ক্ষমতা বলে তাঁদের পাপসমূহকে ঢেকে রাখতে সক্ষম হচ্ছেন। নিজেদের কৃত অপরাধের শাস্তি থেকে তাঁরা সব সময়ই রেহাই পাচ্ছেন। তাঁরা যদি তাঁদের কৃত অপরাধের কথা স্মরণ করে অপরাধীদের অপরাধকে ক্ষমা করে দিতেন, তবে এ অসহায় অভিযুক্ত লোকদেরকে অকালে প্রাণ বিসর্জন দিতে হ'ত না।

উপসংহারঃ পরিশেষে বলা যায় যে, তৎকালীন মিসরের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গ স্ব স্ব দায়িত্ব নিষ্ঠার সাথে পালন করতেন না। বরং তাঁরা ক্ষমতার অপব্যবহারের মাধ্যমে স্বৈরশাসন চালাতেন। ফলে সাধারণ মানুষ তাঁদের নির্যাতনের যাঁতাকলে নিষ্পেষিত হ'ত। লেখক মানফালূতী আলোচ্য গল্পে মিসরের এ সামাজিক অবক্ষয়ের অবসান কামনা করেছেন।

বিসমিল্লা-হির রহমা-নির রাহীম

রাজশাহী শুধু শিক্ষা নগরী বা রেশম নগরীই নয়, স্যুট তৈরীর জন্যও প্রসিদ্ধ।

এম এন টেইলার্স

৬৮, ৭৩ ও ৭৪ নং নিউমার্কেট, দোতলা, রাজশাহী। ✆ ঃ ৭৭৫৭৭৫

শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত

সহযোগী প্রতিষ্ঠান

অনুপম টেইলার্স

- চট্টগ্রাম, হাইওয়ে প্লাজাঃ ✆০৩১-৬১২৪৬৮
- ঢাকা, র‍্যানিকিন স্ট্রীটঃ ✆০২-২৩০৫৭৬
- পাবনা, রবি আইনুল মার্কেটঃ ✆ ৫৯৫৬

অনুপম সিল্ক গার্মেন্টস

- ঢাকা ওয়ারীঃ ✆ ০১৭৫৬০৭৪০
- পাবনা, হাসপাতাল সড়কঃ ✆ ০৭৩১-৫৯৫৬

লর্ডস

- আমেরিকা, নিউইয়র্কঃ ✆ ৯৩২৩৬৯৬

- প্রয়োজনে একদিনেও পোষাক সরবরাহ
- অটোমেটিক মেশিনে ফিউজিং
- স্যুটের জন্য মনোরম কভার
- কাপড়ের উন্মুক্ত মূল্য

সাদর আমন্ত্রণে

মুহম্মদ রফিকুল ইসলাম

'শিক্ষা যেমন মানুষকে স্বাবলম্বী করে, তেমনি সুন্দর পোষাক ব্যক্তিত্বকে বিকশিত করে'।

তোমরা তোমাদের সন্তানদের মাঝে ছালাতের ভালবাসা সৃষ্টি কর!

-মূলঃ মুহাম্মাদ ইবরাহীম হুওয়াইদী

*অনুবাদঃ আব্দুছ ছামাদ সালাফী**

আল্লাহপাক কুরআনে কারীমের বিভিন্ন স্থানে ছালাত সম্পর্কে এরশাদ করেন- 'নিশ্চয়ই নির্দিষ্ট সময়ে ছালাত আদায় করা মুমিনদের উপর ফরয' (নিসা ১০৩)। 'নিশ্চয় ছালাত অশ্লীল ও গর্হিত কাজ থেকে বিরত রাখে' (আনকাবুত ৪৫)। 'হে ঈমানদারগণ! তোমরা রুকূ' কর, সিজদা কর এবং তোমাদের পালনকর্তার ইবাদত কর'(হজ্জ ৭৭)। 'অবশ্যই মুমিনগণ সফলকাম হয়েছে, যারা নিজেদের ছালাতে বিনয়-নম্র' (মুমিনূন ১-২)। 'নিশ্চয়ই মানুষ চঞ্চল চিত্তরূপে সৃষ্টি হয়েছে। কোনরূপ বিপদে পড়লেই সে অতিমাত্রায় হা-হুতাশ আরম্ভ করে। আর যখন সে কোনরূপ কল্যাণ লাভ করে তখন কৃপণতা শুরু করে। তবে হ্যাঁ, ঐ সকল মুছল্লীর ব্যাপার স্বতন্ত্র, যারা তাদের ছালাতে সার্বক্ষণিক কায়েম থাকে' (মা'আরিজ ১৯-২৩)।

ছালাত পরিত্যাগকারীদের সম্পর্কে আল্লাহপাক এরশাদ করেন, 'অতঃপর তাদের পরে এল অপদার্থ লোকেরা। তারা ছালাত নষ্ট করলো এবং কুপ্রবৃত্তির অনুবর্তী হ'ল। সুতরাং তারা অচিরেই তাদের দুষ্কর্মের শাস্তি প্রত্যক্ষ করবে' (মারইয়াম ৫৯)। নবী করীম (ছাঃ) এরশাদ করেন, 'ক্বিয়ামতের দিন সর্বাগ্রে বান্দাহ্র ছালাতের হিসাব নেয়া হবে। যদি তা সঠিক সাব্যস্ত হয় তবে বাকী আমলও সঠিক বলে প্রমাণিত হবে। আর ছালাত ত্রুটিপূর্ণ হ'লে অবশিষ্ট আমলও ত্রুটিপূর্ণ হবে' *(তাবারানী, ফিকহুস সুন্নাহ 'ছালাত' অধ্যায় ১ম খণ্ড পৃঃ৭৮)*।

হযরত আবদুল্লাহ বিন মাসঊদ (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, একবার আমি নবী করীম (ছাঃ)-কে জিজ্ঞেস করলাম, সর্বোত্তম আমল কি? হুযূর (ছাঃ) উত্তরে বললেন, নির্দিষ্ট সময়ে ছালাত আদায় করা। পুনরায় জিজ্ঞেস করলাম, তারপর সর্বোত্তম আমল কি? তিনি বললেন, মাতা-পিতার সাথে সদ্ব্যবহার করা। পুনরায় জিজ্ঞেস করলাম, তারপর সর্বোত্তম আমল কি? তিনি বললেন, আল্লাহ্র রাস্তায় জিহাদ করা'*(আলবানী, মিশকাত হা/৫৬৮)*।

উপরোক্ত হাদীছ দ্বারা মুসলিম সমাজের প্রতিটি নারী-পুরুষের জীবনে ছালাতের গুরুত্ব ও তাৎপর্য সুস্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয়। তৎসঙ্গে ছেলে-মেয়েদেরকে ছালাতের প্রশিক্ষণের ক্ষেত্রে মাতা-পিতা ও অভিভাবকদের গুরুদায়িত্বের কথাও প্রমাণিত হয়।

ছেলে-মেয়েদেরকে বয়স ও জ্ঞানানুসারে ছালাতের প্রতি উৎসাহিত করা এবং ছালাত ছেড়ে দেয়ার কারণে ভীতি প্রদর্শন করার ক্ষেত্রে নবী করীম (ছাঃ)-এর নিম্নোক্ত বাণী বিশেষ গুরুত্ব বহন করে। যেমন তিনি বলেন, 'তোমরা সাত বছর বয়সে সন্তানদের ছালাত শিক্ষা দাও। দশ বছর বয়সে ছালাতের জন্য প্রহার কর এবং তাদের শয়নের বিছানা পৃথক করে দাও' *(মিশকাত হা/৫৭২)*।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর এ বাণী থেকে আমরা এ শিক্ষা পাই যে, শৈশব থেকেই আমাদের সন্তান-সন্ততিদেরকে বিশুদ্ধভাবে ছালাত আদায়ে অভ্যস্ত করতে হবে। সাথে সাথে বিশুদ্ধভাবে কুরআনুল কারীমের কিছু সূরা মুখস্থ করাতে হবে। যেন ছহীহ-শুদ্ধ ভাবে তা ছালাতে পড়তে সক্ষম হয়। এ জন্য প্রয়োজন শুরুতেই কুরআনুল কারীমের কিছু অংশ মুখস্থ করানো এবং শিশুদের বিশুদ্ধ তিলাওয়াত শিক্ষা দেয়া। তাহ'লে তাদের অন্তরে ঈমান গভীরভাবে বদ্ধমূল হবে। তারা আগ্রহ, মহব্বত, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি ভালোবাসা এবং আল্লাহ ভীতির সাথে ছালাত আদায়ে উদ্বুদ্ধ হবে। ফলে তাদের অন্তরে এটা বদ্ধমূল হয়ে তা দ্বারা তাদের কোমল অনুভূতি আলোকিত হবে। তাদের মধ্যে সুষ্ঠু জ্ঞান ও চিন্তা জন্ম নিবে এবং দ্বীনি প্রশিক্ষণের উপর তারা পরিপক্কতা লাভ করবে।

আর এটা ততক্ষণ পর্যন্ত সম্ভব নয়, যতক্ষণ না আমরা শিশুদেরকে যত্ন ও ধৈর্য-সহনশীলতার সাথে গ্রহণ করব। আমাদেরকে শুধু বক্তৃতা ও নছীহতের উপর নির্ভর করে থাকা চলবে না, যা শিশুদেরকে ছালাতের প্রতি উদ্বুদ্ধকরণে ফলপ্রসূ হ'তে পারে না। বরং তা হ'তে পারে উত্তম আদর্শ ও তাদেরকে ছালাতের প্রতি অব্যাহত উৎসাহ দানের মাধ্যমে। এক্ষেত্রে শিশুর প্রতিপালনকারীকে হ'তে হবে তার জন্য জীবন্ত ও সুস্পষ্ট দৃষ্টান্ত। ছালাতের প্রতি দাওয়াত, তাকবীর, রুকূ, সিজদা তথা ছালাতের যাবতীয় রুকন সমূহ আদায়ের ক্ষেত্রে। সাথে সাথে তাকে ওযূর বিশুদ্ধ পদ্ধতিও শিখাতে হবে এবং পূর্ণাঙ্গ ছালাত আদায়ের মাধ্যমে তাদের সামনে তার বাস্তব চিত্র তুলে ধরতে হবে। পানি, শরীর ও কাপড়ের পবিত্রতা এবং ছালাতের যাবতীয় আবশ্যকীয় পূর্বশর্তসমূহ বাড়ীতে ও বিদ্যালয়ে যথোপযুক্ত ও সুস্পষ্ট পদ্ধতিতে শিখিয়ে দিতে হবে। কারণ, বাস্তব প্রয়োগই শিশুদের শিক্ষা গ্রহণের সর্বোৎকৃষ্ট পন্থা। অতঃপর শিশুরা পিতা-মাতা ও শিক্ষক-শিক্ষিকাগণের সামনে ছালাতে দাঁড়াবে ও তাদের ভুল-ত্রুটি সংশোধন করবে। কখনও উপদেশমূলকভাবে আবার কখনও কোমলতা মিশ্রিত কঠোরতার সাথে। প্রয়োজনবোধে বিদ্যালয়ে পাঠ দানের সহায়ক হিসাবে ছালাত আদায়ের চিত্রযুক্ত বোর্ড কিংবা শিক্ষামূলক ভিডিও ফিল্ম ব্যবহার করা যেতে পারে। যেগুলোর মাধ্যমে শিশুরা বিশুদ্ধভাবে ছালাত আদায়ের পদ্ধতি শিখতে সক্ষম হবে। তবে বিদ্যালয়ে অবস্থিত

* *সিনিয়র নায়েবে আমীর, আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ ও অধ্যক্ষ, আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, নওদাপাড়া, রাজশাহী।*

ছালাতের স্থান কিংবা নিকটবর্তী মসজিদে সময়মত জামা'আতের সাথে ছালাত আদায় করা, পিতা নিজ ছেলেদেরকে সাথে নিয়ে মসজিদে যাওয়া এবং মসজিদে অবস্থান ও ছালাত আদায়ের আদবসমূহ হাতে কলমে শিক্ষা দেয়াই শিশুদের জন্য সর্বাধিক কার্যকর পদ্ধতি। কখনও কখনও ছোট ছেলেদের কাছে স্কুলে কিংবা বাড়ীতে কেবলার দিক অস্পষ্ট থাকে। এ জন্য শিক্ষক-শিক্ষিকা ও পিতা-মাতার কর্তব্য হ'ল শিশুদেরকে স্পষ্টরূপে কেবলা বুঝিয়ে দেয়া যেন তারা যেখানেই থাকুক না কেন, কেবলা নিরুপণ করতে কোন নির্দিষ্ট স্থানের সাথে সীমাবদ্ধ না থাকতে হয়। সকলেরই জানা যে, আমাদের দেশে সকল শিক্ষা পদ্ধতিতেই শিশুদেরকে কম্পাস শিক্ষা দানের ব্যবস্থা রয়েছে। সুতরাং কম্পাসকে দিক নির্ণয় শিক্ষা দানের সহায়ক হিসাবে এবং দিক চিনার জন্য তা ব্যবহারের উপর ছাত্রদেরকে বাস্তব প্রশিক্ষণ দান প্রয়োজন। যেন ধর্মীয় বিষয় সমূহে আধুনিক বিজ্ঞানকে কাজে লাগানোর যোগ্যতা ছোটদের মধ্যে সৃষ্টি হয় এবং এর উপর আমরা সাধ্যমত নিয়ন্ত্রণ লাভ করতে সক্ষম হই।

শিশুদের মধ্যে ছালাতের আগ্রহ ও ভালবাসা সৃষ্টিতে তাদের সামনে ছালাত সংক্রান্ত হাদীছ সমূহ পেশ করা উচিত। যেমন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, 'যখন কোন ব্যক্তি ছালাতের উদ্দেশ্যে ওযূ করে এবং দু'হাত কব্জি সহ ধৌত করে, তখন পানির প্রথম ফোঁটার সাথে সাথে দু'হাতের গোনাহ সমূহ ঝরে যায়, যখন সে চেহারা ধৌত করে তখন প্রথম ফোঁটার সাথে সাথে কান ও চোখের গোনাহ সমূহ ঝরে যায় এবং যখন সে দু'হাত কনুই পর্যন্ত এবং দু'পা টাখনু সহ ধৌত করে, তখন সে হাত ও পায়ের গোনাহ সমূহ থেকে পরিত্রাণ লাভ করে এবং নবজাত শিশুর ন্যায় নিষ্পাপ হয়ে যায়। অতঃপর যখন সে ছালাতের জন্য দাঁড়ায়, আল্লাহ তা'আলা তার মর্যাদা বৃদ্ধি করতে থাকেন এবং যখন সে বসে, তখন নিরাপদে বসে' (আহমাদ, সনদ ছহীহ -আলবানী)। বুরাইদা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, আমাদের ও তাদের মাঝে যে প্রতিশ্রুতি রয়েছে, তা হ'ল ছালাত। যে ছালাত ছেড়ে দিল, সে কুফরী করল' *(আহমাদ, তিরমিযী, নাসাঈ, ইবনু মাজাহ, মিশকাত হা/৫৭৪)*।

এভাবে সন্তানদেরকে সতর্কতা ও উৎসাহ দানের মাধ্যমে শিক্ষা দান করতে হবে, যাতে বাল্যকাল থেকেই তাদের কোমল হৃদয়ে ছালাতের গুরুত্ব ও ভালবাসা বদ্ধমূল হয়ে যায়।

মুস'আব বিন সা'দ (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি আমার আব্বাকে বললাম, আপনি কি কুরআনের এই আয়াতটি লক্ষ্য করেছেন 'দুর্ভোগ সে সব ছালাত আদায়কারীর জন্য যারা তাদের ছালাত সম্পর্কে বে-খবর' (মাঊন ৫)? আমাদের মধ্যে এমন কে আছে যে ছালাত সম্পর্কে উদাসীন নয়? কে আছে যে ছালাতে অন্য চিন্তা করে না? তিনি বললেন, আয়াতের এ উদ্দেশ্য নয় বরং এর অর্থ হ'ল- হাসি-তামাশার মধ্য দিয়ে ছালাতের সময় নষ্ট করে দেয়া (আবু ইয়া'লা)। অনুরূপ ছালাত ত্যাগের শাস্তি আলোচনার সাথে সাথে লোক দেখানো ছালাতের ব্যাপারেও ভীতি-প্রদর্শন করা উচিত। আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) বর্ণনা করেন, একবার নবী করীম (ছাঃ) আমাদের নিকট আসলেন, তখন আমরা দাজ্জাল প্রসঙ্গে আলোচনা করছিলাম। হুযূর (ছাঃ) বললেন, 'আমি কি তোমাদেরকে কিছু বলব? সকলে বললাম, বলুন হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)! তিনি বললেন, অপ্রকাশ্য শিরক হ'ল লোক দেখানোর উদ্দেশ্যে স্বীয় ছালাতকে সুশোভিত করা' *(ইবনু মাজাহ)*।

আমাদের আরো কর্তব্য হ'ল, আমাদের সন্তানদেরকে আযান, ইক্বামত ও আযানের দো'আ শিক্ষা দেয়া। শরীয়ত সম্মত বিশুদ্ধ আযানের প্রশিক্ষণ দেয়া। প্রত্যেক ছালাতের সময় পালাক্রমে তাদের মাধ্যমে আযান দেওয়ানোর ব্যবস্থা করা। যাতে প্রতিটি ছাত্র বিশুদ্ধ ভাবে আযান দিতে সক্ষম হয়। একাকী অথবা জামা'আতের সাথে ছালাত আদায়ের ব্যবস্থা করা এবং তাদের অন্তরে জামা'আতে ছালাত আদায়ের মুহাব্বত পয়দা করা। আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'মানুষ যদি আযান ও প্রথম কাতারের ফযীলত জানত এবং তা অর্জন করা লটারী ব্যতীত সম্ভব না হ'ত, তাহ'লে লটারী করে হ'লেও তা অর্জনে সচেষ্ট হ'ত এবং যদি তারা সকাল সকাল ছালাতে যাওয়ার ফযীলত জানত, তাহ'লে এর জন্যে প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হ'ত। আর যদি এশা ও ফজরের ছালাতের ফযীলত জানত, তাহ'লে হামাগুড়ি দিয়ে হ'লেও তাতে অংশগ্রহণ করত' *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৬২৮)*।

সুতরাং আমাদের কর্তব্য হ'ল নিজ সন্তান-সন্ততিদের মধ্যে ছালাতের মুহাব্বত ও আগ্রহ সৃষ্টি করা। মনে রাখতে হবে, সন্তান-সন্ততিদের যথার্থ প্রতিপালনের মূল ভিত্তিই হ'ল ছেলেমেয়েদেরকে বাড়িতে ও বিদ্যালয়ে ছালাতের প্রশিক্ষণ দান এবং কোন অবস্থাতেই এ অলংঘনীয় বিধানের প্রতি উদাসীনতা প্রদর্শন না করা। কারণ, তা ছোট বড় যে কোন সমাজে তারবিইয়াত বা প্রশিক্ষণ দানের ক্ষেত্রে সর্বাধিক অগ্রাধিকার যোগ্য। ছেলে-মেয়েদেরকে ছালাতের প্রতি আগ্রহী ও যত্নশীল করার ক্ষেত্রে অব্যাহত প্রচেষ্টার মাধ্যমেই মহান আল্লাহ তা'আলার এক অলংঘনীয় বিধান সমুন্নত করে অভিষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছতে পারি এবং লাভ করতে পারি ইহ-পরকালীন সৌভাগ্য। আল্লাহ আমাদের তাওফীক দিন। আমীন!!

মহানবী (ছাঃ) মানুষ ছিলেন কি-না?

*-অধ্যাপক মুহাম্মাদ সাইফুল ইসলাম**

মহান রাব্বুল আলামীন স্বীয় পরিকল্পনার বাস্তব রূপায়ণের নিমিত্তে সৃষ্টির উষালগ্ন থেকেই মানবগোষ্ঠীর মধ্য থেকে বাছাই করে বিশেষ বিশেষ ব্যক্তিকে অহি-র মাধ্যমে পরিপুষ্ট করতঃ নবুঅতের গুরু দায়িত্ব দিয়ে মানবতার হেদায়াতের উদ্দেশ্যে এ ধরাধামে প্রেরণ করেছেন। এ ধারার সর্বপ্রথম হ'লেন হযরত আদম (আঃ) এবং সর্বশেষ নবীকূল শিরভূষণ হযরত মুহাম্মাদ (ছাঃ)। 'অহি' বা প্রত্যাদেশ ছাড়াও তাঁদের প্রত্যেকের মাধ্যমেই সংঘটিত হয়েছে কিছু না কিছু মু'জেযা বা অলৌকিক ক্রীয়াকলাপ। আবার চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের দিক দিয়েও তাঁরা ছিলেন অনন্য বৈশিষ্ট্যের অধিকারী। এসব মু'জেযা ও বৈশিষ্ট্যের কাঠামোতে জোড়াতালি লাগিয়ে তিলকে তাল বানিয়ে তাঁদের তিরোধানের পর কিছু সংখ্যক অতিভক্ত জাহেল অনুসারী তাঁদের কাউকে স্বয়ং আল্লাহ বানিয়েছে, কাউকে আল্লাহ্র পুত্র, আর কারো সত্ত্বায় স্বয়ং আল্লাহ্র প্রতিফলন ঘটেছে বা দেবত্ব লাভ করেছে বলে মূর্খতার চরম পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করেছে। অথচ বাস্তব ক্ষেত্রে তাঁরা সকলেই মানব বংশ ধারার মাধ্যমেই আগমন করেছেন এবং মানবীয় কামনা-বাসনা ও ভাবাবেগও তাঁদের ছিল। তাঁরা প্রত্যেকেই আচার-আচরণ, আকৃতি-প্রকৃতি, স্বভাব-চরিত্র, পানাহার, বিচার-আচার, ব্যবসা-বাণিজ্য, চলা-ফিরা, উঠা-বসা, শয়ন-জাগরণ এসব দিক দিয়ে মানবকূলের সাথে একাকার ছিলেন। এতদসত্ত্বেও অতিশয়োক্তির প্রশ্রয় নিয়ে তাঁদের মানবত্বকে অস্বীকার করা হচ্ছে।

শিক্ষা-সংস্কৃতির এ চরম উন্নতির যুগেও কেউ কেউ নবী করীম (ছাঃ)-কে শুধু মানুষ হিসাবে মেনে নিতেই অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করছে না বরং এরূপ বলাকে কুফরী কালাম বলছে এবং যারা তা বলে তাদেরকে 'কাফের' হিসাবে আখ্যায়িত করতঃ বিদ্যার বহর দেখাতে কসুর করছে না। এদের এ অজ্ঞতাপ্রসূত মন্তব্যের প্রতিবাদে প্রকৃত সত্যের উদঘাটন মানসেই আমার এ প্রবন্ধের অবতারণা। প্রকৃত সত্য তো এটাই যে, শুধু মহানবী হযরত মুহাম্মাদ (ছাঃ) কেন পৃথিবীর সূচনালগ্ন থেকে যত নবী-রাসূল এসেছেন, তাঁরা সকলেই মানুষ ছিলেন। আর এটাই তো কাফের বে-দ্বীন ও বিরুদ্ধবাদীদের সবচাইতে বড় অসহনীয় ছিল। তারা মানবত্বকে নবুঅত ও রিসালাতের পরিপন্থী মনে করত। আর এ কারণেই রক্ত-মাংসে গড়া মানুষ দেখে একের পর এক অজুহাত তুলে তাঁদেরকে অস্বীকার করে এসেছে। মহাগ্রন্থ আল-কুরআনে বিরুদ্ধবাদীদের মনগড়া ও খোঁড় অজুহাতগুলো বিভিন্ন স্থানে বিবৃত হয়েছে। এরা বলেছে যে, নবী-রাসূলের দাবিদাররা তো আমাদের মতই মানুষ। তাঁদের মাঝে তো কোন অসাধারণত্ব বা বিশেষ বৈশিষ্ট্য দেখছিনা। তাঁরা মানুষের পরিবেশ থেকেই আগত, সাধারণ মানুষের মতই হাট-বাজার করেন, ঘর-সংসার পরিচালনা করেন, স্ত্রী-পুত্র, পরিবার-পরিজন নিয়ে বসবাস করেন। ক্ষুধা-তৃষ্ণা, পানাহার, সর্দি-গর্মী সবই তাঁদের আছে। এককথায় মানবীয় কামনা-বাসনার উর্ধ্বে তো তাঁরা নন। তাই মানবীয় প্রবৃত্তির অধীন সত্ত্বাকে তারা নবী-রাসূল হিসাবে মেনে নিতে সম্পূর্ণ অস্বীকৃতি জানিয়েছে। বস্তুতঃ নবী-রাসূলগণ যে মানুষ ছিলেন তাতে তাদের সন্দেহ থাকার কথাও নয়। কারণ, হঠাৎ করে কোথা থেকে উড়ে এসে জুড়ে বসা ব্যক্তি তো তাঁরা ছিলেন না। তাঁরা ওদের পরিবেশেই জন্মগ্রহণ করেছেন এবং শৈশব ওদের মধ্যেই প্রতিপালিত। তাঁদের সম্পর্কে ওরা তো সম্পূর্ণই ওয়াকিফহাল ছিল। তাই ওরা তাঁদেরকে মেনে নিতে পারেনি। বরং তৎপরিবর্তে অজুহাত তুলে বলেছে যে, আল্লাহ প্রয়োজন বোধ করলে কোন ফেরেশতাকেই এ কাজের দায়িত্ব দিয়ে পাঠাতে পারতেন অথবা তাঁদের সাথে সহায়ক হিসাবে ফেরেশতা পাঠাতেন। দুশ্চিন্তাহীন জীবন-যাপনের সুবিধার্থে তাঁদেরকে অঢেল সম্পদ, বাগ-বাগিচা ও বাদশাহী দেয়া হ'ত।

এত আপত্তি সত্ত্বেও আল্লাহ পাক কোন সময় বলেননি যে, হ্যাঁ, তাঁরা মানুষের আকৃতিতে দেবত্বপ্রাপ্ত সত্ত্বা বা অন্য কিছু। আর নবী-রাসূলরাও বলেননি যে, হ্যাঁ, তোমরা যা ধরেছ তাই সত্য-সঠিক। আমাদেরকে যদিও তোমরা মানব রূপে দেখছ আসলে এটা আমাদের বাহ্যিক রূপ মাত্র। এমন অযৌক্তিক জবাব কি কুরআন-হাদীছ খুঁজে একটিও পাওয়া যাবে? বরং তার বিপরীতে নবী-রাসূলগণ যে মানুষ ছিলেন সে সম্পর্কে আল-কুরআনের অসংখ্য আয়াতে উল্লেখিত হয়েছে।

মক্কার কাফেররাও প্রাচীন কাল থেকে চলে আসা এ ভ্রান্তির খপ্পর থেকে বাঁচতে পারেনি। তারাও বলেছে যে, মুহাম্মাদ আল্লাহ্র রাসূল নয়। কেননা সে তো মানুষ। আর এ কারণেই মহান আল্লাহ এদের ভ্রান্তির অপনোদন কল্পে পূর্ববর্তী অনেক নবীর জীবনেতিহাসের উল্লেখ করে জানিয়ে দিয়েছেন যে, এটা শুধু এদেরই ধারণা নয় বরং সর্বযুগের দ্বীনের দাওয়াত গ্রহণে অনিচ্ছুক ব্যক্তিদেরই এ অভিমত।

নিম্নে কাফেরদের উত্থাপিত অজুহাত ও তৎপ্রেক্ষিতে আল্লাহ পাকের জবাব সম্বলিত আয়াতসমূহের উদ্ধৃতি পেশ করা হলঃ-

* প্রথম নবী হযরত আদম (আঃ) মানুষ ছিলেন। এ সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেন,

** সহকারী অধ্যাপক, প্রেমতলী কলেজ, প্রেমতলী, রাজশাহী।*

اِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلاَئِكَةِ اِنِّىْ خَالِقٌ بَشَرًا مِّنْ طِيْنٍ

'সে সময়ের কথা ভেবে দেখ, যখন তোমার রব ফেরেশতাদেরকে বললেন, আমি মাটি দিয়ে মানুষ সৃষ্টিকারী' (ছোয়াদ ৭১)।

* হযরত নূহ (আঃ) সম্পর্কে তাঁর জাতির নেতৃস্থানীয় লোকেরা বলেছে,

فَقَالَ الْمَلَؤُا الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ قَوْمِهِ مَا هَذَا اِلاَّ بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُرِيْدُ اَنْ يَّتَفَضَّلَ عَلَيْكُمْ ط وَلَوْ شَاءَ اللّٰهُ لَاَنْزَلَ مَلاَئِكَةً ج مَا سَمِعْنَا بِهذَا فِىْ اٰبَائِنَا الْاَوَّلِيْنَ

'তাঁর কওমের কাফের প্রধানগণ বলল, এতো তোমাদের মতই একজন মানুষ বৈ নয়। সে তোমাদের উপর প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত করতে চায়। আল্লাহ ইচ্ছা করলে ফেরেশতাকেই নাযিল করতে পারতেন। আমরা আমাদের পূর্ব পুরুষদের নিকট এরূপ কখনও শুনিনি' (মুমিনূন ২৪)।

فَقَالَ الْمَلَأُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ قَوْمِهِ مَا نَرَاكَ اِلاَّ بَشَرًا مِّثْلَنَا وَمَا نَرَاكَ اتَّبَعَكَ اِلاَّ الَّذِيْنَ هُمْ اَرَاذِلُنَا بَادِىَ الرَّأْىِ ج وَمَا نَرٰى لَكُمْ عَلَيْنَا مِنْ فَضْلٍ بَلْ نَظُنُّكُمْ كَاذِبِيْنَ –

'তখন তার কওমের প্রধানরা বলল, আমরা তো তোমাকে আমাদের মত একজন মানুষ ব্যতীত আর কিছু মনে করিনা। আর আমাদের মধ্যে যারা ইতর ও স্থূলবুদ্ধি সম্পন্ন তারা ব্যতীত কাউকে তো তোমার আনুগত্য করতে দেখিনা এবং আমাদের উপর তোমাদের কোন প্রাধান্য দেখিনা, বরং তোমরা সবাই মিথ্যাবাদী বলেই আমরা মনে করি' (হূদ ২৭)।

এসবের জবাবে নূহ (আঃ) বলেন,

وَلاَ اَقُوْلُ لَكُمْ عِنْدِىْ خَزَائِنُ اللّٰهِ وَلاَ اَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلاَ اَقُوْلُ اِنِّىْ مَلَكٌ ..

'আমি একথা বলি না যে, আমার নিকটে ধনভাণ্ডার রয়েছে। আমি গায়েবের খবরও রাখিনা এবং আমি ফেরেশতাও নই...' (হূদ ৩১)।

* আদ জাতির লোকেরা হযরত হূদ (আঃ) সম্পর্কে বলেছে-

... مَا هَذَا اِلاَّ بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يَأْكُلُ مِمَّا تَأْكُلُوْنَ مِنْهُ وَيَشْرَبُ مِمَّا تَشْرَبُوْنَ، وَلَئِنْ اَطَعْتُمْ بَشَرًا مِّثْلَكُمْ اِنَّكُمْ اِذًا لَّخَاسِرُوْنَ –

'এ তো তোমাদের মতই মানুষ ছাড়া আর কিছু নয়। তোমরা যা খাও সেও তাই খায়, তোমরা যা পান কর সেও তাই পান করে। এখন তোমরা যদি তোমাদেরই মত একজন মানুষের আনুগত্য কর, তাহ'লে তোমরা অবশ্যই ক্ষতিগ্রস্থ হবে' (মুমিনূন ৩৩ ও ৩৪)।

* ছামূদ জাতির লোকেরা হযরত ছালেহ (আঃ) সম্পর্কে বলেছে,

فَقَالُوْا اَبَشَرًا مِّنَّا وَاحِدًا نَّتَّبِعُهُ – اِنَّا اِذًا لَّفِىْ ضَلاَلٍ وَّ سُعُرٍ –

'তারা বলল, আমরা কি আমাদেরই মধ্যকার একজন মানুষের অনুসরণ করব? তবে তো আমরা বিপথগামী ও উম্মাদরূপে গণ্য হ'ব' (আল-ক্বামার ২৪)।

* হযরত ছালেহ ও শো'আইব (আঃ) সম্পর্কে তারা বলেছে,

مَا اَنْتَ اِلاَّ بَشَرٌ مِّثْلُنَا ج فَاْتِ بِاٰيَةٍ اِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِيْنَ –

'তুমি তো আমাদের মতই একজন মানুষ। তুমি সত্যবাদী হয়ে থাকলে নিদর্শন নিয়ে এস' (শু'আরা ১৫৪)।

وَمَا اَنْتَ اِلاَّ بَشَرٌ مِّثْلُنَا وَاِنْ نَّظُنُّكَ لَمِنَ الْكَاذِبِيْنَ

'আর তুমি আমাদের মত একজন মানুষ ছাড়া আর কিছু নও। আমরা তোমাকে মিথ্যাবাদীই মনে করি' (শু'আরা ১৮৬)।

* হযরত ঈসা (আঃ) তাঁর জাতিকে উদ্দেশ্য করে বলেছেন,

اِنِّىْ عَبْدُ اللّٰهِ ط اٰتٰنِىَ الْكِتٰبَ وَجَعَلَنِىْ نَبِيًّا

'আমি আল্লাহ্‌র বান্দা। আমাকে আল্লাহ্‌পাক কিতাব দান করেছেন এবং নবী বানিয়েছেন' (মারইয়াম ৩০)।

* হূদ (আঃ) সম্পর্কে আল্লাহ বলেন,

وَاِلٰى عَادٍ اَخَاهُمْ هُوْدًا

'আদ সম্প্রদায়ের কাছে প্রেরণ করেছি তাদের ভাই হূদকে' (আ'রাফ ৬৫)।

* কোন এক জনপদে দু'জন এবং পরে আরও একজন এসে বলেছিলেন, আমরা তোমাদের প্রতি প্রেরিত হয়েছি। জনবসতির লোকেরা বলল-

مَا اَنْتُمْ اِلاَّ بَشَرٌ مِّثْلُنَا – وَمَا اَنْزَلَ الرَّحْمٰنُ مِنْ شَىْءٍ اِنْ اَنْتُمْ اِلاَّ تَكْذِبُوْنَ –

'তোমরা তো আমাদের মতই মানুষ। পরম করুণাময়

আল্লাহ আসলে কিছুই নাযিল করেননি। তোমরা শুধু মিথ্যা কথাই বলছ' (ইয়াসীন ১৫)।

নবী শ্রেষ্ঠ হযরত মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর প্রতিও তাঁর মানবত্বের কারণে মক্কার কাফেরদের পক্ষ হ'তে অস্বীকৃতির অজুহাত উত্থাপিত হয়েছিল। মহান আল্লাহ তাদের খোঁড়া অজুহাতের জবাব দিয়ে বলেন যে, এটা তো নতুন কোন অজুহাত নয়। বরং সর্বযুগের কাফেরদের উক্তি ও ভূমিকা একইরূপ। আল্লাহ বলেন,

وَقَالُوْا مَالِ هذَا الرَّسُوْلِ يَأْكُلُ الطَّعَامَ وَيَمْشِىْ فِى الْاَسْوَاقِ ط لَوْلاَ اُنْزِلَ اِلَيْهِ مَلَكٌ فَيَكُوْنَ مَعَهُ نَذِيْرًا، اَوْ يُلْقٰى اِلَيْهِ كَنْزٌ اَوْ تَكُوْنُ لَهُ جَنَّةٌ يَّأْكُلُ مِنْهَا ط وَقَالَ الظّٰلِمُوْنَ اِنْ تَتَّبِعُوْنَ اِلاَّ رَجُلاً مَّسْحُوْرًا-

'তারা বলে, এ কেমন রাসূল যে আহার করে, হাট-বাজারে চলাফেরা করে? তাঁর কাছে কেন কোন ফেরেশতা নাযিল করা হ'লনা? যে তাঁর সাথে সতর্ককারী হয়ে থাকত। তিনি ধন-ভাণ্ডার প্রাপ্ত হ'লেন না কেন? অথবা তাঁর একটি বাগান নেই কেন? যা থেকে তিনি আহার করতেন। যালিমরা বলে, তোমরা একজন যাদুগ্রস্থ ব্যক্তিরই অনুসরণ করছ' (ফুরক্বান ৭৩৮)।

وَمَا اَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ اِلاَّ رِجَالاً نُّوْحِىْ اِلَيْهِمْ مِنْ اَهْلِ الْقُرٰى ..

'আপনার পূর্বে আমি যতজনকে রাসূল করে প্রেরণ করেছি, তাঁরা সবাই লোকালয়ের মধ্য থেকে একেকজন পুরুষ মানুষই ছিলেন। আমি তাঁদের কাছে অহি প্রেরণ করতাম...' (ইউসুফ ১০৯)।

وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا رُسُلاً مِّنْ قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ اَزْوَاجًا وَّذُرِّيَّةً -

'আপনার পূর্বে আমি অনেক রাসূল প্রেরণ করেছি এবং তাঁদেরকে পত্নী ও সন্তান-সন্ততি দিয়েছি...' (রা'দ ৩৮)।

وَمَا اَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنَ الْمُرْسَلِيْنَ اِلاَّ اِنَّهُمْ لَيَأْكُلُوْنَ الطَّعَامَ وَيَمْشُوْنَ فِى الْاَسْوَاقِ -

'আপনার পূর্বে যত রাসূল প্রেরণ করেছি, তাঁরা সবাই খাদ্য গ্রহণ করতেন এবং হাট-বাজারে চলাফেরা করতেন...' (ফুরক্বান ২০)।

اَكَانَ لِلنَّاسِ عَجَبًا اَنْ اَوْحَيْنَا اِلٰى رَجُلٍ مِّنْهُمْ اَنْ اَنْذِرِ النَّاسَ وَبَشِّرِ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اَنَّ لَهُمْ قَدَمَ صِدْقٍ عِنْدَ رَبِّهِمْ ط قَالَ الْكَافِرُوْنَ اِنَّ هذَا لَسَاحِرٌ مُّبِيْنٌ -

'মানুষের কাছে কি আশ্চর্য্য লাগছে যে, আমি 'অহি' পেরণ করেছি তাদেরই মধ্য থেকে একজনের কাছে? যেন তিনি মানুষকে সতর্ক করেন এবং সুসংবাদ শুনিয়ে দেন ঈমানদারগণকে যে, তাদের জন্য সত্যিকারের পদমর্যাদা রয়েছে তাদের পালনকর্তার কাছে। কাফেরেরা বলতে লাগল, নিঃসন্দেহে এ লোক যাদুকর' (ইউনূছ ২)।

اَوَعَجِبْتُمْ اَنْ جَاءَكُمْ ذِكْرٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ عَلٰى رَجُلٍ مِّنْكُمْ لِيُنْذِرَكُمْ وَلِتَتَّقُوْا وَلَعَلَّكُمْ تُرْحَمُوْنَ -

'তোমরা কি আশ্চর্য্যবোধ করছ যে, তোমাদের কাছে তোমাদের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে তোমাদের মধ্য থেকেই একজনের বাচণিক উপদেশ এসেছে- যাতে সে তোমাদেরকে ভীতি প্রদর্শন করে, যেন তোমরা সংযত হও এবং যেন তোমরা অনুগৃহীত হও' (আ'রাফ ৬৩)।

".. قَالُوْا اِنْ اَنْتُمْ اِلاَّ بَشَرٌ مِّثْلُنَا ط تُرِيْدُوْنَ اَنْ تَصُدُّوْنَا عَمَّا كَانَ يَعْبُدُ اٰبَاؤُنَا فَاْتُوْنَا بِسُلْطَانٍ مُّبِيْنٍ، قَالَتْ لَهُمْ رُسُلُهُمْ اِنْ نَّحْنُ اِلاَّ بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ وَلٰكِنَّ اللّٰهَ يَمُنُّ عَلٰى مَنْ يَّشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ ط وَمَا كَانَ لَنَا اَنْ نَّاْتِيَكُمْ بِسُلْطَانٍ اِلاَّ بِاِذْنِ اللّٰهِ ط وَعَلَى اللّٰهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُوْنَ -

'তারা বলত, তোমরা তো আমাদের মতই মানুষ। তোমরা আমাদেরকে ঐ উপাস্য থেকে বিরত রাখতে চাও, যার ইবাদত আমাদের পিতৃপুরুষগণ করত। অতএব, তোমরা কোন প্রকাশ্য প্রমাণ আনয়ন কর। তাদের রাসূলগণ তাদেরকে বললেন, আমরাও তোমাদের মত মানুষ; কিন্তু আল্লাহ তাঁর বান্দাদের মধ্য থেকে যার উপরে অনুগ্রহ করেন। আল্লাহ্র নির্দেশ ব্যতীত তোমাদের কাছে প্রমাণ নিয়ে আসার ক্ষমতা আমাদের নেই। ঈমানদারদের আল্লাহ্র উপরই ভরসা করা চাই' (ইবরাহীম ১০ ও ১১)।

وَمَا اَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ اِلاَّ رِجَالاً نُّوْحِىْ اِلَيْهِمْ فَسْئَلُوْا اَهْلَ الذِّكْرِ اِنْ كُنْتُمْ لاَ تَعْلَمُوْنَ -

'আপনার পূর্বেও আমি 'অহি' সহ মানবকেই তাদের প্রতি প্রেরণ করেছিলাম। অতএব জ্ঞানীদের জিজ্ঞেস করে দেখ, যদি তোমাদের জানা না থাকে' (নাহাল ৪৩)।

وَمَا جَعَلْنٰهُمْ جَسَدًا لاَ يَأْكُلُوْنَ الطَّعَامَ وَمَا كَانُوْا خَالِدِيْنَ

'আমি তাদেরকে এমন দেহ বিশিষ্ট করিনি যে, তারা খাদ্য গ্রহণ করত না এবং তারা চিরস্থায়ীও ছিল না' (আম্বিয়া ৮)।

وَمَا مَنَعَ النَّاسَ اَنْ يُّؤْمِنُوْا اِذْ جَآءَهُمُ الْهُدٰى اِلاَّ اَنْ قَالُوْا اَبَعَثَ اللّٰهُ بَشَرًا رَّسُوْلاً- قُلْ لَوْ كَانَ فِى الْاَرْضِ مَلاَئِكَةٌ يَّمْشُوْنَ مُطْمَئِنِّيْنَ لَنَزَّلْنَا عَلَيْهِمْ مِنَ السَّمَآءِ مَلَكًارَّسُوْلاً -

'(আল্লাহ্র পক্ষ থেকে) হিদায়াত আসার পরও এমন একটি ধারণাই লোকজনকে ঈমানের পথ থেকে বিরত রেখেছিল যে, তারা বলত- একজন রক্ত-মাংসের মানুষকে আল্লাহ পাক তাঁর দূত রূপে প্রেরণ করতে যাবেন কেন? বলুন, যদি পৃথিবীর বুকে ফেরেশতারা বসবাস এবং বিচরণ করত, তবে অবশ্যই আমি কোন ফেরেশতাকেই তাদের জন্য রাসূল রূপে প্রেরণ করতাম' (বণী ইসরাঈল ৯৪ ও ৯৫)।

قُلْ اِنَّمَا اَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوْحٰى اِلَىَّ اَنَّمَا اِلٰهُكُمْ اِلٰهٌ وَّاحِدٌ ج فَمَنْ كَانَ يَرْجُوْا لِقَآءَ رَبِّهٖ فَلْيَعْمَلْ عَمَلاً صَالِحًا وَّلاَ يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهٖ اَحَدًا-

'বলুন! আমিও তোমাদের মতই একজন মানুষ, আমার প্রতি প্রত্যাদেশ হয় যে, তোমাদের ইলাহ্ই কেবল একক ইলাহ। অতএব, যে ব্যক্তি তার পালনকর্তার সাক্ষাত কামনা করে, সে যেন সৎকর্ম সম্পাদন করে এবং তার পালনকর্তার ইবাদতে কাউকে শরীক না করে' (কাহাফ ১১০)।

قُلْ سُبْحَانَ رَبِّىْ هَلْ كُنْتُ اِلاَّ بَشَرًا رَّسُوْلاً -

'বলুন! পবিত্র আমার রব, আমি একজন মানুষ ও আল্লাহ্র পক্ষ থেকে প্রেরিত রাসূল বৈ কে?' (বণী ইসরাঈল ৯৩)।

وَمَا مُحَمَّدٌ اِلاَّ رَسُوْلٌ ج قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ

'মুহাম্মাদ আল্লাহ্র রাসূল বৈ অন্য কিছু নন। তাঁর আগেও অনেক রাসূল অতিক্রান্ত হয়েছেন' (আলে ইমরান ১৪৪)।

قُلْ لاَ اَقُوْلُ لَكُمْ عِنْدِىْ خَزَآئِنُ اللّٰهِ وَلاَ اَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلاَ اَقُوْلُ لَكُمْ اِنِّىْ مَلَكٌ اِنْ اَتَّبِعُ اِلاَّ مَا يُوْحٰى اِلَىَّ -

'আপনি বলে দিন, তোমাদেরকে আমি একথা বলিনা যে, আমার নিকট আল্লাহ তা'আলার ধনভাণ্ডার রয়েছে। আর আমি গায়েবও জানিনা। অথবা একথাও বলিনা যে, আমি ফেরেশতা প্রজাতির কেউ। আমি শুধুমাত্র তাই অনুসরণ করি যা আমাকে প্রত্যাদেশ করা হয়' (আন'আম ৫০)।

قُلْ لاَ اَمْلِكُ لِنَفْسِىْ نَفْعًا وَّلاَ ضَرًّا اِلاَّ مَاشَآءَ اللّٰهُ ط وَلَوْ كُنْتُ اَعْلَمُ الْغَيْبَ لاَسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ ج وَمَا مَسَّنِىَ السُّوْءُ ج

'আপনি বলে দিন, আল্লাহ্র ইচ্ছা ব্যতীত আমি আমার নিজের ভাল-মন্দের অধিকার রাখিনা। যদি আমি গায়েব সম্পর্কে অবহিত থাকতাম, তবে নিজের লাভ ও সুবিধার ক্ষেত্রে সবসময় অগ্রগামী থাকতাম। আর কখনও অকল্যাণ আমাকে স্পর্শ করতে পারত না' (আ'রাফ ১৮৮)।

اَلَمْ يَأْتِكُمْ نَبَؤُا الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ قَبْلُ فَذَاقُوْا وَبَالَ اَمْرِهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ - ذٰلِكَ بِاَنَّهُ كَانَتْ تَّاْتِيْهِمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنٰتِ فَقَالُوْا اَبَشَرٌ يَّهْدُوْنَنَا فَكَفَرُوْا وَتَوَلَّوْا وَّاسْتَغْنَى اللّٰهُ

'তোমাদের পূর্বে যারা কাফের ছিল, তাদের বৃত্তান্ত কি তোমাদের কাছে পৌঁছেনি? তারা তাদের কর্মের শাস্তি আস্বাদন করেছে এবং তাদের জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি। এটা এ কারণে যে, তাদের কাছে তাদের রাসূলগণ প্রকাশ্য নিদর্শনাবলীসহ আগমণ করলে তারা বলত, মানুষই কি আমাদের পথ প্রদর্শন করবে? অতঃপর তারা কাফের হয়ে গেল এবং মুখ ফিরিয়ে নিল; কিন্তু তাতে আল্লাহ্র কিছু যায়-আসেনা' (তাগাবুন ৫ ও ৬)।

মানুষের জন্য মানুষেরই নবী হওয়া যুক্তিসঙ্গত। মানুষের জন্য মানুষকে নবী হিসাবে প্রেরণের পেছনেও আল্লাহ পাকের একটা সূক্ষ্ম দার্শনিক তত্ত্ব নিহিত রয়েছে। সমজাতি ছাড়া জাতির রাহ্বার বা পথপ্রদর্শক হওয়া যুক্তিবিরুদ্ধ। কোন ফেরেশতাকে নবী হিসাবে পাঠালে মানুষ স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন উঠাত যে, এমন প্রকৃতির নবীর জীবন-যাত্রা কি আমাদের মত সাধারণ মানুষের পক্ষে অনুসরণ করা সম্ভব? যাদের ক্ষুৎ-পিপাসা নেই, কামনা-বাসনা নেই, ঘর-সংসার নেই, সাংসারিক ও পারিবারিক দায়-দায়িত্ব নেই তাদের অনুসরণ করা কোন মানুষের পক্ষেই সম্ভব নয়। কিন্তু নিজেদের মধ্যকার কোন ব্যক্তি যখন মানবীয় প্রকৃতির পূর্ণ অধিকারী হয়েও আল্লাহ্র নির্দেশাবলীর যথাযথ আনুগত্য করে চলবে তখন সকল আপত্তির ধূম্রজাল ছিন্ন হয়ে যাবে। ফলে যাঁকে নবী হিসাবে প্রেরণ করা হবে এবং যাদের নিকট প্রেরণ করা হবে এতদুভয়ের অবশ্যই পারস্পরিক মিল থাকতে হবে। ফেরেশতাদের সাথে ফেরেশতাদের সম্পর্ক আর মানুষের সাথে মানুষেরই সম্পর্ক। মানুষের জন্যই যখন রাসূল প্রেরণ উদ্দেশ্য তাহ'লে কোন মানুষকেই রাসূল বানানো যুক্তিসঙ্গত। এমতাবস্থায় সাধারণ মানুষের প্রতি রিসালাতের

উদ্দেশ্য একমাত্র মানুষের মাধ্যমেই পূর্ণ হ'তে পারে। অন্য কোন প্রজাতির মাধ্যমে নয়। আল্লামা ইউসুফ আলী "The Holy Quran" নামক গ্রন্থে সূরা ফুরক্বানের ৯ নম্বর আয়াতের তাফসীরের ৩০৬০ নম্বর টীকায় লিখেছেন- "A teacher for mankind is one who shares their nature, miugles in their life is aequainted with their doings and sympathies" অর্থাৎ 'মানব জাতির প্রশিক্ষক তো তিনিই হবেন, যিনি তাদের প্রকৃতির সত্যিকার অংশীদার, তাদের জীবন-যাত্রার সাথে একীভূত এবং তাদের কাজকাম ও অনুভূতি সম্পর্কে পূর্ণ পরিজ্ঞাত'। সূরা আম্বিয়ার ৭ নম্বর আয়াতের ২৬৭০ নম্বর টীকায় উল্লিখিত হয়েছে- "All apostles sent by god were men, not angels or another kind of beings, who could not understand men or whow men could not understand" অর্থাৎ 'আল্লাহ কর্তৃক প্রেরিত সকল নবী-রাসূলই মানুষ ছিলেন। ফেরেশতা বা এমন অন্য কোন প্রজাতির ছিলেন না, যাঁরা মানুষকে বুঝতেন না অথবা মানুষ তাঁদেরকে বুঝত না'। তাছাড়া নবীর কাজ তো শুধুমাত্র দাওয়াত পৌঁছানোই নয়, বরং তাঁর কাজ হচ্ছে আল্লাহ্র নির্দেশ নিজের জীবন থেকে সমাজ জীবনে সঠিক অনুশীলনের মাধ্যমে বাস্তব প্রয়োগ। এ কাজ তো ফেরেশতার দ্বারা সম্ভব নয়। এ কারণেই যে সমাজে এটা প্রয়োগ করতে হবে, সে সমাজের মধ্য থেকেই নবী হওয়া যুক্তিসঙ্গত। ফেরেশতারা তো এ সমাজে বসবাসকারী নয়। অন্য পক্ষে, নবী হবেন এমন এক ব্যক্তিত্ব, যিনি কামনা-বাসনার অধিকারী হয়েও ফেরেশতাসুলভ শানের অধিকারী। যাতে সাধারণ মানুষ ও ফেরেশতার সাথে সম্পর্ক ও মধ্যস্থতার দায়িত্ব পালন করতে পারেন। আবার নবীর সঙ্গে সর্বক্ষণ প্রহরারত দৃশ্যমান ফেরেশতা অবস্থান করলে এবং অগণিত ধন-সম্পদের অধিকারী হয়ে জাঁকজমকের সাথে থাকলে সত্যের প্রতি সত্যিকার খাঁটি লোকদের বাছাই করা সম্ভব হ'ত না। আসল ও নকলে প্রভেদ করা যেত না। পরীক্ষার আসল উদ্দেশ্যই ব্যাহত হ'ত। এ কারণেই মহান আল্লাহ সাধারণ মানুষের মধ্য থেকে সাধারণ জীবন-যাপনে অভ্যস্থ ব্যক্তি সত্ত্বাকেই বেছে নিয়ে এ কাজের মহান দায়িত্ব অর্পণ করেছেন।

উপরে উল্লেখিত কুরআনের আয়াত ও যুক্তিগ্রাহ্য বিশ্লেষণের পর একমাত্র কাণ্ড-জ্ঞানহীন ছাড়া আর কেউই বলতে পারে না যে, নবী করীম (ছাঃ) মানুষ ছিলেন না।

ভিন্ন মতাবলম্বীদের কথায় 'মুহাম্মাদ (ছাঃ) আল্লাহ ছিলেন না, তবে আল্লাহ থেকে ভিন্নও না'। কি ভ্রান্ত ধারণা! এটা তো হিন্দু ধর্মের অদ্বৈতবাদের মতই হয়ে গেল। এদের যুক্তি হ'ল, মহানবী (ছাঃ) আল্লাহ্র নূরে তৈরী'। হাদীছের চুলচেরা যাঁচাই-বাছাই বাদ রেখে তাঁকে নূরুল্লাহ বা আল্লাহ্র নূর মেনে নিলেও আল্লাহ্র যাতী নূর বা স্বকীয় সত্ত্বার নূর মনে করা একান্তই অবান্তর। কারণ এমনটা হ'লে তো শিরক বা অংশীবাদই হয়ে যাবে। যে শিরকের বুনিয়াদ ধ্বংস করতে তাঁর আগমণ তাতে স্বয়ং তাঁকেই নিমজ্জিত করা হবে। বরং এখানে ধরতে হবে আল্লাহ্র সৃজিত বা আল্লাহ প্রদত্ত বিশেষ নূর। তাছাড়া একে সম্মানার্থে প্রয়োগ ধরা যেতে পারে। যেমন, ঈসা (আঃ) ও আদম (আঃ)-কে 'রূহুল্লাহ্' বা আল্লাহ্র রূহ্ এবং খানায়ে কা'বাকে বায়তুল্লাহ্' বা আল্লাহ্র ঘর বলা হয়। এর পরেও বলা হয় যে, তিনি গায়েব জানতেন, অগ্র-পশ্চাৎ সমান দেখতেন ইত্যাকার আরও অনেক কথা। অথচ আল-কুরআনে স্পষ্টতঃ ঘোষিত হয়েছে যে, তিনি গায়েব জানতে না। তবে গায়েবের খবর যতটুকু তাঁকে মহান আল্লাহ্র পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে ততটুকুই তিনি প্রকাশ করেছেন।

নবী করীম (ছাঃ) তবে কি ছিলেন এবং তাঁর আসল পরিচয়ই বা কি? নবী করীম (ছাঃ) আল্লাহ্র বান্দা ও রাসূল। সর্বোপরি তিনি মানব বংশোদ্ভূত। এবার প্রশ্ন হ'তে পারে যে, সাধারণ মানুষের সাথে তাঁর কি কোন তফাৎ বা পার্থক্য আছে, না নেই? উত্তরে বলব, হাঁ, আছে বৈকি? 'অহি' প্রাপ্তির কারণে তিনি নবুঅতের মসনদে আসীন। যা সাধারণ মানুষ কেন অসাধারণ নামে পরিচিত কোন ব্যক্তির পক্ষেও লাভ করা সম্ভব নয়। শুধু এতটুকুই নয় তিনি আপন বৈশিষ্ট্যে দেদীপ্যমান। তিনি সাধারণ অর্থে শুধু 'মহামানব', 'মহাপুরুষ' বা 'মানব-মুকুট' নন বরং মহানবী তথা 'সাইয়িদুল মুরসালীন' ও 'সাইয়িদুল আম্বিয়া' বা নবী-রাসূলদেরও সরদার। এর চাইতে আর বড় শান কি হ'তে পারে?

পরিশেষে বলতে চাই যে, নবী-সম্রাট হযরত মুহাম্মাদ (ছাঃ) পূর্ববর্তী নবী-রাসূলদের মতই একজন মানুষ ছিলেন। এ বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নেই। মানুষ বলার কারণে তাঁকে খাটো করা হয় না, বরং এতে তাঁর মর্যাদা আরও বর্ধিত হয়। কারণ, মানব হয়েও তিনি সর্বোচ্চ মর্যাদার অধিকারী হ'তে পেরেছেন এখানেই তো তাঁর শ্রেষ্ঠত্ব ও মহত্ত্ব। দকদর্শন যন্ত্র দিকের নির্দেশনা দেবে আর দর্শককে তা অনুসরণ করে চলতে হবে- এটাই তো কাম্য। এর পরও কেউ দিক ভ্রান্ত হ'লে যন্ত্রের কি দোষ? তাই কবি শেখ সা'দির কণ্ঠে কণ্ঠ মিলিয়ে বলতে চাই-

"সূর্যের আলো যদি নাইবা দেখে চামচিকা,
তাতে সূর্যের কিবা আসে যায়?'
দেখেও যে দেখে না, বুঝেও যে বুঝে না,
তারে কি কভু বুঝানো যায়?

এমতাবস্থায় মহান আল্লাহ্র দর[illegible] প্রার্থনা- প্রভু হে! আমাদের তুমি সত্যকে সঠিক রূপে দেখাও এবং তা অনুসরণ করতে সাহায্য কর আর অসত্যকে ওর নিজস্ব রূপে দেখাও এবং তা থেকে বিরত থাকতে সাহায্য কর। -আমীন!!

ছালাতের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক মূল্যবোধ

*-আবদুল আউয়াল**

ছালাত শুধুমাত্র ধর্মীয় অনুষ্ঠান বা আচরণের নাম নয়। ছালাত সত্য-মিথ্যার পার্থক্যকারী। ব্যাপক অর্থে এর রয়েছে এক বৈপ্লবিক পরিবর্তনের ক্ষমতা। যে সমাজে ছালাত কায়েম হয় সে সমাজে আমূল পরিবর্তন আসে। মানুষের জীবনে নেমে আসে শান্তি। ছালাতের মাঝে যতসব উপাদান ও উপকার আছে সে সম্পর্কে মহান আল্লাহ্ই ভাল জানেন। তবে ছালাতের বিভিন্ন দিক পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে যে, এর মাঝে রয়েছে সামাজিক ও সাংস্কৃতিক চেতনার এক মহাশক্তি। যা ইসলামকে দিয়েছে এক শাশ্বত জীবন এবং অনন্ত দুর্বার গতি। কালের বহু চড়াই-উৎড়াই ও ঘাত-প্রতিঘাত পেরিয়ে ইসলাম আজ যেভাবে এ পৃথিবীতে টিকে আছ, তার মূলে রয়েছে ছালাতের বিশেষ ভূমিকা।

ঐতিহাসিক যোসেফ হেল স্বীকার করেছেন যে, "The opposition of the ruling families of Mocca was not so much against the new teaching of Islam as against the social and political revolutions which they sought to introduce." 'মক্কার নেতৃস্থানীয় গোষ্ঠীসমূহ ইসলামের নতুন শিক্ষার যতটা না বিরোধিতা করেছিল, তার চেয়ে অধিক বিরোধিতা করেছিল ইসলামের সামাজিক এবং রাজনৈতিক বিপ্লবের, যা মুসলমানগণ সংঘটিত করতে চেয়েছিল'।[১] ঐতিহাসিকের কথায় ইসলামের সেই স্বর্ণযুগে যে বিপ্লবের উদ্ভব হয়েছিল তার মূলে ছিল ছালাতের যুগান্তকারী সংস্কারমূখী ভূমিকা। তাই হক ও বাতিলের বিবদমান সমাজে মুসলমানদের টিকিয়ে রাখার জন্য সাংস্কৃতিক ও সামাজিক চেতনার কেন্দ্র হিসাবে ছালাত যে ভূমিকা রাখে, তা যদি আমরা সঠিকভাবে বুঝে কাজে লাগাতে পারি, তবেই আমরা বিশ্বের বুকে সর্বশ্রেষ্ঠ জাতি হিসাবে মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে পারব।

ইতিহাস পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, ইসলামের প্রাথমিক অবস্থায় মহানবী (ছাঃ) প্রকাশ্যে সংঘর্ষ শুরু করার পূর্বে একদল নিষ্ঠাবান অনুগত লোক তৈরী করে নিতে চেয়েছিলেন এবং সে কাজে যেসব কর্মসূচী পেশ করলেন ছালাত ছিল এর মধ্যে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ। যে মহা পরিকল্পনার ভিত্তিতে তিনি ইতিহাসের সর্বকালের বিস্ময়কর সাফল্য লাভ করেছিলেন তা প্রণয়নে বিশেষত ছালাত যে ভূমিকা পালন করেছিল, তারই ফলশ্রুতিতে সেই মরুচারী বর্বর আরববাসী, দুর্ধর্ষ বে-দ্বীন, উন্মত্ত মানবগোষ্ঠী, যারা নিজেদের রক্ত নিজেরা পান করত, যারা আকণ্ঠ মদ আর ব্যভিচারে ডুবে থাকত, যারা কোন জাতীয় শাসন-কাঠামো গড়ে তুলতে পারেনি কোনদিন, সেই মুশরিক আরব বর্বর একদিন তৎকালীন পৃথিবীকে অভিভূত করে দিয়ে অর্ধ জাহানের দণ্ডমুণ্ডের অধিনায়ক বনে গেল এবং তৎকালীন দুর্গন্ধময় পরিবেশকে নতুন সমাজ-সংস্কৃতি উপহার দিয়ে সমগ্র জগতকে আলোকিত করে তুলেছিল।

যে যুগান্তকারী পরিকল্পনার ভিত্তিতে মহানবী (ছাঃ) ইতিহাসের বিস্ময়কর সাফল্য অর্জন করতে সচেষ্ট হয়েছিলেন এবং সে পরিকল্পনার বৈপ্লবিক সাফল্য সংরক্ষণে অনাগত ভবিষ্যতের জন্য ছালাত কি ভূমিকা রাখতে সক্ষম, সামনের আলোচনাতে আমরা তাই দেখতে প্রয়াস পাব ইনশাআল্লাহ।

মহামহিম আল্লাহ তাঁর পাক কালামে ঘোষণা করেন- قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى- وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى 'সফল সেই ব্যক্তি, যে পবিত্রতা অর্জন করেছে। আপন প্রতিপালকের নাম স্মরণে এবং ছালাতে মগ্ন থেকেছে' (আ'লা ১৪, ১৫)। আলোচ্য আয়াত থেকে আমরা সফলতার এক নিশ্চয়তা পাই। এখন এ সফলতা কোথায়, কিভাবে? মানবের সফলতা সর্বদা তার ইহলৌকিক ও পারলৌকিক মুক্তির উপরই নির্ভরশীল। আমাদের আলোচনায় ইহলৌকিক জীবনে তথা ব্যক্তি, সমাজ ও সংস্কৃতিতে ছালাত কিভাবে সফলতা আনতে পারে তাই আলোচনা করে দেখব।

বস্তুতঃ ছালাত মানুষকে কূপ্রবৃত্তি এবং খারাপ কাজ থেকে দূরে রাখে এবং ধীরে ধীরে স্বকীয় দেহ-মন ও মস্তিষ্কের উন্নতি-অগ্রগতি ও ক্রমবিকাশ করে এবং পূর্ণতা প্রাপ্তির দিকে এগিয়ে নেয়। ছালাত মানুষকে নির্ভীক করে ও আধ্যাত্মিক দিক থেকে তাকে পূর্ণতা প্রাপ্তির দিকে এগিয়ে নেয়। মানুষের মাঝে সকল বৈষম্য দূর করে সত্যিকার ঐক্য ও সাম্য গড়ে তোলে এবং মানুষকে চিরন্তন সুখ, শান্তি ও সমৃদ্ধির দিকে নিয়ে যায়।

এক্ষণে ছালাতের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত সকল পর্যায়ে এবং ছালাত সংশ্লিষ্ট বিষয় সকল আলোচনার মাধ্যমে সমাজ জীবনে ছালাতের মূল্যবোধ দেখতে সচেষ্ট হব। ছালাতের সাথে সংশ্লিষ্ট বিষয়গুলোর মধ্যে পবিত্রতা, আযান, ক্বিবলা, মসজিদ, জামা'আত, খুৎবা ও ঈদ সহ ছালাতের দৈহিক নিয়ম-কানুন অন্যতম।

পবিত্রতাঃ ছালাতের প্রারম্ভেই মুছল্লীকে তার দেহ-মন, ছালাতের স্থান, পরিচ্ছদ সম্পর্কে পবিত্রতা অর্জনের কথা বলা হয়েছে। আল্লাহ বলেন,

* *প্রভাষক, পরিসংখ্যান বিভাগ, ইনস্টিটিউট অব ম্যানেজমেন্ট এণ্ড ইনফরমেশন টেকনোলজি, তেজগাঁও, ঢাকা।*

১. *The Arab civilization p. 109।*

وَاللّٰهُ يُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِيْنَ 'আল্লাহ পবিত্রতা অবলম্বনকারীদের পসন্দ করেন' (তওবাহ ১০৮)। তাই ছালাত আমাদেরকে শিক্ষা দেয় শারীরিক পরিচ্ছন্নতার। যার ফলে আমাদের দেহ ও মন পরিশুদ্ধ থাকে। দেহগত ভাবে মানুষ নানা প্রকার রোগের হাত থেকে রক্ষা পায় এবং আত্মার পরিশুদ্ধির মাধ্যমে তার আধ্যাত্মিক উন্নতি সাধিত হয়। মানুষ ষড় রিপুর তাড়না থেকে মুক্তি পায়।

রব ও আবূদ-এর সম্পর্কঃ ছালাতের মাধ্যমে রব ও আবূদ-এর সম্পর্ক দৃঢ় হয়। ছালাতের প্রতি রাক'আতে সূরা ফাতিহা পড়তে হয় জামা'আতে হৌক বা একা হৌক (বুখারী)। সূরা ফাতিহা ইসলামে উপাসনার সার বাণী, ইহা পবিত্র কুরআনের সার কথা। এ সূরার ১ম আয়াতেই বলা হয় সব হাম্দ (প্রশংসা) আল্লাহ্র জন্য। প্রশ্ন আসে কেন? কারণ, তিনি 'রাব্বুল আলামীন', সমগ্র বিশ্ব সৃষ্টির প্রতিপালক। আর এ থেকে স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে, তিনি আমাদের রব বলে আমরা তার ইবাদত-বন্দেগী ও হাম্দ আদায় করছি। এছাড়া সূরা ফাতিহা সহ কুরআনের অন্যকোন অংশ পাঠ বা অপরাপর নিয়মাবলী যেমন রুকূ'-সিজদা, ক্বিয়াম-কুঊদ ইত্যাদি সকল কিছুর মাধ্যমে বান্দা তার স্রষ্টার অতি নিকটে পৌঁছে যায়। আর সে বুঝতে পারে যে, এ নশ্বর জগতের কোন সৃষ্টি তার (মানুষের) প্রভু হ'তে পারে না। এতে মানুষের মাঝে প্রভু-দাস সম্পর্ক দূর হয়ে সাম্য ও ভ্রাতৃত্ববোধ গড়ে ওঠে। সমাজের সকল বর্ণ বিদ্বেষ দূরীভূত হয়। ফলে মানুষ এক আল্লাহ্র সন্তুষ্টি অর্জনে সক্ষম হয়।

আযানঃ আযান এমন এক শাশ্বত ঘোষণা, যার মাধ্যমে মুয়ায্যিনের মাধ্যমে দিকে দিকে ঘোষিত হয় "الله اكبر" 'আল্লাহ্ই মহান' "اشهد ان لا اله الا الله" 'আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ভিন্ন আর কোন মা'বূদ নেই।' যখন এ কথা আকাশে বাতাসে ছড়িয়ে পড়ে তখন সবকিছুর প্রভুত্ব খতম হয়ে যায়। ক্ষণ পরেই মুয়ায্যিনের কণ্ঠে ধ্বনিত হয় "اشهد ان محمدا رسول الله" 'আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মাদ (ছাঃ) আল্লাহ্র রাসূল'। অতঃপর আহ্বান করা হয় ছালাতের দিকে, কল্যাণের দিকে। জাহেলী যুগে রাসূল (ছাঃ) সর্বপ্রথম এ আওয়ায উচ্চারণ করেন যে, আর মানুষের প্রভুত্ব নয়, শয়তানের গোলামী নয়, আল্লাহই সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী, তিনি আমাদের প্রভু, সকল মানুষ একই পর্যায়ের। আর এভাবেই তৎকালীন মুশরিকদের (আবু জাহাল, আবু লাহাব প্রমুখ) প্রত্যেকের কাছে এ ছিল এক বিপ্লবী ঘোষণা। আযানের এ আওয়ায যা একদিন হাবশী গোলাম বেলাল (রাঃ)-এর কণ্ঠে উচ্চারিত হয়েছিল, তাই আজ দিকে দিকে প্রতিধ্বনি থেকে প্রতিধ্বনি হয়ে দিকে দিকে ফেরে। আযানের এ আবেদন বর্তমান যুগের গাফেল মুসলমানদের অনেকেই হৃদয়ঙ্গম করতে পারে না। যার কারণে আজ ইসলামের এ বিপর্যয়। অথচ তখনকার যুগের দুশমনরা আযানের মর্মার্থ ঠিকই উপলব্ধি করতে পেরেছিল। ফলে মুসলমানদের উপর দুশমনদের হামলা কঠোর ও দীর্ঘতর হয়েছে। তাই আযানের আহ্বান অনির্বাণ, আযান স্বতন্ত্রভাবেই ইসলামী চেতনার এক মহৎ উৎস।

খুৎবাঃ জুম'আ বা ঈদের ছালাতের পূর্বে ঈমাম ছাহেব মুছল্লীদের উদ্দেশ্যে যে সংক্ষিপ্ত ভাষণ পেশ করেন তাই খুৎবা। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর খুৎবা জীবন থেকে বিচ্ছিন্ন, প্রাণহীন, গতানুগতিক কোন খুৎবা ছিল না। তার খুৎবা ছিল সমসাময়িক ঘটনা প্রবাহের উপর অতিমাত্রায় নির্ভরশীল। প্রসিদ্ধ মুসলিম মনীষী আল্লামা ইবনুল ক্বাইয়িম তাঁর 'যাদুল মা'আদ' গ্রন্থে লিখেছেন 'রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাঁর খুৎবায় উপস্থিত ছাহাবাদেরকে ইসলামের বিভিন্ন মূলনীতি, আহকাম ও বিধি-বিধান শিক্ষা দিতেন। কোন বিষয় সম্পর্কে আদেশ বা নিষেধ দানের প্রয়োজন হ'লে খুৎবার মাধ্যমেই তিনি তা করতেন'।[২] বর্তমানে খুৎবা তার প্রকৃত আবেদন হারিয়ে ফেলেছে। মুসলমানগণ এ ক্ষেত্রে চরম অবিবেচনার পরিচয় দিয়েছে। ফলে খুৎবা আর সে যুগের মত আবেদন সৃষ্টি করতে পারে না। মানুষ খুৎবা শুনতে বিরক্তি বোধ করে। ইমাম ছাহেব সে দিকে লক্ষ্য না রেখে তার নিজ জ্ঞান যাহির করতেই ব্যস্ত থাকেন। ফলশ্রুতিতে মুসলমানদের রাজনৈতিক জীবনের বিপর্যয় ঘটছে।

জামা'আতঃ জামা'আতে ছালাত আদায়ে কতকগুলো অনন্য বৈশিষ্ট্যের বিকাশ ঘটে থাকে। জামা'আতের ফলে দ্বীন ইসলাম কারো হাতের ছেলে-খেলায় পরিণত হয়নি। জামা'আতের ফলে মুসলিম ঐক্য স্থাপিত হয়। জামা'আতের বিভিন্ন দিককে সুষ্ঠুভাবে বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, তা যেন একটি ক্ষুদ্র রাজ্যের আদর্শ নমুনা। যার একজন শাসক (ইমাম) রয়েছেন। একটি রাজধানী (মসজিদ) বা জাতীয় পরিষদ রয়েছে। যে রাজ্যের নাগরিক হ'লেন মুছল্লীগণ। কিছু সাংবিধানিক নীতিমালা রয়েছে। তা হ'ল ছালাতের যাবতীয় মাসআলা-মাসায়েল। এ হচ্ছে জামা'আতের সংক্ষিপ্ত রূপ। যা সম্প্রসারিত হয়ে এক আদর্শ ইসলামী প্রজাতন্ত্রে রূপ লাভ করতে পারে। হাদীছ শরীফে তাই জামা'আতের গুরুত্ব বিধৃত হয়েছে এভাবে- হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, কোন এক ছালাতের জামা'আতে নবী করীম (ছাঃ) কিছু লোককে দেখতে পেলেন না। তিনি বললেন, 'আমি স্থির করেছি যে, একজনকে লোকদের নিয়ে ছালাত পড়তে আদেশ দেব। তৎপর আমি সেসব লোকদের নিকট যাব যারা ছালাতে অনুপস্থিত থাকে এবং কাঠ জমা করে তাদের ঘর জ্বালিয়ে দিতে বলব'।[৩] এ থেকেই জামা'আতে ছালাত আদায়ের গুরুত্ব পরিষ্কার হয়ে ওঠে। জামা'আতে ছালাতের মাধ্যমে মুসলিম ঐক্য সুসংগঠিত ও সুদৃঢ় হয়। ফলে ধরাধামে মুসলমানদের বিজয় কেতন উড়তে থাকে।

---

২. *যাদুল মা'আদ, ১ম খণ্ড, পৃঃ ১১৫।*

৩. *বুখারী, আইনি তোহফা সালাতে মোস্তফা ২য় খণ্ড ১৭ পৃঃ।*

মসজিদঃ একটি পাড়া বা গ্রামে যখন কিছু লোক একত্রিত হয়ে ছালাত আদায় করতে উদ্বুদ্ধ হয় তখন সেখানে একটি মসজিদ নির্মাণ প্রয়োজন হয়ে পড়ে। এ মসজিদ নির্মাণকে কেন্দ্র করে এক মুসলমান অপর মুসলমানের ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে চলে আসে। ধনী-দরিদ্র নির্বিশেষে সমাজের সকল স্তরের লোকের সামর্থ্য অনুসারে দানের মাধ্যমে, সকলের আন্তরিক প্রচেষ্টায় মসজিদ গড়ে ওঠে। মানুষের মাঝে সমবায়ের ন্যায় কল্যাণমূলক মানসিকতার বিকাশ ঘটে। এ মসজিদগুলোকে কেন্দ্র করে যে সাংস্কৃতিক ও সামাজিক অনুশীলন চলতে থাকে, তা পূর্ণমাত্রায় বিকশিত হবার পথ নানাভাবে নানা সময়ে বিভিন্ন প্রতিকূলতার কারণে বাধাপ্রাপ্ত হলেও মুসলিম মিল্লাতকে তা এক শাশ্বত জীবনী শক্তিতে পৌঁছিয়ে থাকে। মসজিদে নববী ছিল এর প্রকৃষ্ট উদাহরণ। এই মসজিদের কাতারে কাতারে আনছার-মুহাজির শুধু যে কাঁধে কাঁধে মিলিয়ে ছালাত আদায় করেছিলেন তাই নয়, এখানেই নিয়েছিলেন তাঁরা সেই মহাবিপ্লবের দীক্ষা, যার দৌলতে সে মরুভূমির বর্বর মানুষ বর্বরতা ভুলে গিয়ে ভাইয়ে ভাইয়ে পরিণত হয়েছিল। এখানেই চলত রাষ্ট্রীয়, সামাজিক, রাজনৈতিক সকল প্রকার শলা-পরামর্শ। সকাল-সন্ধ্যা, রাতের আঁধার, সমস্ত সময়ের জন্যই এটা ছিল এক মহামিলন কেন্দ্র। সকলে মহাপ্রভুর নিকটে নিজ নিজ শির লুটিয়ে দিয়ে তার (আল্লাহ্‌র) প্রশংসায় বিভোর থাকতেন। আর বলীয়ান হয়ে উঠেছিলেন দীপ্ত শপথ নিয়ে। তারা ছিলেন মর্দে মুজাহিদ। সারা দুনিয়ার অন্ধকারকে দূরীভূত করে তারা এক আলোর দিকে ছুটে গিয়েছিলেন। নিজ নিজ জীবনে সকলেই হয়েছিলেন সফলকাম।

বেলাল (রাঃ)-এর সুমধুর আযানের ধ্বনিতে সবাই মসজিদে ছুটে আসতেন। শারঈ কারণ ব্যতীত কেউ মসজিদে অনুপস্থিত থাকতেন না। হঠাৎ কেউ অনুপস্থিত থাকলে তার খোঁজ-খবর নেয়া হ'ত। যদি জানা যেত কারো বাসায় খাবার নেই, তবে বায়তুল মাল থেকে খাবারের ব্যবস্থা নেয়া হ'ত। যার যে অসুবিধা জানা যেত তারই সমাধান দেয়া হ'ত এভাবে মসজিদ থেকেই। বস্তুতঃ মসজিদগুলো মুসলমানদের আধ্যাত্মিক, নৈতিক, সামাজিক, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক প্রত্যেক ব্যাপারেই একমাত্র কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হয়েছিল। তাই আমাদের খেয়াল রাখা উচিত মসজিদই ইসলামের একমাত্র প্রাণকেন্দ্র। এখান থেকেই মুসলমানগণ দিনে পাঁচবার উৎসাহ, প্রেরণা ও শিক্ষা গ্রহণ করে তাদের ব্যক্তি ও সমাজ জীবন এমনভাবে গড়ে তুলবে যার ফলে ব্যক্তি ও সমাজ জীবন সকল দুঃখ-দুর্দশা থেকে মুক্ত হয়ে উন্নতির শীর্ষে আরোহন করতে সক্ষম হয়।

ক্বিবলাঃ ছালাতে ক্বিবলামুখী হয়ে দাঁড়ানো ছালাতের পূর্বশর্ত। আরবের মক্কা নগরীতে হযরত ইবরাহীম (আঃ) কর্তৃক নির্মিত 'খানায়ে কা'বা'ই ছালাতের ক্বিবলা। সারা দুনিয়ার মুসলিম মিল্লাতকে এই একই ক্বিবলামুখী হয়ে ছালাত আদায় করতে হয়। সারা বিশ্বের সর্বকালের মুসলমানদের একই কেন্দ্রের দিকে আকর্ষণ করাই এর মূল লক্ষ্য। এটা মুসলিম জাহানের একতার প্রতীক। মুসলমানদের একই চেতনায় উদ্বুদ্ধ করার এক অর্নিবাণ শিখা। সারা দুনিয়ার মুসলিম মিল্লাত এই এক ক্বিবলার দিকে মুখ করে দাঁড়িয়ে যে চেতনা লাভ করে থাকে, তা বিশ্ব ভ্রাতৃত্ববোধের চেতনা, বিশ্ব একাত্মতার চেতনা, বিশ্ব মানবিকতার চেতনা, মানুষে মানুষে হিংসা-বিদ্বেষ ভুলে সাম্য-মৈত্রীর চেতনা।

কাতারঃ ছালাতের কাতার সম্পর্কে যে বিধান রয়েছে তাও সমাজ ও সাংস্কৃতিক মূল্যবোধ বর্জিত নয়। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ছালাতের কাতার সম্পর্কে বলেন, 'তোমরা ছালাতে কাতার সোজা করে দাঁড়াও। একে অপরের পায়ে পা মিলিয়ে। কাঁধে কাঁধ লাগিয়ে। আগে পিছে বিক্ষিপ্ত হয়ে দাঁড়িও না। অন্যথায় তোমাদের দিল পরস্পর বিক্ষিপ্ত হয়ে যেতে পারে' (মুসলিম)। এর চাইতে সাম্যের শ্লোগান আর কি হ'তে পারে? আফসোস! আজকের মুসলমানগণ কাতারে পায়ে পা মিলায় না। এতে নাকি ছোট-বড়তে অসম্মান হয়। এমনি নানা জনের নানা মত। আর তাই বোধ হয় আজ মুসলমানদের এ দুর্দশা।

পবিত্রতা থেকে শুরু করে এ পর্যন্ত ছালাতের বিভিন্ন হুকুম, আদেশ-নিষেধ সম্বলিত যে সব উপাদান পর্যালোচনা করা হ'ল তাতে স্পষ্টই দেখা গেছে যে, ছালাত সমাজ জীবনে এক শাশ্বত বিধান (এবাদত)। মহান আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি লাভের পাশাপাশি ছালাত চিন্তার পুনর্গঠনে, চরিত্র ও ব্যক্তিত্বের সৃষ্টিতে, আত্মিক ও আদর্শিক জাগরণে, জাতীয় ধ্যান-ধারণাতে, বিশ্ব ভ্রাতৃত্ববোধের ক্ষেত্রে, মানুষকে ঐশ্বরিক গুণে গুণান্বিত করতে এক অনন্য বৈশিষ্ট্যের অধিকারী। যুগপৎ জাতির পুনর্গঠনে এবং জাতির ঈপ্সিত লক্ষ্য ও আদর্শ সংরক্ষণে সমভাবে ক্রিয়াশীল। সুতরাং ছালাতের এই চেতনাশক্তি ইসলামের আদর্শগত মূল্যবোধের বাস্তবায়নে যেমন সহায়ক শক্তি, তেমনি তার সংরক্ষণেও এক নিদ্রাহীন-নিষ্ঠাবান প্রহরী।

ছালাতের মধ্যেই দ্বীন ও ঈমানের হিফাযত, আল্লাহ পাকের সাথে সম্পর্কের স্থিতি এবং ইসলামের গণ্ডিতে ও মুসলমানদের কাতারে শামিল থাকার রহস্য নিহিত রয়েছে। এটা কেমন করে হ'ল? একমাত্র আল্লাহ পাকই ভাল জানেন।

সুপ্রসিদ্ধ আরিফ ও বুযূর্গ হযরত মাখদূম শেখ শরফুদ্দীন ইয়াহইয়া মুনীরী (রহঃ) এই সূক্ষ্ম তত্ত্বটির ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে একটি শিক্ষনীয় উদাহরণ পেশ করেছেন। তিনি লিখেছেনঃ

'এর উদাহরণ এরূপ মনে কর যে, এক ব্যক্তি পাহাড়ের চূড়ায় প্রাসাদ তৈরী করল। রকম-বেরকমের নে'মত ও বিলাস সামগ্রীর সমাবেশ ঘটাল। কিন্তু আল্লাহ্‌র অমোঘ বিধান অনুযায়ী একদিন তার জীবন সন্ধ্যা ঘনিয়ে এল। সেদিন সে তার একমাত্র পুত্রকে কাছে ডেকে বলল, তুমি যখন যেমন ইচ্ছে এ প্রাসাদের সংস্কার করতে পার। কিন্তু প্রাসাদের কোণে যে ফুলগাছ দেখতে পাচ্ছ তা কোন অবস্থাতেই উপড়ে ফেলে দিওনা।

কিছুদিন পর বসন্তের আগমণে পাহাড়ের চূড়া যখন সজীব,

সবুজ হয়ে উঠল। নতুন লাগানো চারা গাছগুলো ফুলে ফুলে ভরে গেল। আর সে ফুলের খুশবুতে গোটা প্রাসাদ হ'ল সুরভিত। ছেলেটির কাছে তখন পিতার হাতে লাগানো সে গাছটি একান্তই বেমানান মনে হ'ল। সে ভাবল, ফুলের সুগন্ধির জন্যই তোকে আমার বাবা প্রাসাদের বাগানে গাছটি রোপণ করেছিলেন; কিন্তু এ শুকনো গাছ এখন আর কি কাজে আসবে। এ গাছে তো আর কোনদিন ফুলের মেলা বসবে না। তাই সে বাগানের মালীকে গাছটি উপড়ে ফেলার নির্দেশ দিল। একদিন এক কালসাপ গর্ত থেকে ফনা তুলে বেরিয়ে এল এবং ছেলেটির গায়ে মরণ ছোবল হানল। সাথে সাথেই সে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ল।

আসলে গাছটি ছিল সর্প-বিষনাশক। ফলে প্রাসাদের আশে পাশে কোন বিষাক্ত সাপই ঘেঁষতে পারত না। কিন্তু ছেলেটির তা জানা ছিল না। নিজের জ্ঞান ও বুদ্ধির উপর তার দারুন অহমিকা ছিল। সে মনে করত, যা সে জানে না তার অস্তিত্বই বুঝি নেই। আল-কুরআনের সে চিরন্তন বাণীটিও ছিল তার অজ্ঞাত। 'অতি অল্প জ্ঞানই তোমাদেরকে দান করা হয়েছে'। ফলে জ্ঞান ও বুদ্ধির অহমিকাই তার জন্য কাল হয়ে দাঁড়াল।[৪]

উপরোক্ত আলোচনার মাধ্যমে বুঝা যায় যে, পারলৌকিক মুক্তি, এমনকি ইহলোকে সকল প্রকার পঙ্কিলতা মুক্ত থেকে আল্লাহ্কে রাযী-খুশি করতে চাইলে ছালাতের গুরুত্ব অসীম। আর সঠিক নিয়মে ছালাত আদায়ের মাধ্যমেই আমরা বিশ্বভ্রাতৃত্বের এক অতুল্য অনুপম নির্দশন উপহার দিতে সক্ষম হব। আল্লাহ বলেন, 'নিশ্চয়ই ছালাত মানুষকে সকল অনাচার ও অশ্লীলতা থেকে দূরে রাখে' *(আনকাবুত ৪৫)*।

মহান আল্লাহ আমাদের সকলকে ছালাত কায়েমের মাধ্যমে এবং প্রাচুর্যের প্রতি মোহাবিষ্ট না রেখে ইহলৌকিক ও পারলৌকিক মুক্তি দান করুন। আমীন!!

৪. সাইয়িদ *আবুল হাসান, আরকানে আরবা'আ, পৃঃ ৩৪, গৃহীতঃ তারীখে দাওয়াত ওয়া আযীমত, ৩য় খণ্ড পৃঃ ৩০৬।*

অংকন টেক্সটাইল

জামাল সুপার মার্কেট
দ্বিতীয় তলা
সাহেব বাজার,
রাজশাহী।

চিন্তা-ভাবনাঃ মুসলিম জীবনে অপরিহার্য কর্তব্য

*-আহমাদ শরীফ**

মানুষ আশরাফুল মাখলুকাত তথা সৃষ্টির সেরা জীব। এ শ্রেষ্ঠত্বের কারণ মানুষ বিবেক-বুদ্ধি ও জ্ঞান সম্পন্ন। জ্ঞান মানব জীবনের এক অমূল্য মৌলিক গুণ। এর মাধ্যমেই মানুষ আত্মোপলব্ধির সাহায্যে আত্মপরিচয় পেয়ে থাকে। অজানাকে জানতে পারে।

জন্ম লাভের পর থেকেই মানুষের জৈবিক ও আত্মিক চাহিদার মাত্রা বাড়তে থাকে। ইন্দ্রিয়ানুভূতি অনুসন্ধিৎসু মনকে জাগিয়ে তোলে। এ পৃথিবীর রূপ-সৌন্দর্যের মাঝে মানুষ আপন অস্তিত্বের স্বরূপ খুঁজে পেতে চায়। সৃষ্টিরাজির সকল কিছুকে জানতে চায়। লোক চক্ষুর অন্তরালে লুক্কায়িত রহস্যকে উদঘাটন করতে চায়।

অনুসন্ধিৎসু মনে শত জিজ্ঞাসার সৃষ্টি হয়। মানব মনের অসংখ্য জিজ্ঞাসা থেকেই চিন্তা-ভাবনার উৎপত্তি। সুতরাং মানুষের আত্মজিজ্ঞাসার একটি সুনিশ্চিত রূপই হচ্ছে গবেষণা তথা চিন্তা-ভাবনা।

পবিত্র কুরআন ও হাদীছে আল্লাহ্র সৃষ্টিরাজি সম্পর্কে চিন্তা করতে এবং জীবন ও জগতের অপার রহস্য উদঘাটনের উপর অত্যধিক জোর দেয়া হয়েছে। একই সাথে আল্লাহ্র নির্দেশিত পথে এ বিশ্বের স্বরূপ উদঘাটনে যারা তাদের প্রতিভা খাটায় তাদের প্রশংসা করা হয়েছে। আল্লাহ তা'আলার সৃষ্টি ও সৃষ্টিজগতের উপর চিন্তা-গবেষণা করে তার মাহাত্ম ও কুদরত সম্পর্কে অবগত হওয়া একটি মহৎ ও উচ্চ পর্যায়ের ইবাদত।

আল্লাহ মানব সৃষ্টির সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিষয়ে চিন্তা-ভাবনা করার আহ্বান জানিয়েছেন। তিনি বলেন, 'আমি সৃষ্টি করেছি তোমাদেরকে। অতঃপর কেন তোমরা তা সত্য বলে বিশ্বাস কর না? তোমরা কি ভেবে দেখেছ, তোমাদের বীর্যপাত সর্ম্পকে? তোমরা তাকে সৃষ্টি কর, না আমি সৃষ্টি করি? (ওয়াক্বিয়াহ ৫৭-৫৯)।

রহস্যঘেরা গভীর অরণ্যাদী, স্নিগ্ধ শ্যামল প্রান্তর, সর্বপ্রকার ফুল ও ফসল সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা করার আহ্বান জানিয়ে আল্লাহ বলেন, 'তোমরা যে বীজ বপন কর, সে সম্পর্কে ভেবে দেখেছ কি? তোমরা তাকে উৎপন্ন কর, না আমি উৎপন্ন করি। আমি ইচ্ছা করলে তাকে খড়কুটা করে দিতে পারি, অতঃপর তোমরা বিস্ময়বিষ্ট হয়ে যাবে' (ওয়াক্বিয়াহ ৬৩-৬৫)।

'এ পানি দ্বারা তিনি তোমাদের জন্যে উৎপাদন করেন ফসল, যয়তুন, খেজুর, আঙ্গুর ও সর্বপ্রকার ফল। নিশ্চয়ই এতে চিন্তাশীলদের জন্যে নিদর্শন রয়েছে' (নাহল ১১)।

* *শিক্ষক (বিএস-সি, বিএড), জগতপুর এ,ডি,এইচ সিনিয়র মাদরাসা, বুড়িচং, কুমিল্লা।*

জগত পরিবেষ্টিত অগাধ জলধির উৎস পানি। পানির অপর নাম জীবন। মহান আল্লাহ অতি প্রয়োজনীয় এ পানি প্রাপ্তির বিষয়টিতেও মানুষকে চিন্তা-ভাবনা করার আহ্বান জানিয়ে বলেন, 'তোমরা যে পানি পান কর, সে সম্পর্কে ভেবে দেখেছ কি? তোমরা তা মেঘ থেকে নামিয়ে আন, না আমি বর্ষণ করি। আমি ইচ্ছা করলে তাকে লোনা করে দিতে পারি, অতঃপর তোমরা কেন কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর না?' (ওয়াক্বিয়াহ ৬৮-৭০)।

'আল্লাহ আকাশ থেকে পানি বর্ষণ করেছেন, তদ্বারা যমীনকে তার মৃত্যুর পর পুনর্জীবিত করেছেন। নিশ্চয়ই এতে তাদের জন্যে নিদর্শন রয়েছে যারা শ্রবণ করে' (নাহল ৬৫)।

মানব জাতির জন্য তাদের গৃহপালিত চতুষ্পদ জন্তু ও বন্য প্রাণীদের মধ্যেও চিন্তা-ভাবনা করার অবকাশ রয়েছে। আল্লাহ বলেন, 'তোমাদের জন্যে চতুষ্পদ জন্তুদের মধ্যে চিন্তা করার অবকাশ রয়েছে' (নাহল ৬৬)।

'আর তোমাদের সৃষ্টিতে এবং চারদিকে ছড়িয়ে রাখা জীব-জন্তুর সৃজনের মধ্যেও নিদর্শনাবলী রয়েছে বিশ্বাসীদের জন্য' (জাছিয়াহ ৪)।

কীট-পতঙ্গ, বৃক্ষলতার মধ্যেও রয়েছে মানুষের চিন্তা-ভাবনার বিষয়। আল্লাহ বলেন, 'এবং খেজুর বৃক্ষ ও আংগুর ফল থেকে তোমরা মধ্যম ও উত্তম খাদ্য তৈরী করে থাক, এতে অবশ্যই বোধশক্তি সম্পন্ন সম্প্রদায়ের জন্য নিদর্শন রয়েছে' (নাহল ৬৭)।

'আপনার পালনকর্তা মধুমক্ষিকাকে আদেশ দিলেন, পর্বত গাত্রে, বৃক্ষ এবং উঁচু চালে গৃহ তৈরী কর। এরপর সর্বপ্রকার ফুল থেকে ভক্ষণ কর এবং আপন পালনকর্তার উন্মুক্ত পথ সমূহে চলমান হও। তার পেট থেকে বিভিন্ন রঙের পানীয় নির্গত হয়। তাতে মানুষের জন্য রয়েছে রোগের প্রতিকার। নিশ্চয়ই এতে চিন্তাশীল সম্প্রদায়ের জন্য নিদর্শন রয়েছে' (নাহল ৬৮-৬৯)।

উড়ন্ত পক্ষীকুল সম্বন্ধেও রয়েছে মানুষের চিন্তা-ভাবনার বিষয়। আল্লাহ বলেন, 'তারা কি উড়ন্ত পাখীকে দেখে না? এগুলো আকাশের অন্তরীক্ষে আজ্ঞাধীন রয়েছে। আল্লাহ ছাড়া কেউ এগুলোকে আগলে রাখেনা, নিশ্চয়ই এতে বিশ্বাসীদের জন্যে নিদর্শনাবলী রয়েছে' (নাহল ৭৯)।

বৈচিত্রতায় পরিপূর্ণ এ পৃথিবীর রঙবেরঙের বস্তু সমূহকে নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করার জন্য আল্লাহ বলেন,

'তোমাদের জন্যে পৃথিবীতে যে সব রঙবেরঙের বস্তু ছড়িয়ে দিয়েছেন, সেগুলোতে নিদর্শন রয়েছে তাদের জন্যে, যারা চিন্তা-ভাবনা করে' (নাহল ১৩)।

আসমান ও যমীনের সৃষ্টিতে, দিবা-রাত্রির পরিবর্তন ও বায়ুর দিক পরিবর্তনেও রয়েছে মানুষের চিন্তা-ভাবনার বিষয়। আল্লাহ বলেন, 'নিশ্চয়ই আসমান ও যমীনের সৃষ্টিতে এবং রাত্রি ও দিনের আবর্তনে নিদর্শন রয়েছে বোধ সম্পন্ন লোকদের জন্য' (আলে ইমরান ১৯০)।

'দিবা-রাত্রির পরিবর্তনে আল্লাহ আকাশ থেকে রিযিক (বৃষ্টি) বর্ষণ করেন, অতঃপর পৃথিবীকে তার মৃত্যুর পর পুনরুজ্জীবিত করেন, তাতে এবং বায়ুর পরিবর্তনে বুদ্ধিমানদের জন্য নিদর্শনাবলী রয়েছে' (জাছিয়াহ ৫)।

আকাশ ও পৃথিবীর অবস্থান, পৃথিবীর উপর অচল-অটল হিমাদ্রির মধ্যেও মানুষের জন্য রয়েছে চিন্তা-ভাবনার বিষয়। আল্লাহ বলেন, 'তারা কি তাদের উপরিস্থিত আকাশের পানে দৃষ্টিপাত করে না, আমি কিভাবে তা নির্মাণ করেছি এবং সুশোভিত করেছি? তাতে কোন ছিদ্রও নেই' (ক্বাফ ৬)। 'আমি ভূমিকে বিস্তৃত করেছি, তাতে পর্বতমালার ভার স্থাপন করেছি এবং তাতে সর্বপ্রকার নয়নাভিরাম উদ্ভিদ উদগত করেছি। এটা জ্ঞান আহরণ ও স্মরণ করার মত ব্যাপার প্রত্যেক অনুরাগী বান্দার জন্য' (ক্বাফ ৭-৮)।

মাথার উপরে নক্ষত্র খচিত অনন্ত আকাশ এবং চন্দ্র-সূর্যের উদয়-অস্তের প্রক্রিয়ায় রয়েছে মানুষের জন্যে চিন্তা-ভাবনার খোরাক। মহান আল্লাহ বলেন, 'কল্যাণময় তিনি, যিনি নভোমণ্ডলে রাশিচক্র সৃষ্টি করেছেন এবং তাতে রেখেছেন সূর্য ও দীপ্তিময় চন্দ্র। যারা অনুসন্ধান প্রিয় অথবা যারা কৃতজ্ঞ প্রিয় তাদের জন্যে তিনি রাত্রি ও দিবস সৃষ্টি করেছেন পরিবর্তনশীল রূপে' (ফুরক্বান ৬১-৬২)।

'তিনিই তোমাদের কাজে নিয়োজিত করেছেন রাত্রি, দিন, সূর্য এবং চন্দ্রকে। তারকা সমূহ তারই বিধানে কর্মে নিয়োজিত রয়েছে। নিশ্চয়ই এতে বোধশক্তি সম্পন্নদের জন্যে নিদর্শনাবলী রয়েছে' (নাহল ১২)। মহান আল্লাহ্‌র অসংখ্য সৃষ্টিরাজির নে'মতের মাঝে থেকেও মানুষ আল্লাহ্‌র প্রতি বিশ্বাসী হ'তে চায় না। তাঁর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতেও কুণ্ঠাবোধ করে।

আল্লাহ্‌ই আমাদের সৃষ্টিকর্তা। তারপরেও মানুষ সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ্‌কে ভুলে যায়। বিশ্বাস করতে চায় না। সেজন্য আল্লাহ মানব জাতিকে সৃষ্টিকর্তা সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা করার জন্য বলেন, 'যিনি সৃষ্টি করেন তিনি কি সে লোকের সমতুল্য, যে সৃষ্টি করতে পারে না? তোমরা কি চিন্তা করবে না'? (নাহল ১৭)। চিন্তা-ভাবনা, গবেষণা, অনুসন্ধান থেকে শুরু হয়েছে মানুষের সাধনা। সাধনার সার্থক ফলশ্রুতিই হচ্ছে সত্য জ্ঞান। যা কি-না সৃষ্টি রহস্যের উদঘাটনের কার্যকরণ সম্পর্কের ব্যাখ্যা এবং মানব জাতির সার্বিক জীবন পরিচালনায় সমস্যাবলীর সমাধানের পদ্ধতি।

মানব জীবনের অসংখ্য সমস্যা সমাধানে, সভ্যতার

অগ্রগতির প্রতি ধাপে, দৈনন্দিন কাজ-কর্ম, চিন্তা-ভাবনা গবেষণা ও অনুসন্ধানে রয়েছে এক সুদূরপ্রসারী ভূমিকা।

চিন্তা-ভাবনা, গবেষণা ও অনুসন্ধান করা ইসলামী যিন্দেগীর একটি অপরিহার্য বিষয়। এ প্রসঙ্গে পবিত্র কুরআনের নিম্নোক্ত আয়াতটি প্রণিধানযোগ্য-

'যারা দাঁড়িয়ে, বসে এবং শুয়ে আল্লাহ্কে স্মরণ করে এবং নভোমণ্ডল ও পৃথিবীর সৃষ্টি সম্বন্ধে চিন্তা করে এবং বলে, হে আমাদের প্রভু, তুমি এ সমস্ত বৃথা সৃষ্টি করনি' (আলে ইমরান ১৯১)।

মহান আল্লাহ্র এই সৃষ্টিজগতে চিন্তাশীলদের জন্য তাঁর পরিচয় ও আনুগত্যের জন্য রয়েছে অসংখ্য নিদর্শন। কেননা বোধশক্তি ও চিন্তাশক্তি থাকলে আকাশ ও পৃথিবীর এবং এ দু'য়ের মধ্যবর্তী সৃষ্টি সমূহ অনেক সত্য উদঘাটন করে।

'হে মানব জাতি! কিসে তোমাকে তোমার মহামহিম পালনকর্তা সম্পর্কে বিভ্রান্ত করল? যিনি তোমাকে সৃষ্টি করেছেন, অতঃপর তোমাকে সুবিন্যস্ত করেছেন এবং সুষম করেছেন' (ইনফিতার ৬-৭)। 'তারা কি চিন্তা করে না যে, তারা পুনরুত্থিত হবে' (মুতাফ্ফিফীন ৪)। 'আপনি কি তার প্রতি লক্ষ্য করেছেন যে তার খেয়াল-খুশীকে স্বীয় উপাস্য স্থির করেছে? আল্লাহ জেনে শুনে তাকে পথভ্রষ্ট করেছেন, তার কান ও অন্তরে মোহর এঁটে দিয়েছেন এবং তার চোখের উপর রেখেছেন পর্দা। অতএব আল্লাহ্র পর কে তাকে পথ প্রদর্শন করবে? তোমরা কি চিন্তা–ভাবনা করনা? (জাছিয়াহ ২৩)।

এমনিভাবে পবিত্র কুরআনে মানব জাতিকে আল্লাহ্র পরিচয়, তাঁর আনুগত্য ও তাঁর বিধান মতে জীবন পরিচালনার জন্য রয়েছে অসংখ্য আয়াত। যার মাধ্যমে মহান আল্লাহ মানব জাতিকে বারবার চিন্তা-ভাবনা, গবেষণা ও অনুসন্ধান করার জন্য বলেছেন।

প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মাদ (ছাঃ) 'গারে হেরা'য় গভীর চিন্তা-ভাবনা, অক্লান্ত সাধনা এবং আল্লাহ্র বিশেষ অনুগ্রহের প্রেক্ষিতেই মানব জাতির জীবন বিধান তথা অহি-র বিধান কুরআন ও হাদীছ লাভ করেছিলেন আল্লাহ্র পক্ষ থেকে। আসমান ও যমীনের সৃষ্টি এবং তার উপরিস্থিত সৃষ্টিরাজির, বিচরণশীল প্রাণী ও জীব-জন্তু এবং স্নিগ্ধ শ্যামল উদ্ভিদ তরুলতা সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা করলে বুদ্ধির সামনে একটি মাত্র পরিণতি সাব্যস্ত হয়ে যায়। তাহ'ল- আল্লাহ্র পরিচয় লাভ, তাঁর আনুগত্য, তাঁরই যিকর তথা ইবাদত করা।

অতএব 'চিন্তা-ভাবনা' ইসলামী যিন্দেগীতে মুসলিম জীবনে অপরিহার্য কর্তব্য।

ইসলাম প্রতিষ্ঠায় যুবকদের ভূমিকা

*-মুহাম্মাদ জালালুদ্দীন**

ইসলাম প্রতিষ্ঠায় যুবকদের ভূমিকা অগ্রগণ্য। ইসলামের প্রাথমিক যুগ থেকে মুসলিম যুবকরা ইসলাম প্রতিষ্ঠায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। ইসলাম প্রতিষ্ঠার জন্য তারা আল্লাহ্র রাস্তায় নিজেদের জান-মাল উৎসর্গ করেছে। শত বাঁধা-বিপত্তি, বিপদ-আপদ বরণ করে নিয়েছে হাসি মুখে। দ্বীনের জন্য তারা পার্থিব জীবনের চাওয়া পাওয়া অনেক কিছু ত্যাগ করেছে। কবি সত্যি-ই বলেছেন-

'সেই ত্যাগ বীর
বুকের রুধির
হেলায় যে দিতে পারে'।[১]

হ্যাঁ, মুসলিম যুবকরাই সত্যের জন্য, ন্যায়নীতির জন্য, আদর্শ প্রতিষ্ঠার জন্য নিজেদের জীবন আল্লাহ্র রাহে উৎসর্গ করতে কুণ্ঠিত হয়নি। তারা অকাতরে জীবন উৎসর্গ করে আল্লাহ্র যমীনে তাঁরই মনোনীত ধর্ম ইসলাম প্রতিষ্ঠা করেছে। এ যুবকরাই বদর, ওহোদ, খন্দক, তাবুক, ইয়ারমুকের যুদ্ধে বুকের তাজা রক্ত ঢেলে দিয়ে ইসলামের শত্রুদের নিধন করেছে। দ্বীন প্রতিষ্ঠায় তাদের সর্বস্ব ত্যাগ ও জীবন উৎসর্গের ঘটনা ইসলামের সোনালী ইতিহাসে অসংখ্য। এ বিরল আত্মত্যাগের ঘটনা প্রবাহ মুসলিম যুবকদের আল্লাহ্র যমীনে তাঁরই দ্বীন প্রতিষ্ঠায় অনুপ্রেরণা সৃষ্টি করে। উৎসাহ ও পথ নির্দেশ দান করে যৌবনের প্রতিফোঁটা রক্ত আল্লাহ্র পথে ব্যয় করতে।

এ প্রসঙ্গে মহাবীর হযরত ওমর ফারূক (রাঃ)-এর ইসলাম গ্রহণোত্তর ঘটনা প্রণিধানযোগ্য। ইসলাম গ্রহণের পূর্বে মহাবীর ওমর ছিলেন ইসলামের ঘোরতর শত্রু। ইসলামকে অংকুরেই নিশ্চিহ্ন করে দিতে তিনি ছিলেন বদ্ধ পরিকর। ইসলাম গ্রহণের পর হযরত ওমর (রাঃ) হ'লেন ইসলামের মহান সেবক। সেবক হয়ে তিনি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহ্র রাসূল! বর্তমানে মুসলমানের সংখ্যা কত? রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, তোমাকে নিয়ে মোট চল্লিশে পৌঁছল'। ওমর (রাঃ) বললেন, এটাই যথেষ্ট। আজ থেকে আমরা চল্লিশ জনের এই ক্ষুদ্র বাহিনী নিয়ে মসজিদে হারামে গিয়ে আল্লাহ্র ইবাদত করব। আল্লাহ্র উপর ভরসা। অসত্যের ভয়ে, বাতিলের ভয়ে আর সত্যকে চাপা পড়ে থাকতে দিব না।[২]

সেদিন হযরত ওমর (রাঃ) সবাইকে নিয়ে উন্মুক্ত তরবারী হাতে পৃথিবীর সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ তাকবীর 'আল্লাহু

* *এম,এ, শেষ বর্ষ, ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগ, রাজশাহী কলেজ, রাজশাহী।*

১. *কাজী দ্বীন মুহাম্মাদ, জীবন সৌন্দর্য (ঢাকাঃ ইসঃ ফাঃ বাঃ পঞ্চম সংস্করণ জুন ১৯৯৪) পৃঃ ১৭।*
২. *আবুল আসাদ, আমরা সেই সে জাতি (ঢাকাঃ ইসলামিক বুক সেন্টার, ৪র্থ প্রকাশ মে '৯৮) ১ম খণ্ড, পৃঃ ১৪।*

আকবর' উচ্চারণ করতে করতে কা'বা প্রাঙ্গণে উপস্থিত হ'লেন। এক সাথে ছালাত আদায় করলেন। ক্ষুদ্র মুসলিম বাহিনীর সাথে মহাবীর ওমর (রাঃ)-কে দেখে কুরাইশরা বিস্মিত ও ক্ষুব্ধ হ'ল। তাদের অবস্থান দেখে হযরত ওমর (রাঃ) বলিষ্ঠ কণ্ঠে ঘোষণা করলেন, তোমাদের সাবধান করে দিচ্ছি, কোন মুসলমানের কেশাগ্র স্পর্শ করলে ওমরের তরবারী আজ থেকে তোমাদের বিরুদ্ধে পরিচালিত হবে।[৩]

উল্লেখ্য যে, হযরত ওমর (রাঃ)-এর ইসলাম গ্রহণের পূর্বে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ও তাঁর সাথীগণ ইসলাম প্রচারের কাজ অতি গোপনে করতেন। তাঁর ইসলাম গ্রহণের পর মুসলমানরা প্রকাশ্যে দ্বীনের দাওয়াত দিতে থাকলেন। ফলে মুসলমান ও কাফেরদের মাঝে সংঘর্ষ বাঁধল। সংগঠিত হ'ল হক ও বাতিলের মাঝে বদর, ওহোদ, খন্দক নামক প্রভৃতি স্থানে অসংখ্য রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ। প্রতিটি যুদ্ধে বাতিল পরাজিত হ'ল হক বিজয় লাভ করল। জান্নাত পাগল অসংখ্য যুবকের আত্মত্যাগের বিনিময়ে প্রতিষ্ঠিত হ'ল এ ধুলির ধরায় চির শান্তির ধর্ম ইসলাম। ধন্য হ'ল পৃথিবীর নির্যাতিত মানুষ। বঞ্চিত, মযলূম জনতা ফিরে ফেল তাদের অধিকার। তাদের মুখে ফুটে উঠল অনাবিল হাসি। উঁচু-নিচুর ভেদাভেদ দূর হ'ল। দূর হ'ল গোত্রে গোত্রে সংঘাত। সামাজিক বন্ধন সুদৃঢ় হ'ল। সমাজ শান্তিতে ভরে উঠল। অহি-র সত্য দিকে দিকে ছড়িয়ে পড়ল। এ ক্ষেত্রে যে সব যুবকের আত্মত্যাগ ও কুরবানী ইতিহাসের পাতায় স্বর্ণাক্ষরে লিপিবদ্ধ রয়েছে তারা হ'লেন মহাবীর খালিদ বিন ওয়ালিদ, রাসূলের চাচা আমীর হামযা, ওসামা বিন যায়েদ, 'আলী বিন আবু ত্বালেব, ত্বারিক বিন যিয়াদ, মূসা বিন নুছায়ের অনেক তেজোদীপ্ত বীর যোদ্ধা।

হে তরুণ ও যুবক সকল! তারাই আমাদের পথিকৃত। তাঁদের উত্তরসূরী মুসলিম আমরা। আজকে আমাদের সমাজ ব্যবস্থায় তাঁদের আচরিত তাদের রেখে যাওয়া ইসলাম নেই। অহি-র সত্য সমাজে প্রতিষ্ঠিত নেই। বাতিল মতাদর্শের গোলক ধাঁধায় আমরা হাবুডুবু খাচ্ছি। ফলে শ্রেষ্ঠ ধর্ম ইসলামের অনুসারী হয়েও আমরা আজ লাঞ্ছিত। শ্রেষ্ঠ জাতি হয়েও আমরা আজ অপমানিত। ঈমানের দাবী পূরণ করতে আমরা আজ চরমভাবে ব্যর্থ। আমাদের সমাজ ব্যবস্থায় আজ পুরোপুরি নৈতিকতার ধ্বস নেমেছে। সমাজ ও রাষ্ট্রীয় যন্ত্রে সুনীতি বলতে কিছুই নেই। সর্বত্র দুর্নীতির জয়জয়কার। সন্ত্রাস, চাঁদাবাজ ও মাস্তানদের অত্যাচারে সর্বস্তরের মানুষ আজ অতিষ্ঠ। চুরি-ডাকাতি, ছিনতাই, ধর্ষণ নিত্য-নৈমিত্তিক ব্যাপারে পরিণত হয়েছে। এ যেন প্রাক ইসলামী যুগের জাহেলিয়াতকেও হার মানিয়েছে তাই কবির ভাষায় বলতে হয়-

পাপাচার আর ব্যভিচারে
ছেয়ে গেছে আজ সারা দুনিয়া
নৈতিক মূল্যবোধের অবক্ষয়ে
বেড়েই চলেছে সুদ, ঘুষ আর মদ জুয়া
অন্যায় আর অবিচারে
বেড়েই চলেছে দুর্নীতি দুরাচার
বিংশ শতাব্দীর এই যুগে নেমে এসেছে
ফের জাহিলিয়াতের ঘোড় আধার।

বঞ্চিত ও নির্যাতিত মানুষ আজ শান্তির দিকে তীর্থের কাকের মত চেয়ে আছে। কে দেখাবে তাদের শান্তির পথ? মুক্তির পথ? কে তাদেরকে এই যালেমের অত্যাচার থেকে মুক্ত করে চির শান্তির আঙ্গিনায় নিয়ে আসবে? তারা আল্লাহ্‌র কাছে ফরিয়াদ করছে- 'হে আল্লাহ! তোমার পক্ষ থেকে আমাদের জন্য সাহায্যকারী পাঠাও। তোমার পক্ষ থেকে একজন অভিভাবক পাঠাও'। তাদের এই আর্তনাদে আজ আকাশ পাতাল ভারী হয়ে উঠছে। আল্লাহ বলেন,

وَمَا لَكُمْ لاَ تُقَاتِلُوْنَ فِىْ سَبِيْلِ اللهِ وَالْمُسْتَضْعَفِيْنَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِيْنَ يَقُوْلُوْنَ رَبَّنَا اَخْرِجْنَا مِنْ هذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ اَهْلُهَا ۚ وَاجْعَلْ لَّنَا مِنْ لَّدُنْكَ وَلِيًّا ۚ وَّاجْعَلْ لَّنَا مِنْ لَّدُنْكَ نَصِيْرًا-

'তোমাদের কি হ'ল যে, তোমরা আল্লাহ্‌র রাস্তায় লড়াই করছ না? দুর্বল সেই পুরুষ, নারী ও শিশুদের পক্ষে, যারা বলে, হে আমাদের পালনকর্তা! আমাদেরকে এই জনপদ থেকে নিষ্কৃতি দান কর। এখানকার অধিবাসীরা যে অত্যাচারী। আর তোমার পক্ষ থেকে আমাদের জন্য পক্ষাবলম্বনকারী নির্ধারণ করে দাও এবং তোমার পক্ষ থেকে আমাদের জন্য সাহায্যকারী নির্ধারণ করে দাও' (নিসা ৭৫)।

এ অবস্থায় একজন মুসলিম যুবক কি বসে থাকতে পারে? এ সব ঘটনার কি নিরব সমর্থন জানাতে পারে? মযলূম জনতার আর্তনাদ কি তার কর্ণকুহরে পৌঁছবে না? অলসতার চাদর মুড়ি দিয়ে সেকি শুয়ে থাকবে? নিশ্চয়ই না। একজন জান্নাত পাগল যুবকের পক্ষে তা কখনোই সম্ভব নয়। তাই সে তার নৈতিক দায়িত্ব পালনে এগিয়ে আসে। ঈমানের দাবী পূরণে তৎপর হয়। এ সব অন্যায়ের প্রতিবাদ করে। সম্মিলিত প্রতিরোধ গড়ে তোলে। দাওয়াত ও জিহাদের কর্মসূচী হাতে নিয়ে অহি-র সত্য প্রতিষ্ঠার লক্ষে 'অহি' বিরোধী কার্যকলাপের মূলোৎপাটনে নিরন্তর প্রচেষ্টা চালায়। কারণ বিশ্ববাসীর কল্যাণের জন্যেই আল্লাহপাক মুসলমানদের উত্থান ঘটিয়েছেন। মহাগ্রহ আল-কুরআনুল কারীমে এ প্রসঙ্গে বলা হয়েছে- 'তোমরা সর্বোত্তম উম্মত। মানব জাতির কল্যাণের জন্যেই তোমাদের উত্থান ঘটানো হয়েছে, তোমরা সৎ কাজে নির্দেশ দিবে এবং অসৎ কাজে প্রতিরোধ করবে এবং আল্লাহ্‌র অবিচল বিশ্বাস রাখবে' (আলে ইমরান ১১০)

সত্যের জন্য, ন্যায়ের জন্য, আল্লাহ্‌র 'অহি' প্রতিষ্ঠার জন্য নিজের জীবন উৎসর্গ করে। সত্যের জন্য যারা নিবেদিত প্রাণ, মৃত্যুকে তারা ভয় করে না। মৃত্যুকে তারা পায়ের ভৃত্য মনে করে। পরকালকে তারা অগ্রাধিকার দেয়। তারা

৩. ঐ, পৃঃ ১৪।

আল্লাহ্‌র রেযামন্দি হাছিল ও জান্নাতে যাওয়ার জন্য সদা উদগ্রীব হয়ে থাকে। কারণ, জান্নাতের বিনিময়ে মহান আল্লাহ মুমিনদের জান-মাল খরিদ করে নিয়েছেন। আল্লাহ বলেন,

اِنَّ اللّٰهَ اشْتَرٰى مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ اَنْفُسَهُمْ وَاَمْوَالَهُمْ بِاَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ-

'নিশ্চয়ই আল্লাহপাক জান্নাতের বিনিময়ে মুমিনদের জান মাল ক্রয় করে নিয়েছেন' (তওবা ১১১)। তাই যৌবনের উদ্যম ও তারুণ্যের ঢেউ আল্লাহ্‌র পথে ব্যয় করতে হবে। আর এটাই হচ্ছে একজন মুসলিম যুবকের নিকট ঈমানের দাবী। এ দাবী পূরণে যে যুবক তৎপর হয়, সে হয় আল্লাহ্‌র প্রিয় পাত্র। আর আল্লাহ খুশী হয়ে তাকে দান করবেন অসংখ্য নে'মতে ভরপুর চির শান্তির আবাস জান্নাত।

হে জান্নাত পাগল যুবক ভাইসকল! অধঃপতনের অতল তলে নিমজ্জিত মুসলিম জাতিকে রক্ষা করাই হচ্ছে মুসলিম যুবকের প্রধান ঈমানী ও নৈতিক দায়িত্ব। এ দায়িত্ব পালনে যুবকেরা মহাবীর ওমরের মত, খালিদ বিন ওয়ালিদের মত, ত্বারিক বিন যিয়াদের মত, মূসা বিন নুছায়েরের মত, সতের বৎসরের তরুণ মুহাম্মাদ বিন কাসিমের মত, মুসলিম বীর ইখতিয়ার উদ্দীন মুহাম্মাদ বখ্‌তিয়ার খিলজীর মত এগিয়ে আসবে। চিরন্তন ত্যাগের ঐতিহ্য স্মরণ করে মুসলিম জাতিকে রক্ষার জন্য সকল বিধান বাতিল করে আল্লাহ প্রেরিত সর্বশেষ অহি-র বিধান প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে নিজেদের জান-মাল আল্লাহ্‌র রাহে উৎসর্গ করবে। আর এটাই হচ্ছে মুসলিম যুবকদের নিকট এ সময়ের চূড়ান্ত দাবী। এ দাবী পূরণে মুসলিম যুবকদের দায়িত্ব হচ্ছে, সমাজ সংশোধনের জন্য 'দাওয়াত ও জিহাদের খুন রাঙা পথ বেছে নেয়া। কথা, কলম ও সংগঠনের মাধ্যমে এগিয়ে যাওয়া।

ফলশ্রুতিতে দাওয়াত ও জিহাদের খুন রাঙা পথেই ভেসে যাবে জাতির ভাগ্যাকাশ থেকে অমানিশার কালো অন্ধকার, দুর্যোগের ঘণঘটা। তদস্থলে নবতর রূপে প্রতিষ্ঠা পাবে অহি-র বিধান। অহি-র জ্যোতির্ময় আলোকে ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ এবং রাষ্ট্রীয় জীবনে নেমে আসবে চির শান্তির ফল্গুধারা।

পরিশেষে যুবকভাইদের প্রতি উদাত্ত আহবান- আসুন! আমরা সবাই মুসলিম জাতির এই দুর্দিনে তাদের মুক্তির জন্য আল্লাহ্‌র সর্বশেষ অহিভিত্তিক একটি সুশীল ইসলামী সমাজ প্রতিষ্ঠায় এগিয়ে আসি। শিরক-বিদ'আত এবং সকল প্রকার জাহেলিয়াতের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিরোধ গড়ে তুলি। যৌবনের প্রতিফোঁটা রক্তের হিসাব দেয়ার জন্য প্রস্তুত হই। হে আল্লাহ! তুমি আমাদের সবাইকে তোমার দ্বীনের মুজাহিদ হিসাবে কবুল করে নাও।- আমীন!!

ইসলামী ভ্রাতৃত্ব

*-মুহাম্মাদ তাসলীম সরকার**

ভ্রাতৃত্ব শব্দটি আরবী مُؤَاخَاةٌ (মুয়াখাতুন) শব্দের প্রতিশব্দ। ইহা اَخٌ (আখুন) শব্দ হ'তে উদ্ভূত। এর আভিধানিক অর্থ- পরস্পর ভ্রাতৃত্ব বন্ধনে আবদ্ধ হওয়া, পরস্পর ভ্রাতৃত্ব স্থাপন করা (আল-কাউছার)।

পারিভাষিক অর্থে সমাজে বসবাসকারী মানব সম্প্রদায়ের মধ্যে পরস্পর ভাইয়ের মত আচরণ করা এবং একে অন্যের সুখে-দুঃখে সঙ্গী হয়ে সৌহার্দ্য, সম্প্রীতি, হৃদ্যতাপূর্ণ ও বন্ধুত্বসুলভ সম্পর্ক বজায় রাখাকে ভ্রাতৃত্ব বলে। আর ইসলামী সমাজে এরকম সম্পর্ক বিরাজ করাকে ইসলামী ভ্রাতৃত্ব বলে। প্রিয় নবী (ছাঃ) ছিলেন ভ্রাতৃত্বের সুমহান আদর্শ।

ভ্রাতৃত্বের শ্রেণী বিন্যাসঃ

মহান স্রষ্টা আল্লাহ্‌র নির্দেশে মানুষ পৃথিবীতে আসে এবং তাঁরই নিকটে প্রত্যাবর্তন করে। এ সীমিত সময়ে তাদেরকে ভ্রাতৃত্বের ৪টি (চার) স্তর অতিক্রম করতে দেখা যায়। যথা-

(১) **জন্মসূত্রে ভ্রাতৃত্বঃ** অর্থাৎ একই পিতা কিংবা মাতার ঔরসজাত সন্তানদের মধ্যে যে ভ্রাতৃত্ব বিদ্যমান থাকে তাকে জন্মসূত্রে ভ্রাতৃত্ব বলে।

(২) **কৃত্রিম ভ্রাতৃত্বঃ** কোন নির্দিষ্ট বংশ, বর্ণ বা অঞ্চলে জন্ম ও বসবাসের কারণে যে ভ্রাতৃত্ব গড়ে ওঠে তাকে কৃত্রিম ভ্রাতৃত্ব বলে।

(৩) **উৎসগত ভ্রাতৃত্বঃ** সৃষ্টির সকল মানুষের আবির্ভাবের উৎস একই পিতা-মাতা যথাক্রমে আদম (আঃ) ও বিবি হাওয়া (আঃ)। এ প্রেক্ষাপটে সকল মানুষের মধ্যে উৎসগত ভ্রাতৃত্ব বিদ্যমান।

(৪) **আদর্শগত ভ্রাতৃত্বঃ** কোন বিশেষ আদর্শকে ভিত্তি করে কোন ভ্রাতৃত্ব গড়ে উঠলে তাকে আদর্শগত ভ্রাতৃত্ব বলে। যেমন একই অঞ্চলে একই আদর্শ প্রতিষ্ঠাকামীরা একত্রিত হয়ে সে আদর্শে বিশ্বাসী ভ্রাতৃত্ব গড়ে ওঠে।

অনুরূপ ইসলামী আদর্শ প্রতিষ্ঠাকল্পে মুসলমানদের মধ্যে ইসলামী ভ্রাতৃত্ব গড়ে ওঠে।

ব্যবহারিক অর্থে- উপরোক্ত ভ্রাতৃত্বকে দু'ভাগে বিভক্ত করা হয়েছে। যথাঃ

(১) **বিশ্ব ভ্রাতৃত্বঃ** একই পিতা-মাতা হযরত আদম (আঃ) ও বিবি হাওয়া (আঃ)-এর সন্তান হিসাবে জাতি-ধর্ম-বর্ণ-গোত্র, স্থান-কাল-পাত্র ভেদে পৃথিবীর সকল

* তুলাগাঁও, দেবিদ্বার, কুমিল্লা।

মানুষ পরস্পর ভাই ভাই। এ দৃষ্টিকোণ থেকে সকল মানুষই সমান, পরস্পরের কোন শ্রেষ্ঠত্ব নেই। মহান আল্লাহ্‌র বাণী,

يَاَيُّهَا النَّاسُ اِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِّنْ ذَكَرٍ وَّاُنْثٰى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوْبًا وَّ قَبَائِلَ لِتَعَارَفُوْا-

'হে মানব সম্প্রদায়! আমি তোমাদেরকে এক পুরুষ ও এক নারী থেকে সৃষ্টি করেছি এবং তোমাদেরকে বিভিন্ন জাতি ও গোত্রে বিভক্ত করেছি, যাতে তোমরা পরস্পরে পরিচিত হও' (হুজুরাত ১৩)।

এ প্রসঙ্গে মহানবী (ছাঃ) এরশাদ করেন-

كُلُّكُمْ مِنْ اٰدَمَ وَاٰدَمُ مِنْ تُرَابٍ

'তোমরা সকলেই আদম হ'তে (সৃষ্ট) এবং আদম (আঃ) মাটি হ'তে (সৃজিত)'। সুতরাং প্রমাণিত হচ্ছে যে, একই রক্ত-মাংসে গড়া দেহ ও একই গঠন-আকৃতির বিচারে পৃথিবীর সকল মানুষই পরস্পর ভাই ভাই।

"সকলের তরে সকলে মোরা
প্রত্যেকে মোরা পরের তরে।"

(২) ইসলামী ভ্রাতৃত্বঃ ইসলামী আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে আল্লাহ ও তদীয় রাসূল (ছাঃ) প্রদত্ত ও প্রদর্শিত বিধানাবলী অনুসরণের মাধ্যমে পৃথিবীর সকল মুসলমানের মধ্যে যে ব্যাপক ও চিরন্তন ভ্রাতৃত্ব গড়ে ওঠে তাকেই ইসলামী ভ্রাতৃত্ব বলে। মহান আল্লাহ এ ভ্রাতৃত্ববোধের ঘোষণা দিয়ে বলেন- اِنَّمَا الْمُؤْمِنُوْنَ اِخْوَةٌ ، فَاَصْلِحُوْا بَيْنَ اَخَوَيْكُمْ -

'মুমিনরা তো পরস্পর ভাই ভাই। অতএব তোমরা তোমাদের দুই ভাইয়ের মধ্যে মীমাংসা কর' (হুজুরাত ১০)। আল্লাহ্‌র এই অমোঘ বাণী মুমিন ভ্রাতৃত্বকে করেছে শীশাঢালা প্রাচীরের ন্যায় দুর্ভেদ্য ও কঠিন। এরা প্রত্যেকেই স্বীয় ভাইয়ের প্রতি কোমল হৃদয়। এ সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ঘোষণা করেন, اَلْمُسْلِمُ اَخُ الْمُسْلِمِ

'একজন মুসলমান আরেক মুসলমানের ভাই'। আল্লাহপাকের নির্দেশের আলোকে আমাদের মধ্যে স্থায়ী ভ্রাতৃত্ব ও সম্প্রীতি প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে লক্ষাধিক তাওহীদি জনতার মাঝে বিদায় হজ্জের ভাষণে আরাফাহ্‌র ময়দানে জীবনের সর্বশেষ মহাসমাবেশে মহানবী (ছাঃ) ঘোষণা করেন,

لَيْسَ لِلْعَرَبِىِّ فَضْلٌ عَلَى الْعَجَمِىِّ - وَلَا لِلْعَجَمِىِّ فَضْلٌ عَلَى الْعَرَبِىِّ- كُلُّكُمْ اَبْنَاءُ اٰدَمَ وَاٰدَمُ مِنَ التُّرَابِ -

'অনারবীদের উপর আরব অধিবাসীদের কোন পদমর্যাদা নেই। অনুরূপ আরব অধিবাসীদের উপর অনারবীদের কোন মর্যাদা নেই। কেননা, তোমরা প্রত্যেকে আদমেরই সন্তান, আর আদম মাটি হ'তে সৃজিত'।

ইসলামে ভ্রাতৃত্বের গুরুত্বঃ

ইসলামী ভ্রাতৃত্বের দাবী অনুসারে ভাষা, বর্ণ, গোত্র, দেশ-কাল, পাত্র প্রভৃতি নির্বিশেষে পৃথিবীর সকল মানুষই ভাই ভাই। তাই ইসলামী ভ্রাতৃত্বের প্রেক্ষাপট ব্যাপক ও বিস্তৃত এবং এর তাৎপর্য সুদূর প্রসারী, বহুমুখী। এক্ষণে ইসলামী ভ্রাতৃত্বের উদাহরণ স্বরূপ কতিপয় তাৎপর্য নিয়ে আলোচনা করা হল-

প্রথমতঃ ইসলামী ভ্রাতৃত্ব এমন এক বন্ধন, যার মাধ্যমে মানুষের পারস্পরিক হিংসা-বিদ্বেষ, হানা হানি, দীর্ঘদিনের পুঞ্জীভূত শত্রুতা বিদূরিত হয়ে সহোদরতুল্য ভ্রাতৃসম্পর্ক গড়ে ওঠার পথ সুগম হয়। বহুধাবিভক্ত পরস্পর শত্রুতা, মারামারি, কাটাকাটিতে অহর্নিশ লিপ্ত দুরন্ত মরুআরবের পাষাণ হৃদয় মানুষগুলি পবিত্র ইসলামের সুশীলত ছায়াতলে আশ্রয় গ্রহণ করার কল্যাণে তাদের মধ্যে যে ভ্রাতৃত্ব ও ঐক্য-সংহতি গড়ে উঠেছিল তা ইতিহাসে বিরল দৃষ্টান্ত হয়ে থাকবে। পবিত্র কুরআনে তৎপ্রতি ইংগিত করতঃ এরশাদ হচ্ছে,

وَاذْكُرُوْا نِعْمَتَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ اِذْ كُنْتُمْ اَعْدَاءً فَاَلَّفَ بَيْنَ قُلُوْبِكُمْ فَاَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهٖ اِخْوَانًا -

'তোমরা সে নে'মতের কথা স্মরণ কর, যা আল্লাহ তোমাদেরকে দান করেছেন। তোমরা পরস্পর শত্রু ছিলে। অতঃপর আল্লাহ তোমাদের মনে সম্প্রীতি দান করেছেন। ফলে, এখন তোমরা তার অনুগ্রহের কারণে পরস্পর ভাই ভাই হয়েছ' (আলে ইমরান ১০৩)। সুতরাং আল্লাহ তা'আলা নিজে কোমল এবং তিনি কোমলতাকেই পসন্দ করেন।

দ্বিতীয়তঃ সহোদর ভাইদের মধ্যে যেমন সৌহার্দ্য ও সম্প্রীতি বিরাজ করে। তুচ্ছ পার্থিব স্বার্থ তাদের মধ্যে কোনরূপ হিংসা-বিদ্বেষ, কলহ-বিবাদ সৃষ্টি করতে পারেনা। ঘটনাক্রমে কখনও কোনরূপ ভুল বুঝাবুঝির সৃষ্টি হ'লে ভ্রাতৃত্বের আকর্ষণ সে ক্ষেত্রে আপোষ-মীমাংসায় অনুপ্রাণিত করে। অনুরূপ দৈবাৎ কখনও মুসলমানদের মধ্যে পরস্পর কলহ-বিবাদ দেখা দিলে ইসলামী ভ্রাতৃত্বের কারণে অপরাপর মুসলমানগণ বিবদমান দুই দলের মধ্যে আপোষ-মীমাংসা করে দিবে। এ বিষয়ে আল্লাহ্‌র নির্দেশ فَاَصْلِحُوْا بَيْنَ اَخَوَيْكُمْ 'তোমরা তোমাদের দুই ভাইয়ের মধ্যে পরস্পর মীমাংসা করবে' (হুজুরাত ১০)।

আল্লাহ্‌র এ নির্দেশ মুমিন বান্দাদের সম্প্রীতির দিকে উৎসাহিত করে। এজন্য মুমিনগণ সদা আল্লাহ্‌র নির্দেশ পালনে সচেষ্ট থাকে।

তৃতীয়তঃ মুসলমানদের মধ্যে জাতীয় ঐক্য প্রতিষ্ঠা করা ও

যেকোন মূল্যে মুসলমানদের ঐক্য-সংহতি বিঘ্নিত হ'তে না দেয়া ইসলামী ভ্রাতৃত্বের অন্যতম দাবী। আর এ মর্মে আল্লাহ্র নির্দেশ,

وَاعْتَصِمُوْا بِحَبْلِ اللهِ جَمِيْعًا وَّلاَ تَفَرَّقُوْا –

'তোমরা সকলে আল্লাহ্র রজ্জুকে সুদৃঢ়ভাবে ধারণ কর; পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়োনা' (আলে ইমরান ১০৩)। আল্লাহ্র এ নির্দেশ মান্যকারী মুমিনদের মধ্যেই চিরদিন ভ্রাতৃত্ব ও সম্প্রীতি বিরাজমান থাকবে। কোন প্রকার হিংসা-বিদ্বেষ বশেঃ পরস্পরে শত্রু হলে জাহান্নামের আগুন থেকে আল্লাহ্র নিকট ক্ষমা চাইবে এবং পরস্পরের মধ্যে সর্বোত্তম সম্প্রীতি বজায় রাখবে।

চতুর্থতঃ কথা ও কাজের দ্বারা অপর মুসলমান ভাইকে মর্মাহত ও ব্যথিত না করা এবং সর্বদা অপরের জন্য কষ্টদায়ক বিষয় হ'তে বেঁচে থাকা ইসলামী সম্প্রীতি ও ভ্রাতৃত্বের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ দাবী। এ বিষয়ে সতর্ক করে মহানবী (ছাঃ) ঘোষণা করেন, اَلْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُوْنَ مِنْ لِّسَانِهِ وَيَدِهِ

'সে ব্যক্তিই প্রকৃত মুসলমান, যার হাত ও জবান হ'তে অপর মুসলমান নিরাপদ থাকে'।[১] আর এ নিরাপত্তার পূর্বশর্তই হ'ল ভ্রাতৃত্ব ও সম্প্রীতি। এ প্রসংগে মহানবী (ছাঃ) আরো বলেন,

سِبَابُ الْمُسْلِمِ فُسُوْقٌ وَقِتَالُهُ كُفْرٌ

'মুসলমানকে গালি দেয়া ফাসেকী এবং খুন করা কুফুরী'।[২] এ সকল স্বভাব পরিহার করলেই পরস্পরের মধ্যে সম্প্রীতি ও সদ্ভাব প্রতিষ্ঠিত হবে।

পঞ্চমতঃ মুসলমানদের মধ্যে সম্প্রীতি স্থাপনে আত্মীয়তার সম্পর্ক বিষয়ে পূর্ণ সজাগ থাকতে হবে। পরস্পরের মধ্যে সম্প্রীতি স্থাপনে আল্লাহ্র নিকট জবাবদিহির অনুভূতির বিকল্প নেই। সকল মানুষ আল্লাহ্র সৃষ্টি হিসাবে তাঁর নিকট হিসাব দেয়ার জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে। আল্লাহ বলেন,

يَاَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوْا رَبَّكُمُ الَّذِىْ خَلَقَكُمْ مِّنْ نَّفْسٍ وَّاحِدَةٍ وَّخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيْرًا وَّنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللهَ الَّذِىْ تَسَاءَلُوْنَ بِهِ وَالْاَرْحَامَ

'হে মানব সমাজ! তোমরা তোমাদের পালনকর্তাকে ভয় কর, যিনি তোমাদেরকে এক ব্যক্তি হ'তে সৃষ্টি করেছেন, আর বিস্তার করেছেন তাদের দু'জন থেকে অগণিত পুরুষ ও নারী। আর আল্লাহ্কে ভয় কর, যার নামে তোমরা একে অপরের নিকট প্রার্থনা কর এবং আত্মীয়তার ব্যাপারে সতর্কতা অবলম্বন কর' (নিসা ১)।

আত্মীয়তার সম্পর্ক বিনষ্টকারীর পরিণাম সম্পর্কে মহানবী (ছাঃ) ঘোষণা করেন, لاَ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ قَاطِعٌ 'আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্নকারী জান্নাতে প্রবেশ করবে না'।[৩] সুতরাং জান্নাতে প্রবেশ করতে হ'লে আত্মীয়-স্বজনের প্রতি সদ্ব্যবহার ও সম্প্রীতি বজায় রাখতে হবে।

কোন মুসলিম ভাই অসুস্থ হ'লে তার সেবা-শুশ্রূষা করা, তাকে দেখতে যাওয়া এবং সর্বাবস্থায় স্বীয় মুসলিম ভাইয়ের মঙ্গল কামনা করা ইসলামী ভ্রাতৃত্বের একটি বিশেষ দিক। নবী করীম (ছাঃ) এরশাদ করেন,

لِلْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ سِتٌّ بِالْمَعْرُوْفِ يُسَلِّمُ عَلَيْهِ اِذَا لَقِيَهُ وَيُجِيْبُهُ اِذَا دَعَاهُ وَيُشَمِّتُهُ اِذَا عَطَسَ وَيَعُوْدُهُ اِذَا مَرِضَ وَيَتْبَعُ جَنَازَتَهُ اِذَا مَاتَ وَيُحِبُّ لَهُ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ –

'একজন মুসলমানের অপর মুসলমানের উপরে ছয়টি উত্তম অধিকার রয়েছে- যখন কোন মুসলমানের সাথে সাক্ষাৎ হবে তাকে সালাম করবে, কেউ ডাকলে তার ডাকে সাড়া দিবে, কারো হাঁচি আসলে তার হাঁচির জবাব দেবে। কেউ রোগাক্রান্ত হ'লে তার সেবা-শুশ্রূষা করবে। কেউ মৃত্যু বরণ করলে তার জানাযায় গমন করবে, অপর মুসলমানের জন্য সেই জিনিষই কামনা করবে যা সে নিজের জন্য পসন্দ করে।[৪]

মুসলমানদের মধ্যে পরস্পর এ সৌভ্রাতৃত্ব ও সম্প্রীতি স্থাপনের লক্ষ্যে মহানবী (ছাঃ) অধিক পরিমাণে সালামের প্রচলন করা একটি অন্যতম বিশেষ আমল বলে উল্লেখ করেছেন।[৫]

উপসংহারঃ ভ্রাতৃত্ব ইসলামের একটি অনুপম দিক নির্দেশনা ও অনন্য অবদান। আজকের সমাজ ব্যবস্থায় যে নৈরাজ্য ও বিশৃঙ্খলা, মানুষে-মানুষে, ভাইয়ে-ভাইয়ে হানাহানি, সন্ত্রাস, দুর্নীতি, ডাকাতি, হত্যা, ধর্ষণ, চাঁদাবাজি প্রভৃতি অনৈসলামী কার্যাবলী ইসলামী ভ্রাতৃত্ববোধের অভাবের ফল। বিশেষতঃ আমাদের দেশে গণতন্ত্রের নামে এবং এরই বিষময় ফল সমাজ ব্যবস্থাকে করুণ পর্যায়ে ঠেলে দিচ্ছে। পরিশেষে মুসলমানদেরকে তাদের হারানো ঐতিহ্য ফিরে পেতে হ'লে ইসলামী ভ্রাতৃত্ববোধে উজ্জীবিত হ'তে হবে। সে জন্য উপরোক্ত বিষয়াবলী সহায়ক ভূমিকা পালন করবে বলে সে সমস্ত বিষয়কে প্রাধান্য দেয়া আবশ্যক। আল্লাহ আমাদের প্রতি রহম করুন-আমীন!!

১. *অধ্যক্ষ আব্দুস সামাদ বঙ্গানুবাদ বুখারী, (ঢাকাঃ তাওহীদ ট্রাষ্ট জানুয়ারী'৯৮) হাদীছ নং ১০/১১।*
২. *বুখারী ও মুসলিম, মিশকাত হা/৪৬০১।*
৩. *বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৪৭০৩।*
৪. *তিরমিযী, দারেমী, মিশকাত হা/৪৪৩৬।*
৫. *মুসলিম, মিশকাত হা/৪৪২৪।*

বিশ্বনবী কি ইলমে গায়েব জানতেন?

*-যিল্লুর রহমান নদভী**

কেবল পাক ভারত উপমহাদেশেই নয়, বরং বিশ্বের বিভিন্ন দেশে এমন কিছু লোক আছে, যারা বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মাদ (ছাঃ)-কে ইলমে গায়েব জানতেন বলে বিশ্বাস করে। এই ভ্রান্ত ধারণা পোষণকারীদের বিরুদ্ধে আমাদের বক্তব্য এই যে, ইলমে গায়েব একমাত্র আল্লাহ ছাড়া আর কেউ জানেন না। কোন নবী-রাসূল, ওলী, পীর, ইলমে গায়েব জানেন না এবং জানতেও পারেন না। তবে হ্যাঁ, আল্লাহ যাঁকে যে পরিমাণ জ্ঞান দান করেছেন সে পরিমাণ তিনি জানেন। আর যাকে 'অহি' মারফত যতটুকু জ্ঞান দান করা হয়েছিল ঠিক ততটুকু তিনি অবগত হয়েছেন।

'ইলমে গায়েব' মানে বর্তমান, ভবিষ্যৎ ও অতীতের গোপন সংবাদ সম্যকভাবে অবগত হওয়া। এই গোপন সংবাদ সম্পর্কে বিশ্বনিয়ন্তা মহান আল্লাহ আমাদের বিশ্বনবী (ছাঃ)-কে বলে দিয়েছেন যে, 'হে প্রিয়তম হাবীব! তুমি বলে দাও যে, উর্ধ্বগগণে, আকাশসমূহের অন্তরালে ও যমীন সমূহের গহ্বরে যেখানে যা কিছু গোপন আছে এক আল্লাহ ছাড়া আর কেউ বিন্দুমাত্র অবগত নয়' (নামাল ৬৫)। সূরা আন'আমের ৫৯ আয়াতে আল্লাহ বলেন যে, 'অদৃশ্য জগতের যত ভান্ডার, বিশাল পৃথিবীর জলরাশী, পর্বতরাশীর অতল গহ্বরে যেখানে যা কিছু লুক্কায়িত আছে, তার তত্ত্ব জ্ঞান একমাত্র আল্লাহ্‌র নিকটে বিদ্যমান'। লক্ষকোটি তরু-লতার একটি পাতাও তার বিনা অনুমতিতে হেলাদুলা করে না, ঝরেও পড়ে না। ভূগর্ভস্থ অন্ধকার পুঞ্জের নিভৃত কোণে অবস্থিত কোন একটি শস্য কণাও তাঁর অগোচরে বিরাজ করে না। যাবতীয় সংবাদ একমাত্র আল্লাহ্‌র নিকটে বিদ্যমান। মহান আল্লাহ বলেন,

وَمَا تَسْقُطُ مِن وَّرَقَةٍ إِلاَّ يَعْلَمُهَا وَلاَ حَبَّةٍ فِىْ ظُلُمَاتِ الْاَرْضِ وَلاَ رَطْبٍ وَلاَ يَابِسٍ إِلاَّ فِىْ كِتَابٍ مُّبِيْنٍ-

'তাঁর অজ্ঞাতসারে (গাছের) একটি পাতাও ঝরে পড়ে না, মৃত্তিকার অন্ধকারে এমন কোন শস্য কণাও অংকুরিত হয় না অথবা রসযুক্ত কিংবা শুষ্ক এমন কোন বস্তু নেই যা সুস্পষ্ট কিতাবে নেই' (আন'আম ৫৯)।

প্রসিদ্ধ নবীগণও ইলমে গায়েব জানতেন না। নবীগণ ইলমে গায়েব সম্পর্কে অবগত থাকলে আদম (আঃ) কস্মিনকালেও শয়তানের ধোকায় পড়ে 'গন্দম' খেয়ে জান্নাত থেকে বিতাড়িত হ'তেন না। নূহ (আঃ) নিজ কাফের পুত্রের জন্য আল্লাহ্‌র নিকট তার জীবন রক্ষার সুপারিশ করে ক্রোধের পাত্র হ'তেন না। ইয়াকুব (আঃ) ইউসুফ (আঃ)-কে তাঁর দস্যু স্বভাব ভাইদের সঙ্গে মেষ চরাতে পাঠাতেন না। বার বৎসর যাবৎ পুত্রের শোকে তিনি চক্ষু দু'টি অন্ধ করে ফেলতেন না। ইউনূস (আঃ) মাছের পেটে ৪০ দিন পরাভোগ ভুগবেন সে কথা জানলে তিনি নদী পার হ'তেন না। সুলায়মান (আঃ) হুদহুদ পাখি ও মুলকে সাবা-র রাণী বিলকিসের কোন সংবাদ রাখতেন না। মূসা (আঃ) ইলমে গায়েব জানলে হাতের লাঠি সাপ হয়ে যাওয়ার পর ভয় করতেন না। নবী খিজিরের নিকট তিন তিনবার ধমক খেয়ে বিতাড়িত হ'তেন না। আল্লাহ্‌র খলীল ইবরাহীম (আঃ)-এর কাছে মেহমান রূপে কয়েকজন ফেরেশতার আগমন ঘটেছিল বা হয়েছিল। ইবরাহীম (আঃ) মেহমানদের মেহমানদারী করার জন্য তাদের সামনে খাদ্য সামগ্রী রেখে খাওয়ার জন্য মেহমানদের অনুরোধ জানিয়েছিলেন। কিন্তু মেহমানগণ কোন মতেই খাদ্য গ্রহণ করলেন না। যার ফলে ইবরাহীম (আঃ) ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে পড়লে আগত মেহমানগণ ইবরাহীম-এর ভয়ভীতি দেখে নিজেদের পরিচয় এভাবে দিলেন যে, আপনার কোন ভয় নেই, আমরা আল্লাহ্‌র বার্তাবাহক ফেরেশতা। একথা শ্রবণের পর ইবরাহীম (আঃ)-এর ভয়ভীতি দূর হয়। যদি তিনি ইলমে গায়েব জানতেন তাহ'লে ইলমে গায়েব দ্বারা পূর্বেই তিনি ফেরেশতাদের পরিচয় জানতে পারতেন। তাদের সামনে খাদ্য সামগ্রী রেখে খাবার জন্য অনুরোধ করতেন না।

হযরত লূত্ব (আঃ)-এর জাতিকে ধ্বংস করার জন্য কয়েকজন ফেরেশতা সুশ্রী বালকের আকৃতি ধারণ করে এসেছিলেন। হযরত লূত্ব (আঃ) তাঁদেরকে মানব সন্তান মনে করে কাওমে লূতের গুন্ডা-পান্ডা লোকদের হাত থেকে রক্ষা করার জন্য স্বগৃহে লুকিয়ে রাখেন, যেন তাঁর মেহমানগণ অপমানিত না হন। হযরত লূত্ব (আঃ) যদি ইলমে গায়েব জানতেন তাহ'লে তাদেরকে লুকিয়ে রাখবেন কেন? হযরত মূসা (আঃ) তার অনুপস্থিতিতে হযরত হারুণকে তাঁর স্থলাভিষিক্ত করে 'তূর' পাহাড়ে গমন করেন। ইহুদী সম্প্রদায় হযরত হারুণের আদেশ অমান্য করে গাভী পূজা আরম্ভ করে দেয়। নবী মূসা 'তূর' পাহাড় থেকে ফিরে এসে দেশবাসীর অবস্থা অবলোকন করে আপন ভাই নবী হারুণকে দোষী সাব্যস্ত করেন এবং তাঁর মাথার বাবরী চুল ও লম্বা দাঁড়ী ধরে হেঁচকা টান দিয়ে অপমান করেন। নবী হারুণ বিনয়াবনত হয়ে সমস্ত ঘটনা ব্যক্ত করলে মূসা (আঃ)-এর ক্রোধ অবদমিত হয়। কুরআন মজীদে একের পর এক সমস্ত নবীগণের ঘটনা সমূহ দ্ব্যর্থহীন ভাষায় উল্লেখ করা হয়েছে। যার দ্বারা প্রকাশ্য

** সাং হরিরামপুর, পোঃ দাউদপুর, দিনাজপুর, প্রবীণ লেখক ও গ্রন্থ প্রণেতা।*

দিবালোকের ন্যায় একথা প্রমাণিত হয় যে, নবীগণ কস্মিনকালেও গায়েব জানতেন না।

এখন প্রশ্ন জাগে যে, সাইয়েদুস সাক্বালাইন, ইমামুল হারামাইন, সরদারে দো-জাহান, নবী কুল ভূষণ, বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মাদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ইলমে গায়েব সম্পর্কিত ব্যাপারটা কি? তিনি কি ইলমে গায়েব জানতেন? সংক্ষেপে জবাব এই যে, বিশ্বনবী যদি ইলমে গায়েব জানতেন তাহ'লে তিনি বিষমিশ্রিত বকরীর মাংস কস্মিনকালেও ভক্ষণ করতেন না। শত্রুর আঘাতে ক্ষতবিক্ষত হ'তেন না। ওহোদ ময়দানে দান্দান মুবারক শহীদ করে আসতেন না। তিনি গায়েব জানলে ত্বায়েফের ময়দানে তাবলীগের জন্য যেতেন না। জননী আয়েশার কলঙ্কের ব্যাপারে মাসাধিককাল তিনি মূহ্যমান থাকতেন না। আবদুল্লাহ ইবনে উম্মে মাকতূমকে বাদ দিয়ে দস্যু স্বভাব দলপতিদের প্রতি ইসলাম প্রচারে ব্যস্ত থাকতেন না। আছরের চার রাক'আত ছালাত দু'রাক'আত পড়ে সালাম ফিরাতেন না। স্বর্গবাসিনী জীবন সঙ্গিনী আয়েশাকে পিছনে রেখে মদীনায় পৌঁছতেননা (বুখারী)।

ভবিষ্যতে বিশ্বনবীকে দেশ বিদেশের লোকেরা গায়েবদান বলে দাবী করবে। এই জন্য মহান আল্লাহ কুরআন মজীদে আয়াত নাযিল করে সমগ্র বিশ্ববাসীকে জানিয়ে দিলেন যে,

قُلْ لاَ اَقُوْلُ لَكُمْ عِنْدِىْ خَزَائِنُ اللّٰهِ وَلاَ اَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلاَ اَقُوْلُ لَكُمْ اِنِّىْ مَلَكٌ –

'তুমি বলে দাও! কুদরতে এলাহীর গোপন ধনভাণ্ডার আমার নিকটে নেই। আর আমি গায়েবের কোন সংবাদও রাখি না'। আর আমি অতিমানব ফেরেশতাও দাবী করি না। আর বিশ্ববাসীকে তুমি একথাও বলে দাও যে, 'ইন আত্তাবে'উ ইল্লা মা ইউহা'-বিশ্ব নিয়ন্তার নিকট থেকে আমার নিকট যে 'অহি' এসেছে একমাত্র তাই আমি মান্য করে চলি' (আন'আম ৫০)। উক্ত আয়াতে আল্লাহ্র পক্ষ থেকে আল্লাহ্র নবী পরিস্কার ঘোষণা করে দিয়েছেন যে, আমি গায়েব জানি না, আমি ফেরেশতাও নই, আর আল্লাহ্র গোপন ধন ভাণ্ডারও আমার নিকটে নেই।

প্রিয় পাঠক! সমুদয় বিশ্বের যাবতীয় প্রাণী জীব ও যাবতীয় বস্তুর বর্তমান, ভবিষ্যৎ ও অতীতের সর্বদা সঠিক জ্ঞানকে ইলমে গায়েব বলে এবং যে সত্তা এতো অসীম জ্ঞান রাখেন তাকেই বলা হয় عالم الغيب (আলেমুল গায়েব)। এরূপ জ্ঞান একমাত্র মহান আল্লাহ্র জন্য চির অবধারিত। আল-কুরআনের নির্দেশ অনুযায়ী কোন নবী, ওলী, জ্বিন, পীর, মাশায়েখও গায়েব জানেনা। এমতাবস্থায় যদি কেউ মনে করে যে, তারা গায়েব জানেন, তবে তাদেরকে আল্লাহ্র সমকক্ষ বানানো হ'ল। এই শ্রেণীর মানুষ চিরদিন প্রকাশ্যে কাফের এতে কোন সন্দেহ নেই। ফিক্বহ শাস্ত্র বিশারদ পণ্ডিতগণ সকলেই একমত হয়ে ফৎওয়া প্রদান করেছেন যে, যারা নবীগণকে গায়েব জানতেন বলে বিশ্বাস করবে, তারা প্রকাশ্য কাফের। যেমন শরহে ফিক্বহে আকবর গ্রন্থে বলা হয়েছে- 'হে বিশ্বাসী মানুষ! তোমরা জেনে রাখ যে, নবীগণ গায়েব জানতেন না। কিন্তু যে নবীকে স্বয়ং আল্লাহ যতটুকু জ্ঞান দান করেছেন তিনি কেবল ততটুকু জ্ঞান পেয়েছেন মাত্র। হানাফী মাযহাবের বড় বড় বিদ্বানগণ একমত হয়ে একথাই বলেছেন যে, যারা মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে ইলমে গায়েব জানেন বলে বিশ্বাস করবে তারা কাফের এতে কোন সন্দেহ নেই। কারণ তারা প্রকাশ্যে আল্লাহ্র কালামের সঙ্গে যুদ্ধ ঘোষণা করেছে। আল্লাহ বলেন যে, 'নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলে যেখানে যা কিছু আছে তার সমুদয় সম্যক জ্ঞান একমাত্র আল্লাহ ছাড়া আর কেউ জানে না'(নামাল ৬৫)।[১] আর এরা বিশ্বাস করে যে, আল্লাহ্র নবী ইলমে গায়েব জানতেন। এখানে ইহাই প্রমাণিত হ'ল যে, পূর্বেকার বড় বড় নবীগণ এবং আমাদের বিশ্বনবী (ছাঃ)ও ইলমে গায়েব জানতেন না।

হানাফী মাযহাবের বিখ্যাত গ্রন্থ ফৎওয়া কাযীখা-র চতুর্থ খণ্ডে একটি অধ্যায় এভাবে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে যে, باب ما يكون كفرا من المسلمين وما لا يكون 'মুসলমানেরা কোন্ কাজ করলে কাফের হবে আর কোন্ কাজ করলে কাফের হবে না'? এই অধ্যায়ে উল্লেখ আছে যে, 'জনৈক ব্যক্তি একটি মেয়েকে বিনা সাক্ষীতে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ করার সময় উভয়েই বলল, আমরা আল্লাহ ও আল্লাহ্র রাসূলকে এই বিবাহে সাক্ষী মান্য করে বিবাহ করলাম। এমতাবস্থায় ঐ দু'জন কি কাফের হবে? ইসলাম ধর্মের দৃষ্টিতে তারা দু'জনই এই জন্য কাফের হবে যে, তারা বিশ্বাস করে যে, আল্লাহ যেমন গায়েব জানেন অনুরূপ আল্লাহ্র নবীও গায়েব জানেন। অথচ তিনি জীবিত অবস্থায় গায়েব জানতেন না। এখন মৃত্যুর পর তিনি কেমন করে গায়েব জানবেন?[২] যেমন বিনা সাক্ষীতে বিবাহকারী আল্লাহ্র সাথে তাঁর রাসূলকে সাক্ষী করার দরুন কাফের হয়ে যায়, ঠিক তেমনি যদি কোন ব্যক্তি ফেরেশতা অথবা অনুপস্থিত কোন জীবিত বা মৃত পীরকে সাক্ষী রেখে বিবাহ করে বা কোন কাজ করে তবে সেও কাফের হয়ে যাবে (ফৎওয়া কাযীখা)।

১৯৬৫ সালে একটি মাদরাসার বাৎসরিক বিরাট সভায় বিখ্যাত কয়েকজন বক্তার আগমনের কথা। ট্রেন যোগাযোগ ঐদিন চার ঘন্টা বন্ধ থাকায় ১০/১২ হাযার শ্রোতা বিচলিত

১. *শরহে ফিকহে আকবর পৃঃ ১৮৫।*
২. *ফাতওয়া কাযীখা ৪র্থ খণ্ড।*

ও মর্মাহত হয়ে পড়ে। সভামঞ্চে আমি নতুন অপরিচিত লোক। জনৈক বন্ধু কমিটির সঙ্গে আমার পরিচয় করিয়ে দিলে তারা সন্তুষ্টচিত্তে আমাকে ২০ মিনিটের জন্য কিছু বক্তব্য রাখার অনুমতি দিলেন। আমি মঞ্চে যাওয়ার পূর্বে সভা পরিচালক মণ্ডলীর মধ্যে জনৈক মাওলানা ছাহেব বিক্ষিপ্ত ও বিচলিত জনতাকে নিয়ন্ত্রণে আনার জন্য দ্রুত গতিতে একখানা উন্নতমানের কেদারায় ভাল গদী ও মখমলের চাদর বিছায়ে গুরুগম্ভির সুরে বলতে লাগলেন যে, 'অদ্যকার সভার সভাপতিত্ব করবেন আল্লাহ্র নবী হযরত মুহাম্মাদ (ছাঃ)'। এই বলে কেদারাখানা খালি রেখে দিলেন আর বললেন যে, 'বিরাট একজন আলেম মাওলানা নাদভী ছাহেব আপনাদের সামনে ওয়ায ফরমাবেন'। আমি মঞ্চে দাঁড়িয়ে কুরআন মজীদের একটি আয়াত পাঠ করার পর বিরাট ভূমিকা আরম্ভ করে ২০ মিনিটের স্থলে এক ঘণ্টা বক্তৃতা করলাম। দীর্ঘ এক ঘণ্টা বক্তৃতা করার পর তিনি বললেন, এখন আপনি বক্তব্য শেষ করুন! আমি এই তো শেষ করছি বলে দ্রুতগতিতে আরও এক ঘণ্টা বক্তৃতা করতে থাকলাম। তবুও আমার কথার জের শেষ হচ্ছে না দেখে, মাওলানা ছাহেব আবার বললেন, আপনি বক্তৃতা শেষ করুন! আমি তখন বিরক্তির ভাব প্রকাশ করতঃ ক্রোধ স্বরে ধমক দিয়ে বললাম যে, আপনি এতবড় বে-আদব? সভাপতি আল্লাহ্র নবী এখানে স্বয়ং বসে আছেন। তিনি আমার বক্তৃতা আগ্রহ সহকারে শ্রবণে ব্যস্ত আছেন। তিনি কোন কথা বলছেন না, আর আপনি বারবার হুযূরের উপর হুকুম চালিয়ে বে-আদবী করছেন? এই বলে দ্রুতগতিতে আমি আমার ভাষণ দিতেই থাকলাম, আর মূল্যবান কথার অবতারণা করে জনগণের মনতুষ্ট সাধন করতঃ তিন ঘন্টা বক্তৃতা করে তওবা তওবা হাযারবার তওবা পাঠ করে মঞ্চ থেকে নেমে এলাম।

প্রিয় পাঠক! যারা সৃষ্টি আর স্রষ্টা অর্থাৎ আল্লাহ এবং আল্লাহ্র রাসূলকে সমান আসনে বসাতে চান তারা কি এখনও মুসলমান আছে বলে প্রমাণ করতে চান? যারা আল্লাহ্র নবীকে হাযের-নাযের, সর্বস্থানে উপস্থিত মনে করে সভাপতির আসন দান করেন, তারা কি এখনও মুসলমান আছেন? মীলাদখানী মৌলভীগণ যারা মীলাদ পাঠ করে আল্লাহ্র নবী এখানে হাযির হয়ে গেছেন মনে করে তাঁর উপস্থিতির জন্য ক্বিয়াম করেন তারা কি এখনও মুসলমান আছেন? এই শ্রেণীর ধ্যান-ধারণা ও আক্বীদা পোষণকারী প্রকাশ্য রূপে, রঙ্গে, চাল-চলনে, লেবাস-পোষাকে, ছালাত ছিয়াম, হজ্ব, যাকাত প্রদানকারী কেতাদূরস্ত মুসলমান। এরা আল্লাহ্র একত্ববাদের সঙ্গে আল্লাহ্র নবীকেও শরীক করেছে। আর তাওহীদকে ধ্বংস করে দ্বিত্ববাদের দ্বার খুলেছে। এরা যে আর মুসলমান নেই এতে সন্দেহ কোথায়? আল্লাহ্র নবীর জ্ঞান-গরীমা ও মর্যাদা সর্বজন বিদিত। তিনি সৃষ্টির সেরা তাই বলে আমরা তাঁকে সৃষ্টি জীবনের আসন থেকে উন্নত করে স্রষ্টার আসনে সমাসীন করতে পারি না।

যুগে যুগে লক্ষ্যহারা পথভ্রষ্ট বখাটে লোকেরা আল্লাহ্র নবীকে গায়েব জানতেন বলে মনে করবে এবং বিশ্বনবীকে আল্লাহ্র আসনে বসাবে, এ জন্য আল্লাহ কুরআন মজীদে আয়াত নাযিল وَلَوْ كُنْتُ اَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوْءُ

আপনি বলুন, যদি আমি গায়েব জানতাম তাহ'লে আমার জীবনে বহুবিধ কল্যাণ ও মঙ্গল সঞ্চয় করে সমস্ত জীবন সুখ-স্বাচ্ছন্দে, আরাম-আয়েশে, ভোগ বিলাসে অতিবাহিত করতে পারতাম। আর কস্মিনকালেও আমাকে কোন অমঙ্গল, কষ্টদায়ক কোন বিপদ স্পর্শ করতে পারত না'(আ'রাফ ১৮৮)। কিন্তু আমি গায়েব জানি না বলেই আমার জীবনে এতো কষ্ট। আল্লাহ্র নবী ইলমে গায়েব জানলে সর্বপ্রথম হযরত জিবরীল (আঃ) কে আকাশে ভাসমান অবস্থায় দেখে ভয় পেতেন না। দিনে দুপুরে কম্বল গায়ে দিতেন না। বিবি খাদীজার নিকট 'আমার জীবনের ভয় হচ্ছে' বলে সংকটাপন্ন অবস্থার বর্ণনা দিতেন না। তিনি গায়েব জানলে ওয়ারাক্বা বিন নওফলের নিকট পরামর্শ গ্রহণ করতেন না। ওয়ারাক্বা অবস্থার গতিবিধি লক্ষ্য করে বলেছিল যে, 'যখন তোমার গ্রামবাসী তোমাকে বের করে দিবে'। তিনি আতংকিত হয়ে বলেছিলেন যে, 'আমার গ্রামবাসী আমাকে বের করে দিবে'? একথা তিনি বলতেন না। যারা হযরতকে সর্বস্থানে উপস্থিত জানে, তারা 'ইয়া আল্লাহ' এর সাথে 'ইয়া মুহাম্মাদ' বা 'ইয়া রাসূলাল্লাহ' বলে সমভাবে আহ্বান করে থাকে। আরবী ভাষায় 'ইয়া' শব্দটি জীবিত ব্যক্তিকে সম্বোধন করার জন্য ব্যবহৃত হয়। এভাবে আহ্বান করার অর্থ এই যে, সে শুনতে পাচ্ছে। যেহেতু আমরা সকলে আল্লাহ্র গোচরে আছি সেহেতু তাঁকে ইয়া আল্লাহ বলে সম্বোধন করা হয়। কিন্তু হযরত মুহাম্মাদ (ছাঃ) স্বীয় প্রজ্ঞা দ্বারা সদা সর্বস্থানে উপস্থিত নন। এই কারণে 'ইয়া মুহাম্মাদ' অথবা 'ইয়া রাসূলাল্লাহ' এইরূপ আর কোন আহ্বান সূচক শব্দ ব্যবহার করে বিশ্ব নবীকে ডাকা চিরতরে নিষিদ্ধ সাব্যস্ত হয়েছে। 'ইয়া আল্লাহ'র সঙ্গে 'ইয়া মুহাম্মাদ' বলে আহ্বান করলে আল্লাহ আর মুহাম্মাদের মধ্যে কোন পার্থক্য থাকে না। আমাদের দেশের অনেক মসজিদে দেখা যায়, এক পার্শ্বে 'ইয়া আল্লাহ', অন্য পার্শ্বে 'ইয়া মুহাম্মাদ' কাগজে লিখে ঝুলানো আছে। তাহ'লে কি আল্লাহ ও মুহাম্মাদ সমান?

প্রিয় পাঠক! আপনি যদি মুসলমান হয়ে বেঁচে থাকতে চান তবে আপনার ঈমানকে একবার জিজ্ঞেস করুন যে, 'ইয়া আল্লাহ' বললে যেমন মহান আল্লাহ সব কিছু জানতে এবং শুনতে পান তেমনি কি 'ইয়া মুহাম্মাদ' অথবা 'ইয়া রাসূলাল্লাহ' বললে আল্লাহ্র নবী সবকিছু শুনতে পান কি? আপনার ঈমান কি জবাব দেয়? আল-কুরআনের আয়াত প্রমাণ করে যে, তিনি কোন কিছুই অবগত হ'তে পারেন না। এমতাবস্থায় 'ইয়া মুহাম্মাদ', 'ইয়া নবী' বলে আপনি কেন পরকাল নষ্ট করছেন? মহান আল্লাহ্র পক্ষ হ'তে যে কথার ও কাজের বিন্দুমাত্র কোন প্রমাণ নাই, সে কথা ও

কাজ আপনি কেন করবেন? সে কাজ একজন মুসলমান কেমন করে করবে? কুরআন-হাদীছের বাইরে কোন কাজ করলে যে আপনি আর মুসলমান থাকছেন না তা কি আপনি অবগত নন?

আল্লাহ্‌র নবী (ছাঃ) যখন আল্লাহ্‌র মনোনীত রাসূল রূপে নিজেকে জনসম্মুখে পেশ করলেন, তখন মক্কার দুর্ধর্ষ কাফেরগোষ্ঠী অহেতুক ও অবান্তর প্রশ্ন উত্থাপন করে আল্লাহ্‌র নবীর বদনমণ্ডকে মলিন করার অপচেষ্টা করেছিল। আর প্রকাশ্যে তারা বলাবলি করতে আরম্ভ করল যে, এ রাসূল আবার কেমন রাসূল? যার সন্তান-সন্ততি, বংশ-পরিবার আছে এবং সে হাটে-বাজারে চলাফেরা করে এবং আমাদের মত পানাহার করে। সাধারণ মানুষের মত জীবন যাপন করে। এমতাবস্থায় এ লোক কেমন করে রাসূল হবে? আর আমরা কেমন করে তাঁকে বিশ্বাস করব যে, আল্লাহ তাঁকে রাসূল করে পাঠিয়েছেন? যদি আল্লাহ তাঁকে রাসূলই বানাতেন তাহ'লে তাঁর আর্দালী হিসাবে দু'একজন ফেরেশতাকে নিশ্চয়ই পাঠাতেন। আর সে আর্দালী দেশের একপ্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত প্রচার করে বেড়াত যে, ইনি হচ্ছেন আল্লাহ্‌র রাসূল। এত কথা শ্রবণের পর তাঁর সঙ্গে অথবা রাসূলের সঙ্গে কেউ বে-আদবী করলে তার উপরে সে ফেরেশতা আযাবের চাবুক মারত। আল্লাহ যাকে রাসূল বানাবেন আর তাঁকে মক্কার হাটে-বাজারে, অলি-গলিতে একাকীই ছেড়ে দিবেন এবং তিনি সর্বপ্রকার অত্যাচার আর যুলুম নিরবে সহ্য করবেন আর অর্ধাহারে-অনাহারে অসহায় অবস্থায় কালাতিপাত করবেন, ইহা কিভাবে সম্ভব হ'তে পারে? আল্লাহ যাকে রাসূল বানাবেন অন্ততঃ তাঁর জন্য একটি জাকজমকপূর্ণ রাজপ্রাসাদ ও রকমারী ফলমূলের শ্যামল শোভামণ্ডিত একটি বাগিচা বানিয়ে দিতেন। তাহ'লে রাসূলের ধন-সম্পদ শেষ হয়ে গেলে তার স্ত্রী-পুত্রকে মাসের পর মাস অনশনের সম্মুখীন হ'তে হ'ত না এবং দেশ বিদেশে যাওয়ার জন্য একটা যানবাহনেরও অভাব হ'ত না।

মক্কার এই জীবন্ত দস্যুস্বভাব কাফেরগোষ্ঠী বিশ্বনবীর বদনমণ্ডকে মলিন করার জন্য অলৌকিক নিত্য নতুন মু'জিযা দেখাবার জন্য নানাভাবে জটিল প্রশ্ন করত। অজানা অদৃশ্য বিষয়াদি সম্পর্কে সবসময় জিজ্ঞাসাবাদ করত। কাফের গোষ্ঠীর হটুক্তি এটাও ছিল যে, আল্লাহ যাকে নবী করে পাঠাবেন নিশ্চয়ই তিনি অলৌকিক ও অসাধারণ ক্ষমতার অধিকারী হবেন। তাঁর সামান্য ইংগিতেই পাহাড়-পর্বতগুলি টলটলায়মান দেখা দিবে, ধুলি ধুসরতি বালুকাময় মরুপ্রান্তর চোখের পলকেই প্রাচুর্যে ভরা শস্য শ্যামল ক্ষেত্রে পরিণত হবে। অদৃশ্যের অন্তরালে যা কিছু লুক্কায়িত আছে তা তাঁর নিকট সবসময় প্রতিভাত হবে। মহান আল্লাহ এদের জবাবে এই আয়াত নাযিল করলেন যে, قُلْ مَا كُنْتُ بِدْعًا مِّنَ الرُّسُلِ وَمَا أَدْرِي مَا يُفْعَلُ بِي وَلَا بِكُمْ -

'আপনি বলুন, আমি তো কোন নতুন রাসূল নই। আমি জানিনা আমার ও তোমাদের সাথে কি ব্যবহার করা হবে' (আহক্বাফ ৯)।

প্রিয় পাঠক! আল্লাহ্‌র নবী ইলমে গায়েব জানতেন না, তার প্রমাণ পেশ করতে গেলে অনেক পৃষ্ঠা দরকার হবে। কুরআন মজীদের প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত অসংখ্য আয়াত ঐ একই কথা প্রমাণ করে যে, এক আল্লাহ ছাড়া আর কারও নিকট ইলমে গায়েব নেই। এখন আসুন বড় বড় ছাহাবায়ে কেরাম যেমন হযরত আবুবকর ছিদ্দীক্ব, উমর, উছমান, আলী, ত্বালহা, যোবায়ের, হাসান-হুসাইন, বিবি ফাতেমা প্রমুখ ইলমে গায়েব জানতেন? রাসূলের নাতী হাসান বিষ পানে শহীদ হবেন আর হুসাইন কারবালার ময়দানের শহীদ হবেন এটা কি তাঁরা জানতেন? হযরত আলীর শাহাদাত কিভাবে হবে? হযরত উছমান (রাঃ) কি অবগত ছিলেন যে, মুসলমানদের হাতে বদ্ধ ঘরে আমাকে শাহাদত বরণ করতে হবে? হযরত উমর ছালাতের কাতার করার পর আল্লাহু আকবার বলে জামা'আতে ছালাত আরম্ভ করেছেন, সে ছালাত অবস্থায় আবু লুলু তাঁকে হত্যা করবে তা কি তিনি অবগত ছিলেন? হযরত আদম (আঃ) হ'তে আরম্ভ করে বিশ্বনবী (ছাঃ) পর্যন্ত নবী রাসূল এসেছিলেন তাঁরা কেউ ইলমে গায়েব জানতেন না। এমতাবস্থায় আপনার পীর-মুর্শিদ গায়েব জানেন বলে তার পদধুলি নিয়ে বক্ষে ও চক্ষে মলন দেওয়া, গওস-কুতুব-আব্দালদের নামে খতমে জালালী, খতমে কামালী, খতমে খাজেগাঞ্জ, ছালাতে আলফিয়া, মৃত্যুবার্ষিকী উদযাপন করে ইছালে ছওয়াবের নাম করে আর কতদিন এ কুফরী ব্যবসা পরিচালনা করবেন? অতএব তওবা পড়ুন! লক্ষ কোটি বার তওবা আস্তাগফিরুল্লাহ। আল্লাহ! তুমি মুসলমানদেরকে সঠিক পথে পরিচালিত কর। আমীন!!

কম্পিউটারে গৃহ নকশা

রাজশাহী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের অনুমোদিত এবং বাস্তব অভিজ্ঞতা সম্পন্ন প্রতিষ্ঠান হিসাবে রাজশাহী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের আওতাভুক্ত এলাকার মধ্যে এই প্রথম কম্পিউটারের মাধ্যমে আধুনিক প্রযুক্তিতে অথচ স্বল্প ব্যয়ে আকর্ষণীয় বসত বাড়ী, বাণিজ্যিক মার্কেট, কমপ্লেক্স ইত্যাদির প্লান, ডিজাইন, ইস্টিমেট ও সুপারভিশন সহ যাবতীয় কাজ বিশ্বস্ততার সহিত অল্প সময়ে সম্পন্ন করা হয়।

গৃহ নকশা
বিলসিমলা, গ্রেটার রোড,
রাজশাহী
(বর্ণালী সিগনালের পশ্চিমে)
ফোনঃ ৭৬০৫৪৭

গৃহ নকশা
মাহমুদা শান্তি মনজিল
১৫৫/এ, জিন্নাহ নগর
সপুরা, রাজশাহী।
ফোনঃ ৭৬০৫৪৭

পর্দা কি শুধু নারীদের জন্য?

*-যহুরুল বিন ওছমান**

যেখানেই ওয়ায-নছীহত শুনি, আর যতই ইসলামী পত্র-পত্রিকা পাঠ করি না কেন পর্দা সম্পর্কে চারিদিকে একই বক্তব্য যে, নারী জাতির পর্দা উচ্ছন্নে গেল। অবশ্য দেশের বর্তমান অবস্থাও তাই। তবে এ অবস্থার জন্য দায়ী কে? শুধু কি এককভাবে নারী? নাকি পুরুষগণও?

আল্লাহপাক পুরুষ জাতিকে লক্ষ্য করে বলেন, 'পুরুষগণ নারীদের উপর কর্তৃত্ব করবে' (নিসা ৩৪)। কিন্তু বর্তমান সমাজের পুরুষগণ কি আল্লাহ্র উক্ত নির্দেশের প্রতি সজাগ দৃষ্টি রাখতে সক্ষম হয়েছেন? যদি পুরুষগণ সচেতন হ'তেন তবে কি জাতির এতটা অধঃপতন হ'ত? এ প্রসঙ্গে আমরা বলব, মুসলিম সমাজের পুরুষদেরই পর্দা নেই। এতক্ষণে হয়ত অনেক পাঠক প্রশ্ন করে বসেছেন, এটা আবার কেমন কথা? পুরুষের আবার পর্দা কিসের? নারীদের মত পুরুষদেরও বোরকা পরতে হবে নাকি?

পুরুষের বোরকা পরিধানের প্রয়োজনীয়তা নেই সত্য, তবে চোখের পর্দা থেকে রেহাই পাওয়ারও কোন উপায় নেই। যারা ঈমানদার পুরুষ তাদের জন্য আল্লাহপাকের নির্দেশ শুনুন 'হে নবী! আপনি মুমিন পুরুষদেরকে বলে দিন তারা যেন নিজেদের দৃষ্টিকে অবনমিত রাখে' (নূর ৩০)।

জান্নাতের সুসংবাদ প্রাপ্ত ছাহাবী রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর জামাতা ইসলামের চতুর্থ খলীফা হযরত আলী (রাঃ)-এর প্রতি রাসূল (ছাঃ)-এর নির্দেশ ছিল- 'হে আলী! একবার দেখার পর পুনরায় তাকাবে না। কারণ, প্রথমবারের দেখা তোমার জন্যে ক্ষমা হয়ে যাবে, কিন্তু দ্বিতীয়বার দেখলে তোমার জন্য ক্ষমা হবে না'।[১] উপরোক্ত আয়াত ও হাদীছ থেকে প্রমাণিত হয় যে, পর্দা পুরুষদের জন্যও ফরয। তবে নারীদের মত চোখ-মুখ ও সমস্ত শরীর আবৃত করে নয়।

অপরদিকে নারীদের পর্দার ব্যবস্থা পুরুষরাই করবে। যে সমাজে পুরুষের পর্দা ঠিক আছে সে সমাজে নারীদের অধঃপতন হ'তে পারে না। এ জন্য আমি পেটের রোগে চোখের চিকিৎসা করতে চাই। যেমন কোন এক অভিজ্ঞ ডাক্তারের নিকট পেটের অসুখের জন্য এসে জনৈক ব্যক্তি বলল, ডাক্তার ছাহেব আমার এই ছেলেটা দীর্ঘদিন যাবৎ পেটের রোগে ভুগছে। কিন্তু কিছুতেই ভাল হচ্ছে না। ডাক্তার ছাহেব রোগীকে ভাল করে দেখেশুনে বললেন, আপনার ছেলের চোখের চিকিৎসা করলেই পেটের রোগ ভাল হয়ে যাবে। রোগীর অভিভাবক তখন রেগে বললেন, আপনি কেমন ডাক্তার হে? রোগ হয়েছে পেটে আর চিকিৎসা করতে বলছেন চোখের? এবার ডাক্তার ছাহেব সুন্দরভাবে বুঝিয়ে বললেন, আপনার আদরের সন্তান যখন যা কিছু খেতে চায় তাই খেতে দেন, তাই না? জওয়াবে অভিভাবক বললেন, হ্যাঁ। কি আর করব বলুন! একটাই ছেলে তো তাই? ডাক্তার ছাহেব মিষ্টি হেসে বললেন, আমি এজন্যই চোখের চিকিৎসা আগে করতে বলেছি। কারণ, চোখের রোগ ভাল হ'লে পেট আপনাআপনি ভাল হয়ে যাবে।

সম্মানিত পাঠক! ভেবে দেখুন! আল্লাহ্র বাণী 'পুরুষগণ নারীদের উপর কর্তৃত্বশীল' -এর কতটুকু বাস্তব প্রয়োগ আমাদের মাধ্যমে হয়েছে? আমরা কি নারীদের ইসলামী ছাঁচে গড়ে তুলতে সক্ষম হয়েছি। নাকি গভীর রজনীতে পুরুষদের সাথে সম্মিলিত ভাবে রাজপথে 'মিলেনিয়াম' উদযাপনে উৎসাহ দিয়েছি। দুর্ভাগ্য, রাজপথ আজ মেয়েদের দখলে। মিছিলের অগ্রভাগে নারী। সন্ত্রাসী কার্যক্রমেও নারী। তবে পুরুষদের কর্তৃত্ব কোথায় থাকল? সঙ্গত কারণেই বলা, পেটের অসুখে চোখের চিকিৎসা করতে হবে।

আমরা যারা ইসলাম সম্পর্কে অজ্ঞ এবং যারা বুঝেও না বুঝার ভান করি, তারা কিন্তু নারীদেরকে দোষারোপ করে বলি, 'দাইয়ূস'। আসলে প্রকৃত ব্যাপার তা নয়। 'দাইয়ূস' শব্দটা রাসূল (ছাঃ) পুংলিঙ্গে ব্যবহার করেছেন। সত্যিকার অর্থে দাইয়ূস ঐসব পুরুষ, যারা তাদের অধীনস্থ নারীদের পর্দায় রাখে না। এসম্পর্কে ইবনে ওমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'তিন প্রকার লোকের জন্য জান্নাত হারাম, তাদের মধ্যে এক প্রকার লোক হচ্ছে, যারা তাদের পরিবার পরিজনদের মাঝে অপবিত্রতা স্থাপন করে' (অর্থাৎ পর্দার ব্যবস্থা করে না)।[২]

অতএব পুরুষ ভাইগণ আসুন! সময় থাকতে নিজে এবং নিজের পরিবার পরিজনকে জাহান্নামের আগুন থেকে রক্ষা করার চেষ্টা করি। অনেক পাঠক আছেন, যারা আমাকে নারী পক্ষপাতি ধারণা করতে পারেন। যেহেতু আমি পুরুষ, তাই পুরুষের পক্ষে সাফাই গাওয়া উচিৎ ছিল। তবে শুনুন! বিশ্ববিখ্যাত ইমাম ইমাম বুখারী (রহঃ) কি বলেন? তিনি বলেছেন, 'চোখের খিয়ানত হ'ল এমন জিনিষের দিকে তাকানো যে দিকে তাকাতে নিষেধ করা হয়েছে'।[৩]

ইমাম যুহরী বলেছেন, 'ঋতুবতী হয়নি এমন নাবালিকা মেয়েদের দিকে তাকানো ঠিক নয়, যাদের দেখলে শুধু দেখারই লালসা হয়। চাই ওরা অপ্রাপ্তা বয়স্কা হৌক'।[৪]

---

* *শিক্ষক, আউলিয়া পুকুর সিনিয়র ফাযিল মাদরাসা, চিরিরবন্দর, দিনাজপুর।*

১. *আবুদাঊদ ১ম খণ্ড 'কিতাবুননিকাহ' ২৯২ পৃঃ; তিরমিযী ২য় খণ্ড ১০১ পৃঃ (দিল্লীঃ রাশেদিয়াহ প্রেস)।*

২. *নাসাঈ, আহমাদ, মিশকাত ২য় খণ্ড ৩১৮ পৃঃ (দিল্লীঃ রাশেদিয়াহ প্রেস)।*

৩. *বুখারী, ২য় খণ্ড 'কিতাবুল ইস্তেযান' ৯২০ পৃঃ (দিল্লীঃ রাশেদিয়াহ প্রেস)।*

৪. *বুখারী, ২য় খণ্ড ৯২০ পৃঃ (দিল্লীঃ রাশেদিয়াহ প্রেস)।*

উপরের বর্ণনাগুলো প্রমাণ করে যে, পর্দা শুধু নারীদের জন্য নয়। পুরুষদের জন্যও। যেসব বাড়ীতে মহিলাদের পর্দার ব্যবস্থা আছে, সেসব বাড়ীতে পুরুষদের পর্দা না থাকলে মহিলাদের পর্দা রক্ষা করা সম্ভব নয়। আল্লাহ বলেন, 'যখন তোমরা ঘরসমূহে প্রবেশ করবে, তখন নিজেদের লোকজনকে সালাম করবে। কারণ, কল্যাণের দো'আ আল্লাহ্র নিকট থেকে নির্দিষ্ট করা হয়েছে' (নূর ৬১)।

এখানে যদিও শুধু সালামের কথা বলা হয়েছে কিন্তু বাস্তবে বাড়ির দরজায় সালাম করার অর্থই হচ্ছে গৃহে যেসব পর্দানশীন নারীরা থাকবে তারা বাহিরে আগত ব্যক্তির সালাম শুনে দ্রুত পর্দা করবে। যদি সে 'গায়রে মুহরেম' হয়। তাছাড়া একই বাড়িতে স্ত্রী-কন্যা, মা-খালা, দাদী-নানী, ভাতিজি-ভগ্নি প্রমুখ থাকতে পারে, তাই বলে কি পর্দা করতে হবে না? সালাম না দিয়ে যদি হুট্ করে বাড়ীতে প্রবেশ করা হয় তাহ'লে পর্দানশীন মহিলা কি করে পর্দা ঠিক রাখবে?

এছাড়া নিজের গৃহ ব্যতীত অন্যের গৃহে প্রবেশকালে সালাম ও অনুমতি ছাড়া প্রবেশের কোন সুযোগ ইসলামে নেই। আল্লাহ বলেন, 'হে ঈমানদারগণ! তোমরা নিজেদের ঘর ছাড়া অন্যদের ঘরে প্রবেশ করনা যতক্ষণ না ঘরের লোকদের অনুমতি পাবে এবং তাদের প্রতি সালাম পাঠাবে। এ নিয়ম তোমাদের জন্য কল্যাণকর' (নূর ২৭)।

সম্মানিত পাঠক! একবার মুসলিম সমাজের দিকে তাকিয়ে দেখুন? আমরা ক'জন উক্ত আয়াতের নির্দেশ পালন করে চলছি? আমরা কি পৃথিবীতে পশু পাখি হিসাবে জন্মগ্রহণ করেছি যে, আমাদের কোন বিধি বিধান নেই? তাহ'লে কি করে আমাদের পর্দা রক্ষা হবে? সারাজীবন শুধু নারীদের পর্দার কথা বলে গেলাম আর শাসন করলাম কিন্তু নারীর আগে যে পুরুষদের পর্দার প্রয়োজন আছে তা কি কখনো চিন্তা করেছি?

হায়রে মুসলিম সমাজ! 'ধান ভাংতে শীবের গীত গায়'। আর কথায় কথায় বলি, পর্দা গেল। নারীরা সমাজটাকে উচ্ছন্নে দিল। যত দোষ ঐ নন্দ ঘোষ। নারীরাই যদি সব নষ্ট করল, তাহ'লে পুরুষদের বেঁচে থেকে লাভ কি? এদেশের মেয়েরা যারা পর্দা হারাল তারা কারা? তারাতো আপনার আমার সকলেরই মা, বোন, ভাগ্নি। এক্ষণে চিন্তা করুন 'দাইয়ূস' কারা? আর জাহান্নাম কাদের জন্য বরাদ্দ হবে? টেলিভিশন চলচ্চিত্র কি মুসলমানদের ঘরে ঘরে নেই? সেখানে কি নারী পুরুষের পর্দার আইন লংঘন হচ্ছে না? এজন্য দায়ী কারা? আমি বলব, পুরুষরাই দায়ী।

এ দেশে এমন কিছু ইসলামী দল আছে, যাদের কেউ 'সুবহা-ন্নাল্লা-হ' আর 'আল-হামদুলিল্লা-হ' পাঠ করে লক্ষ কোটি ছওয়াব অর্জন করে জান্নাতে যেতে চায়। কিন্তু পর্দার মত গুরুত্বপূর্ণ একটি ফরয লংঘন করতে তাদের বাধে না। আবার কিছু লোক আছে যারা মুখে বলে, 'ইসলামের আলো ঘরে ঘরে জ্বালো' কিন্তু তাদের নিজেদের ও নিজেদের পরিবারের মাঝে আলোর চিহ্নটি পর্যন্ত খুঁজে পাওয়া যায় না। তারা কি করে ইসলামী আন্দোলনের ধারকও বাহক হ'তে পারে? আবার আর এক শ্রেণীর দাদা হুযূর ও কিবলা হুযূর আছেন, যারা অন্যকে জান্নাতে নিয়ে যাওয়ার নিশ্চয়তা দিয়ে পর্দার ভিতরে ঢুকে নারীদের সেবা পাওয়ার আশা করে থাকেন। জানিনা তখন তাদের চোখের পর্দা ও মনের পর্দা কোথায় লুকায়। এমনি অসংখ্য দল ইসলামের ডালি সাজিয়ে কুরআন ও ছহীহ হাদীছের প্রকৃত পর্দা প্রথা পদদলিত করে মানুষকে অন্ধকারের দিকে নিয়ে যাচ্ছে। আল্লাহ আমাদের সবাইকে কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে পর্দা করার তওফীক দিন।- আমীন!!

HOTEL MUKTA

INTERNATIONAL
[Residential]

(A trusted home with a family touch)

Ganakpara, Shaheb Bazar
(in front of T &T) Rajshahi-6100
Phone: 880-721-771100, 771200

আর্সেনিক দূষণঃ কারণ, প্রতিকার ও প্রতিরোধ

*-এ.এস.এম. আযীযুল্লাহ**

পানির অপর নাম জীবন। পানি ব্যতীত জীবকুলের জীবনধারণ অসম্ভব। পৃথিবীর ৪ ভাগের ৩ ভাগ পানি। এমন একটা সময় ছিল যখন পানিবাহিত রোগ যেমন- ডায়রিয়া, কলেরা ইত্যাদি। মহামারী আকার ধারণ করেছিল। এ সকল রোগের জীবাণু বেশী থাকে খাল, বিল বা পুকুরের মত খোলা পানিতে। সে কারণে ঐ সকল জীবাণুর হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য মানুষ মাটির নিচ থেকে বিশুদ্ধ পানি উঠিয়ে পান করা শুরু করে। সাথে সাথে খাল, বিল, পুকুর, ডোবা ইত্যাদির খোলা ও দূষিত পানি পান করা থেকে সম্পূর্ণ বিরত থাকে। ছোট বেলায় পড়েছি- "Drink tubewell water, Do not drink pond water" ইত্যাদি। কিন্তু আজ সেই টিউবওয়েল বা ভূ-গর্ভস্থ পানি পান করাও আমাদের জন্য নিরাপদ নয়। বর্তমানে বিশেষ করে বাংলাদেশের প্রায় সকল যেলাতেই নলকূপের পানিতে মাত্রাতিরিক্ত আর্সেনিক নামক এক প্রকার বিষাক্ত পদার্থের উপস্থিতি লক্ষ্য করা যাচ্ছে, যা মানব দেহে প্রবেশ করলে খুবই ক্ষতি সাধণ করে। এ কারণে সচেতন মানুষ সহজে যে কোন টিউবওয়েলের পানি পান করতে চাচ্ছে না।

কিছুদিন আগেও আর্সেনিক কি? এর দূষণ কিভাবে হয়? এসব কিছুই সাধারণ মানুষ জানত না। কিন্তু ইদানিং আর্সেনিক দূষণ নিয়ে মানুষের মধ্যে এক ধরনের আতঙ্ক বিরাজ করছে। তারা এখন যেকোন টিউবওয়েলের পানি পান করতে ভয় পাচ্ছে। নিজ ব্যবহৃত নলকূপের পানিতে আর্সেনিক আছে কি-না তা পরীক্ষা করে দেখছে।

বাংলাদেশ ছোট্ট একটি দেশ। যার প্রায় ৬০ শতাংশ মানুষ অশিক্ষিত এবং অর্ধশিক্ষিত। এদেশের অধিবাসীদের মনে আর্সেনিক আতঙ্ক কাজ করলেও আর্সেনিক কি? কিভাবে এর দূষণ ঘটে? কত মাত্রায় তা মানব দেহের জন্য ক্ষতিকর? এর বর্ণ, গন্ধ বা স্বাদ কেমন? বেশির ভাগ লোক তা জানে না। নিম্নে সে সম্পর্কে সংক্ষেপে কিছু আলোচনা করা হ'ল-

আর্সেনিক কি? বিজ্ঞানীরা এ পর্যন্ত ১০৯টি মৌলিক পদার্থ আবিষ্কার করতে সক্ষম হয়েছেন। তার মধ্যে আর্সেনিক একটি। যার প্রতীক As পারমাণবিক সংখ্যা ৩৩; পারমাণবিক ভর ৭৪.৯২ এবং পর্যায় সারণীতে এর স্থান ৫ম গ্রুপে। বাংলায় একে 'সেঁকো বিষ' বলে। মোটকথা আর্সেনিক (As) একটা অত্যন্ত বিষাক্ত মৌলিক পদার্থ।

আর্সেনিকের ধর্মঃ আর্সেনিক একটা ত্রিযোজী মৌলিক পদার্থ। ইহা কখনো ধাতু আবার কখনো অধাতুর মত আচরণ করে। এ কারণে একে বোরন (Br), সিলিকণের (Si) মত উপধাতু বলা হয়। রাসায়নিক বিক্রিয়ায় আর্সেনিক খুবই সক্রিয় এবং সহজে অন্য পদার্থের সঙ্গে বন্ধনী তৈরী করতে পারে। পৃথিবীতে আর্সেনিক যৌগ আছে প্রায় ১৫০টি। তিনটি খনিজ এর প্রধান আকর। (১) আর্সেনিক সালফাইড (AsS), (২) আর্সেনিক ট্রাই সালফাইড (As_2S_3) এবং (৩) আর্সেনো পাইরাইড (FeAs)। প্রত্যেকের ভৌত ধর্মের পার্থক্য থাকলেও এদের একটা সাধারণ বৈশিষ্ট্য হ'ল সবগুলোরই রসুনের গন্ধের মত, একটা গন্ধ পাওয়া যায়। তবে পানিতে দ্রবীভূত অবস্থায় এর কোন গন্ধ থাকে না।

আর্সেনিকের সহনীয় মাত্রাঃ মাটি, পানি, বায়ু সর্বত্র কম-বেশী আর্সেনিক আছে। বিশেষ করে পানিতে কিছু না কিছু পরিমাণ আর্সেনিক সবসময় থাকে। সরকারী হিসাব মতে প্রতি লিটার পানিতে ১০ P.P.B. (পার্টস পার বিলিয়ন) অর্থাৎ ১০ কোটি ভাগের ১ ভাগ আর্সেনিক থাকে, যা স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর নয়। অবশ্য বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থা (W.H.O) এও বলেছে যে, যদি প্রতি লিটার পানিতে ৫০ P.P.B. অর্থাৎ ১০ কোটি ভাগের ৫ ভাগ আর্সেনিক থাকে, তবে তাতেও স্বাস্থ্যের কোন ক্ষতি হবে না। কিন্তু এর চেয়ে বেশী থাকলে অবশ্যই স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর। কারণ, আর্সেনিক একটা বিষাক্ত মৌল। যা অতিমাত্রায় মানবদেহে প্রবেশ করলে তার মৃত্যু অবধারিত। এর মরণ মাত্রা (Fataldose) ১২৫ mg. আর্সেনিক অর্থাৎ পারদের তুলনায় চার গুণ বেশী শক্তিশালী। ১৩০ mg. আর্সেনিক গ্রহণের ১২ থেকে ৪৮ ঘন্টার মধ্যে মানুষের মৃত্যু ঘটে। পরীক্ষা করে দেখা গেছে, বাংলাদেশের কোন কোন অঞ্চলের পানিতে স্বাভাবিকের তুলনায় ১০০ থেকে ৯০০ গুণ বেশী আর্সেনিকের উপস্থিতি লক্ষ্য করা গেছে।

বাংলাদেশে আর্সেনিক দূষণঃ বাংলাদেশে সর্বপ্রথম ১৯৯৩ সালে নবাবগঞ্জ যেলার অগভীর নলকূপে আর্সেনিক ধরা পড়ে। এর আগে এদেশের মানুষের আর্সেনিক দূষণ সম্পর্কে কোন ধারণাই ছিল না। তবে এ সম্পর্কে মানুষ এখন এত সচেতন যে, বর্তমানে সর্বসাধারণের প্রধান আলোচ্যবিষয় হ'ল আর্সেনিক। এর সঙ্গত কারণও আছে। বিগত ৫ই ফেব্রুয়ারী '৯৯ বাংলাদেশের জাতীয় সংসদে আর্সেনিক দূষণ নিয়ে ব্যাপক আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়। প্রশ্নোত্তর কালে স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে নিয়োজিত মাননীয় মন্ত্রী যিল্লুর রহমান জানান, রাঙ্গামাটি, খাগড়াছড়ি, বান্দরবান, কক্সবাজার ও শেরপুর যেলা ব্যতীত বাংলাদেশের বাকী ৫৯টি যেলার ভূ-গর্ভস্থ পানিই আর্সেনিক দূষণে দূষিত। তার মধ্যে ৩৩টি যেলার অবস্থা খুবই ভয়াবহ। এই যেলাগুলো হচ্ছেঃ সাতক্ষীরা, খুলনা, বাগেরহাট, যশোর, নবাবগঞ্জ, মেহেরপুর, কুষ্টিয়া, ঝিনাইদহ, চুয়াডাংগা, মাগুরা, নড়াইল, ফরিদপুর, রাজবাড়ী, গোপালগঞ্জ, শরীয়তপুর, লক্ষীপুর, নোয়াখালী, ফেনী, চাঁদপুর, কুমিল্লা, ব্রাহ্মণবাড়িয়া, নারায়ণগঞ্জ, পাবনা, রাজশাহী, মুন্সিগঞ্জ, নরসিংদী, মানিকগঞ্জ, সিলেট,

* বাংলা বিভাগ (শেষ বর্ষ ফলপ্রার্থী), রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।

সুনামগঞ্জ, মৌলভীবাজার, বরিশাল ও পিরোজপুর। বাকী যেলাগুলোতে আর্সেনিকের পরিমাণ কম।

বর্তমানে দেশে ৫০ লক্ষ নলকূপ আছে বলে ধারণা করা হচ্ছে। ১২ কোটি মানুষের জন্য ৯৫ শতাংশ পানীয় জলের যোগান আসে এই নলকূপ থেকে। সরকারী উদ্যোগে এ পর্যন্ত ২৯ লক্ষ নলকূপের পানি পরীক্ষা করা হয়েছে। তার মধ্যে ৩৫ শতাংশের পানি ব্যবহারের উপযোগী। বাকী ৬৫ শতাংশের ব্যবহার অনুপযোগী।

'বাংলাদেশ কেমিক্যাল এণ্ড বায়োলজিক্যাল সোসাইটি অফ নর্থ আমেরিকা' (BCBSNA)-এর মতে বাংলাদেশের মোট জনসংখ্যার প্রায় এক দশমাংশ লোক বিষাক্ত আর্সেনিক দূষিত এলাকায় বাস করছে। সে কারণে এ পরিস্থিতিকে বিভিন্ন মহল বিভিন্ন ভাবে নামকরণ করেছে। কেউ একে নিরব হত্যাকারী (Sylent killer), কেউবা একে রাশিয়ার চেরনোবিলের পারমাণবিক বিস্ফোরণের চেয়েও ভয়ঙ্কর বলে উল্লেখ করেছেন।

আর্সেনিক দূষণের কারণঃ বিশেষজ্ঞদের মতে মূলতঃ তিনটি কারণে আর্সেনিক দূষণ ঘটে। (১) ভূ-তাত্ত্বিক কারণ (২) প্রাকৃতিক কারণ এবং (৩) মানব সৃষ্ট কারণ।

(১) **ভূ-তাত্ত্বিক কারণঃ** হাযার হাযার বছর আগে হিমালয় ও অন্যান্য উঁচু এলাকা থেকে উঁচু মাত্রার আর্সেনিক যুক্ত পাথর ক্ষয়প্রাপ্ত হয়ে নিচে গড়িয়ে পড়ে এবং বালি, কাঁকর, পলিমাটি ও কাঁদার নিচে জমা হয়। যা দিয়ে পশ্চিমবঙ্গ ও বাংলাদেশের ভূমি গঠিত। ঐ আর্সেনিকবাহী তলানী দিয়ে গঠিত পানিবাহী স্তর থেকেই আমরা এখন পানি আহরণ করছি।

(২) **প্রাকৃতিক কারণঃ** দ্রুত পরিবর্তনশীল নদীর গতিপথ সমৃদ্ধ পৃথিবীর বৃহত্তম ব-দ্বীপ বাংলাদেশে বন্যা নিয়মিত আঘাত হানে। এই ভূখণ্ড দিয়ে গঙ্গা, ব্রহ্মপুত্র, মেঘনার মাধ্যমে প্রায় ২৪০ কোটি টন পলি সমুদ্রে পতিত হয়। এদেশের বেশির ভাগ নদীর উৎপত্তি স্থল হিমালয় পর্বত। উৎস ও গতিপথে আর্সেনিক সমৃদ্ধ বিস্তীর্ণ অঞ্চল এভাবে ক্ষয়প্রাপ্ত হয়ে বাংলাদেশের উপর দিয়ে সমুদ্রে পতিত হয় আর্সেনিক সমৃদ্ধ পলি। যতদিন বাংলাদেশের নদীগুলোর নাব্যতা গ্রহণযোগ্য সীমায় ছিল ততদিন যৌগ আর্সেনিক সালফাইড হিসাবে নদীর নিচে মাটির সঙ্গে জমা ছিল। পরবর্তীতে মানুষের কিছু কাজের মাধ্যমে তা পানিতে মিশে গিয়ে বিষাক্ত উপাদানে পরিণত হয়েছে।

(৩) **মানব সৃষ্ট কারণঃ** প্রায় ২৫ বছর আগের কথা। যখন বাংলাদেশে দূষিত পানি পান করার কারণে হাযার হাযার শিশু ও বৃদ্ধ মারা যেত। তখন বাংলাদেশের গ্রামবাসী সাধারণ জনগণের বিশুদ্ধ পানি সরবরাহের জন্য ইউনিসেফ (UNICEF) শ্যালো-টিউবওয়েল কর্মসূচী হাতে নেয়। এই কর্মসূচীর আওতায় UNICEF ও অন্যান্য আন্তর্জাতিক সংস্থা ১০ লক্ষ এবং সরকারী ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠান আরো ২০ লক্ষ নলকূপ স্থাপন করে। ফলে দেশে শিশু মৃত্যুর হার অর্ধেকে নেমে আসে। কিন্তু কেউ এটা কল্পনাও করতে পারেনি যে, এ সাফল্যের জন্য কত মূল্য দিতে হবে।

সরকারী, বেসরকারী, ব্যক্তি মালিকানা সর্বসাকুল্যে বাংলাদেশে গভীর-অগভীর মিলে মোট ৫০ লক্ষের মত নলকূপ আছে। অপরিকল্পিত ভাবে যত্র-তত্র নলকূপ বসিয়ে নিত্য প্রয়োজনীয় ও কৃষি কাজের জন্য ব্যাপক হারে ভূগর্ভস্থ পানি উত্তোলন এবং ফারাক্কার প্রতিক্রিয়া হিসাবে বিভিন্ন নদীর পানির উচ্চতা অনেক নেমে আসে। ফলে স্বাভাবিক ভাবেই প্রাকৃতিক কারণে মাটির সাথে মিশে থাকা আর্সেনিক সালফাইড (AsS) ও অন্যান্য আর্সেনিক যৌগ বাতাসের অক্সিজেনের (O) সংস্পর্শে এসে জারণ প্রক্রিয়ায় বিষাক্ত রাসায়নিক পদার্থে পরিণত হয়। যা পরবর্তীতে সহজে পানিতে দ্রবীভূত হয়ে পানিকে বিষাক্ত করে তোলে। এছাড়া মাটির নিচে পাথরের স্তরে নানা জায়গায় আছে আর্সেনো-পাইরাইড নামক এক প্রকার যৌগ, যা স্বাভাবিক অবস্থায় পানিতে অদ্রবণীয়। কিন্তু বায়ুর অক্সিজেনের সাথে তা সহজে বিক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করে। নলকূপের মাধ্যমে মাত্রাতিরিক্ত ভূগর্ভস্থ পানি উত্তোলনের ফলে উপরের বাতাস অতি সহজে ভূগর্ভের গভীরে পৌঁছে যায়। এই বায়ু যখন আর্সেনো পাইরাইডের স্তর পর্যন্ত পৌঁছে যায় তখনই ঘটে বিপর্যয়। কারণ, আর্সেনো-পাইরাইড বাতাসের অক্সিজেনে জারিত হয়ে তৈরী করে পানিতে দ্রবণীয় আর্সেনিক এসিড। আর দ্রবীভূত আর্সেনিক সব সময়ই বিষাক্ত। এই বিষাক্ত পানি পাম্প বা নলকূপের মাধ্যমে মানুষের শরীরে ঢুকে যায়।

আরো একটা বিষয় উল্লেখ্য যে, 'ওলম্যান সল্ট' নামে এক ধরনের লবন কাঠ সংরক্ষণের কাজে ব্যবহৃত হয়। যার মধ্যে ৩৪ শতাংশ সোডিয়াম আসেনাইট থাকে। 'বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড' তাদের ব্যবহৃত কাঠের খুঁটিতে এই লবনের প্রলেপ দিয়ে থাকে। যা আর্সেনিক দূষণের অন্যতম একটা কারণ বলে বিশেষজ্ঞরা মনে করেন। তাছাড়া রাসায়নিক বর্জ্য পদার্থ বিশেষ করে গ্লাস ও সিরামিক ফ্যাক্টরির বর্জ্য পদার্থ থেকে লিচিং পদ্ধতিতে অথবা আর্সেনিক ধারণকারী যে কোন বর্জ্য পদার্থ হ'তেও আর্সেনিক দূষণ হ'তে পারে।

কোন স্তরে আর্সেনিক বেশী থাকেঃ ভূ-তত্ত্ববিদরা ভূগর্ভস্থ পানির স্তরকে তিন ভাগে ভাগ করেছেন। উপরিভাগ হ'তে ১০ মিটার গভীরতা পর্যন্ত প্রথম স্তর। ১০ মিটার হ'তে ৭০ মিটার গভীরতা পর্যন্ত দ্বিতীয় স্তর এবং ৭০ মিটারের নিচ থেকে তৃতীয় স্তর। পরীক্ষা করে দেখা গেছে সাধারণত প্রথম স্তরে তেমন কোন আর্সেনিক নেই। কিন্তু দ্বিতীয় স্তরে অর্থাৎ ১০ মিটার হ'তে ৭০ মিটার পর্যন্ত আর্সেনিকের পরিমাণ সবচেয়ে বেশী। এর নিচে অর্থাৎ তৃতীয় স্তরেও খুব কম পরিমাণ আর্সেনিক আছে। এমনকি ২০০ মিটারের নিচে কোন আর্সেনিক নেই বললেই চলে।

আর্সেনিক চিহ্নিত করণঃ পৃথিবীতে বহু পদার্থ আছে যে গুলোকে মানুষ চক্ষু দ্বারা দর্শনের মাধ্যমে, নাক দ্বারা

ঘ্রাণ বা গন্ধ গ্রহণের মাধ্যমে অথবা জিহ্বা দ্বারা স্বাদ গ্রহণের মাধ্যমে সনাক্ত করতে পারে। কিন্তু আর্সেনিক এমন একটি বিষাক্ত পদার্থ, পানিতে দ্রবীভূত অবস্থায় যার কোন বর্ণ বা গন্ধ থাকে না। এমনকি কোন স্বাদও পাওয়া যায় না। স্বাভাবিক অবস্থায় রসুনের গন্ধের মত একটা গন্ধ থাকলেও পানিতে দ্রবীভূত অবস্থায় তাও পাওয়া যায় না। সুতরাং আর্সেনিক চিহ্নিত করণের একমাত্র উপায় পরীক্ষাগারে পরীক্ষা করা।

আর্সেনিক আক্রান্ত রোগীর লক্ষণঃ WHO-এর মতে আর্সেনিক আক্রান্ত হওয়ার লক্ষণ পুরোপুরি দেখা দিতে ৫ থেকে ১০ বছর সময় লাগে। যত দিন যায় ততই এর লক্ষণগুলি স্পষ্ট হ'তে থাকে। এ কারণে একে "Sylent killer" বলা হয়ে থাকে। বিশেষজ্ঞরা লক্ষণ গুলোকে তিনটি পর্যায়ে বিভক্ত করেছেন।

প্রথম পর্যায়ঃ (১) ত্বকের রং কালচে হয়ে যাওয়া (২) হাত ও পায়ের তালুর চামড়া খসখসে ও শক্ত হয়ে যাওয়া (৩) চোখ লাল হ'য়ে যাওয়া (৪) শ্বাসতন্ত্রের প্রদাহ (৫) বমি বমি ভাব ও সাথে পাতলা পায়খানা হওয়া।

দ্বিতীয় পর্যায়ঃ (১) ত্বকের বিভিন্ন স্থানে সাদা-কালো দাগ (২) হাত ও পায়ের তালুতে শক্ত গুটি (৩) পা ফুলে যাওয়া (৪) প্রান্তীয় স্নায়ু রোগ (৫) কিডনী ও লিভারের জটিলতা এবং কার্যক্ষমতা লোপ পাওয়া।

তৃতীয় পর্যায়ঃ এ স্তর খুবই ঝুঁকিপূর্ণ। (১) দেহের প্রান্তীয় অঙ্গের পঁচন (২) ত্বক, মূত্রথলি ও ফুসফুসে ক্যান্সার (৩) লিভার অকেজো হওয়া (৪) কিডনী অকেজো হওয়া। প্রস্রাবের পরীক্ষাই আর্সেনিক রোগ সনাক্ত করণের সবচেয়ে কার্যকর উপায়।

প্রতিকারঃ একই পরিবার বা এলাকার মানুষ একই উৎস হ'তে পানি পান করা সত্ত্বেও আর্সেনিক জনিত রোগে কেউ আক্রান্ত হয় আবার কেউ হয় না। যাদের শরীরে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বেশী, পুষ্টির সবগুলো উপাদান পর্যাপ্ত পরিমাণে বিদ্যমান থাকে, তাদের আর্সেনিকে আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা কম। আর্সেনিকে আক্রান্ত রোগীর প্রথম প্রথম চিকিৎসা হ'ল আর্সেনিক দূষণ মুক্ত বিশুদ্ধ পানি পান করা। ভিটামিন 'সি' ও 'ই' সমৃদ্ধ খাবার যেমন শাক-সবজি, ডাল, মাছ, মাংশ, ডিম ইত্যাদি পুষ্টিকর খাবার খাওয়া। আর্সেনিক আক্রান্ত রোগীর চিকিৎসার জন্য সুনির্দিষ্ট পদ্ধতি এখনো আবিষ্কৃত হয়নি। তবে একটা কথা সকলের জানা দরকার যে, আর্সেনিকজনিত রোগ ছোঁয়াচে বা সংক্রামক রোগ নয়, বংশগতও নয়। এমনকি আর্সেনিক যুক্ত পানি ফোঁটালেও আর্সেনিকমুক্ত হয় না।

আর্সেনিক দূষণ রোধে গৃহীত পদক্ষেপঃ পানিতে আর্সেনিকের দূষণ রোধ করার জন্য বিশেষজ্ঞদের চিন্তা-ভাবনার অন্ত নেই। ইতিমধ্যে এ বিষয়ে বেশ কয়েকটি ব্যবস্থা গ্রহণের কথা জোর দিয়ে উল্লেখ করা হয়েছে। আর্সেনিক দূষণ প্রতিরোধ ও নিরসনের লক্ষ্যে সরকার জাতীয় পর্যায়ে স্বাস্থ্য মন্ত্রীর নেতৃত্বে স্টিয়ারিং কমিটি গঠন করেছে। সাথে সাথে এ বিষয়ে গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা ও এর করণীয় সম্পর্কে সুপারিশ প্রদানের জন্য পরমাণু শক্তি কমিশনের চেয়ারম্যানের নেতৃত্বে 'সায়েন্টিফিক রিসার্স কমিটি'ও গঠন করা হয়েছে। এছাড়া তাৎক্ষণিক প্রতিরোধ কার্যক্রম ও চিকিৎসা প্রদানের জন্য মহাব্যবস্থাপক স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের নেতৃত্বে 'আর্সেনিক টোনিকাল কমিটি' ১৯৯৪ সাল থেকে কাজ করে যাচ্ছে।

আর্সেনিক দূষণ নিরসন ও প্রতিরোধের লক্ষ্যে সরকারের পাশাপাশি বিভিন্ন বেসরকারী সেবা মূলক প্রতিষ্ঠানও যৌথভাবে বিভিন্ন পরিকল্পনা নিয়ে কাজ করে যাচ্ছে। তাঁরা স্বল্প ও দীর্ঘ মেয়াদি পরিকল্পনা গ্রহণ করেছেন। সম্প্রতি ঢাকা ভিত্তিক এশিয়া ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় সমন্বিত পল্লী উন্নয়ণ কেন্দ্র (সিরডাপ) এ ব্যাপারে বাংলাদেশকে সহায়তা করার উদ্যোগ নিয়েছে।

স্বল্প মেয়াদি পরিকল্পনার মধ্যে আছেঃ (১) আর্সেনিক আক্রান্ত রোগী সনাক্ত করণ ও সেবা প্রদান (২) নলকূপের পানি পরীক্ষা করণ এবং আর্সেনিক মুক্ত নলকূপ সবুজ রং দিয়ে আর আর্সেনিক যুক্ত নলকূপ লাল রং দিয়ে চিহ্নিত করণ (৩) গণ সচেতনতা বৃদ্ধি করণ ইত্যাদি।

দীর্ঘ মেয়াদি পরিকল্পনার মধ্যে আছেঃ (১) আর্সেনিক দূষণের উৎস নির্ণয় (২) ভূ-গর্ভস্থ নিরাপদ পানির স্তর নির্ণয় (৩) দূষণহীন পানি সরবরাহের ব্যবস্থা করণ (৪) মানবদেহে আর্সেনিক দূষণ রোধে গবেষণা কার্যক্রম ইত্যাদি।

আর্সেনিক দূষণ যুক্ত পানি বিশুদ্ধ করণ পদ্ধতিঃ ডায়রিয়া বা কলেরার জীবাণু আক্রান্ত পানি ফোঁটালে তা বিশুদ্ধ হয়। কিন্তু আর্সেনিক যুক্ত পানি ফোঁটালে তা আর্সেনিক মুক্ত হয় না। আর্সেনিক যুক্ত পানি আর্সেনিক মুক্ত করার জন্য বেশ কিছু পদ্ধতির উদ্ভব ঘটেছে। ভারতের পশ্চিমবঙ্গে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের 'স্কুল অফ এনভায়রনমেন্টাল ষ্টাডিজ' এবং 'কাউন্সিল অফ সায়েন্টিফিক এ্যান্ড রিসার্চ'-এর বিজ্ঞানীরা যৌথভাবে আর্সেনিক দূষিত পানি বিশুদ্ধ করার একটা সহজ পথ বের করেছেন।

জার্মানের বার্লিনের 'এন্টিগ্রেটেড কোয়ালিটি এ্যাণ্ড এনভায়রনমেন্ট ম্যানেজমেন্ট'-এর পরিবেশ বিশেষজ্ঞ ডাঃ জামাল আনোয়ার সম্প্রতি সৌর রশ্মি, বালি ও মাটির পাত্রের সাহায্যে পানি থেকে আর্সেনিক অপসারনের পদ্ধতি বের করেছেন। ফিটকিরি দ্বারাও শতকরা ৬০ ভাগ আর্সেনিক মুক্ত করা যায় বলে বিশেষজ্ঞরা মত প্রকাশ করেন। সম্প্রতি নিপসন মহাখালী এক ধরনের কেমিক্যাল প্যাকেট উদ্ভাবন করেছে ,যার দ্বারা পানির শতকরা ৯০ ভাগ আর্সেনিক দূর করা যাচ্ছে বলে তাঁরা দাবী করেন। এছাড়া আরো অনেক পদ্ধতির উদ্ভব হয়েছে যার দ্বারা আর্সেনিক যুক্ত পানিকে আর্সেনিক মুক্ত করা যায়। এমনি

একটি পদ্ধতি নিম্নে উপস্থাপন করা হ'লঃ

এই পদ্ধতিতে দু'টি সিমেন্টের জারর-এর প্রয়োজন। উপরে থাকবে ৪০ লিটার ধারণ ক্ষমতা সম্পন্ন একটি জার এবং তার নিচে থাকবে অপেক্ষাকৃত ছোট ও বিশেষ ধরনের অপর একটি জার। উপরের জারে আর্সেনিক যুক্ত পানি পূর্ণ রাখতে হবে। দ্বিতীয় জারের তলদেশে থাকবে পাথরের টুকরার একটি স্তর। এর উপরে থাকবে কাঁকড় বা নুড়ির স্তর। এই দ্বিতীয় স্তরের উপরে থাকবে সূক্ষ্ম বালির স্তর। এটি তৃতীয় স্তর। এই স্তরের উপরে থাকবে পাতলা পরিস্কার কাপড়ের একটি পর্দা। এই পর্দার উপরে চতুর্থ স্তরে থাকবে ঘন সন্নিবিষ্ট চূর্ণ-চূর্ণ কাঠ কয়লা। এই স্তরের উপরে আর একটা পাতলা কাপড়ের পর্দা থাকবে এবং এর উপরে ৫ম স্তরে থাকবে সূক্ষ্ম চালুনি দিয়ে চালা অতি সূক্ষ্ম বালি। আর এই ৫ম স্তরের উপরে থাকবে ফাঁকা জায়গা, যেখানে পরিশোধিত বিশুদ্ধ পানি জমা হবে। এখন ৪০ লিটার পানি বিশিষ্ট জারের নিচ থেকে একটি নির্গমণ নল দ্বিতীয় জারের একেবারে নিচে প্রবেশ করানো থাকবে। উপরের জারে পানি বেশী থাকার কারণে পানির চাপের ফলে দ্বিতীয় জারের নিচ দিয়ে পানি প্রবেশ করবে এবং এই পাঁচটি স্তর অতিক্রম করে দ্বিতীয় জারের উপরিভাগে আর্সেনিক মুক্ত বিশুদ্ধ পানি জমা হবে। এ পদ্ধতির মাধ্যমে আমরা আর্সেনিক মুক্ত বিশুদ্ধ পানি পেতে পারি।

পরিশেষে বলা যায়, যেভাবেই হৌক যে কারণেই হৌক ভূ-গর্ভস্থ পানিতে আর্সেনিক দূষণ হচ্ছে। এ পানি পান করে মানুষের জীবন বিপন্ন প্রায়। বিধাতার সর্বোৎকৃষ্ট সৃষ্টি মানব জাতি। মানুষই যদি বিষাক্ত পানি পান করে মরে যায়, তাহ'লে গোটা সৃষ্টিই অর্থহীন হ'য়ে পড়বে। তাই এ নিরব গযবের হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য আল্লাহ্‌র উপর সর্বদা ভরসা রেখে আর্সেনিক দূষণ নিয়ন্ত্রণ, প্রতিকার ও চিকিৎসার কার্যকর, সহজলভ্য ও নিরাপদ পদ্ধতি খুঁজে বের করার জন্য আমাদের সাধ্যমত চেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে। আল্লাহ আমাদের তাওফীক দিন- আমীন!!

হোটেল নাইস ইন্টারন্যাশনাল
(আবাসিক)

আন্তরিক আতিথেয়তার পূর্ণ নিশ্চয়তার নির্ভরযোগ্য

গনকপাড়া, সাহেব বাজার, রাজশাহী
ফোনঃ ৭৭৬১৮৮, ফ্যাক্স ঃ ৮৮০-০৭২১-৭৭৫৬২৫
ফোনঃ ৭৭১৮০৮।

শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত কক্ষ, সুসজ্জিত এ্যাটাচড বাথ, পিজার দ্বারা গরম ও ঠাণ্ডা পানি সুব্যবস্থা, টেলিফোন সার্ভিস, লকার ব্যবস্থা, কক্ষে স্যাটেলাইট টিভির ব্যবস্থা, লন্ডী ব্যবস্থা, রেন্ট একার ও গাড়ী পার্কিং এর সুব্যবস্থা।

হজ্জ ও সামাজিক ধারণা

*মুহাম্মাদ ছাকী হোসাইন**

আমি এখনও ৪০ বছরে পা রাখিনি। কিন্তু মহান আল্লাহপাকের অশেষ রহমতে অতঃপর আমার আন্তরিক ইচ্ছার ফলে গত বছর পবিত্র হজ্জব্রত পালন করতে পেরেছি। ফালিল্লাহিল হামদ।

ইসলাম ধর্মের ৫টি স্তম্ভের মধ্যে হজ্জ অন্যতম। যা একজন মুসলমানের আর্থিক ও শারিরীক সামর্থ্যের উপর সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করে। এজন্যই কোন দেশের গরীব ধর্মপ্রাণ মুসলমানগণ প্রবল ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও হজ্জ পালন করতে পারেন না। আর এটা আল্লাহ্‌রই হুকুম।

যারা হজ্জ পালন করতে যান তারা আল্লাহ্‌র মেহমান। আল্লাহ্‌র খাছ রহমত ছাড়া কোন মুমিন বান্দা হজ্জ পালনের উদ্দেশ্যে সঊদী আরব যেতে পারেন না। এটা মুসলমান মাত্র সকলেই উপলব্ধি করতে পারেন।

আমাদের দেশে অনেক ধনী মুসলমান আছেন, যারা বারবার চেষ্টা করেও হজ্জে যেতে পারেন না। হয়ত দেখা যায় হজ্জ মৌসুম এলেই শারিরীক নানা রকম উপসর্গ দেখা দেয় নতুবা আর্থিক ও সামাজিক কোন না কোন বিপর্যয় ঘটে থাকে। এমনও ঘটনা আছে যে, হজ্জ-এর জন্য টাকা জমা দিয়েও যেতে পারেন না। এগুলো সবই আল্লাহ্‌র ইচ্ছা।

কিন্তু একটি বিষয় গুরুত্বপূর্ণ যে, আমাদের দেশের সামাজিক রীতিই বলুন আর ধর্মীয় অনুভূতিই বলুন একটা ধারণা আমাদের মধ্যে সর্বদা লালিত হয়ে আসছে যে, বৃদ্ধ বয়সে হজ্জ পালন করা।

অবস্থা দৃষ্টে মনে হয় যে, জোয়ান অবস্থায় হজ্জে যাওয়া আশ্চর্যের বিষয় ও বেমানান। তার উপর যদি জোয়ান হাজী ছাহেব দাড়ি রাখেন তাহ'লে তো আরও অবাক। আমার কার্য্যিক জ্ঞান থেকে দেখেছি যে, আমার হজ্জে যাওয়া নিয়েও অনেক রকমের আলোচনা ও সমালোচনা হয়েছে। কেউ কেউ বলেছেন, তাঁর কি হজ্জে যাওয়ার বয়স হয়েছে? আরও পরে যেতে পারত? আরও অপেক্ষা করে স্ত্রীকে সাথে নিয়ে হজ্জ করতে পারত ইত্যাদি ইত্যাদি। আবার উল্টো দিকে এ বয়সে হজ্জ পালন করার জন্য প্রচুর প্রশংসাও কুড়িয়েছি। প্রশংসাকারীরা আমার মানসিকতা তথা এ বয়সে হজ্জ পালন করার বিষয়টি গুরুত্ব সহকারে দেখেছেন।

* উপ-ব্যবস্থাপক (প্রশাসন), টি,এস,পি, কমপ্লেক্স লিঃ, উত্তর পতেঙ্গা, চট্টগ্রাম।

সবার মন্তব্যে আমার বক্তব্য ছিল এরূপ- কখন মারা যাই ঠিক নেই। ইচ্ছে যখন করেছি আল্লাহ যদি আমার সীমিত আয়ে বরকত দেন তবে এ বছর এ বয়সেই যাওয়া ভাল। এখন হজ্জে যাওয়ার মন আছে, পরবর্তীতে যদি শয়তানের খপ্পরে পড়ে যাই, তবে এ টাকা দিয়ে অন্যান্য দেশ ঘুরে বেড়াবার সাধ জাগবে। অথবা অন্যান্য অপ্রয়োজনীয় খাতেও টাকা খরচ হ'তে পারে। উল্লেখ্য যে, আমি খুবই ক্লোজ ফাইনানসিয়াল অবস্থার উপর নির্ভর করে আল্লাহ্র ঘর তাওয়াফ করার তথা আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)-এর রওজা জিয়ারত করার মনস্থ করেছিলাম। আল্লাহ রাব্বুল ইয্যাতের নিকট শুকরিয়া জ্ঞাপন করছি। তিনি আমাকে তাঁর মেহমান হওয়ার তৌফিক এনায়েত করেছেন।

হজ্জ পালন কালে কতগুলো গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আমাকে ভাবিয়ে তুলেছে, যা ধর্মীয় ও সামাজিকভাবে মোকাবেলা করা অপরিহার্য।

প্রথমতঃ বাংলাদেশী হাজীদের বয়স। আমাদের বদ্ধমূল ধারণাই হয়ে গেছে যে, বৃদ্ধ বয়স ছাড়া হজ্জে যাওয়া যাবে না। অনেকে মনে করেন, সারা জীবন পাপের বোঝা বাড়িয়ে শেষ বয়সে আল্লাহ্র ঘর ধরে মাফ চাইলেই বেহেশতের সনদ পেয়ে যাব। শহর ও গ্রামের হজ্জযাত্রীদের মধ্যে একটু তফাৎ আছে আচরণে ও মানসিকতায়। গ্রামের লোক স্বভাবতই একটু বেশী ধর্মভীরু হয়, যা শহরে পাওয়া যায় কম। জীবনের শেষ বেলায় এসে জমি বিক্রি করে হৌক, আর ব্যবসায় জমানো টাকা দিয়ে হৌক হজ্জ-এর পরিকল্পনা মাথায় আনেন। তখন হয়তবা শারিরীক ভারসাম্য ততখানি থাকে না যতখানী হজ্জ-এর জন্য যথেষ্ট। কখনো দেখা যায় বৃদ্ধ লোকের ছেলে বিদেশে থাকে। শেষ বয়সে ছেলের নিকট আবদার করেন কিছু টাকা দিতে, যেন আল্লাহ্র ঘর দেখতে পারেন। এখানে উল্লেখ্য যে, অনেক সময় প্রবাসী ছেলের পীড়াপীড়িতেও বৃদ্ধ বাবা হজ্জ করতে রাযী হন। কিন্তু মূলতঃ দেখা যায় বৃদ্ধ ঐ লোকের উপর হজ্জ ফরয নয়। এমনিভাবে অনেক লোককে জোর করে ঠেলে দিয়ে লাশ হয়ে ফিরে আসতেও দেখা গেছে। গ্রামে আরও একটা বিষয় মানসিকভাবে কাজ করে, তা হ'ল অনেকের ধারণা বিবাহযোগ্য মেয়ে ঘরে রেখে হজ্জ পালন হবে না। এ ধারণা পোষণ করে অনেকেই বয়সের ভার আরও বাড়িয়ে তুলেন। শহুরে বড় বড় ব্যবসায়ীদের ধ্যান-ধারণাও অন্য রকম। ব্যবসার চিন্তা-ভাবনা করতে করতে আর টাকার পিছনে ঘুরতে ঘুরতে ১০/২০ বছর পূর্বে ফরয হওয়া হজ্জ একেবারে শেষ বয়সে এসে থেমে যায়। অথচ চিন্তাই নেই যে, হজ্জ ফরয হওয়ার পরপর তা আদায় না করলে গোনাহগার হ'তে হবে। শহরের ক্ষেত্রে আরও একটা বিষয় উল্লেখ্য যে, নিজের বাড়তি পরিচয়ের জন্য নাম লাগানো হাজী। এক আলোচনা সভায় শুনেছিলাম আজকাল আমাদের দেশের প্রেক্ষাপটে হজ্জ কয়েক প্রকার হয়ে গেছে।

১। আল্লাহ্র সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে হজ্জ।
২। ভ্রমণের উদ্দেশ্যে হজ্জ।
৩। ব্যবসায়ী হজ্জ।
৪। নাম লাগানোর জন্য হজ্জ।
৫। হজ্জ না করলে সামাজিকভাবে অপদস্থ হবার আশংকায় হজ্জ।
৬। ঠেকায় পড়ে হজ্জ ইত্যাদি।

এ তো গেল হজ্জ-এর ধরণ ও প্রকৃতি নিয়ে কথা। তারপর আসে সউদী আরব যাত্রা ও মক্কায় অবস্থানকালীন কার্যক্রম। মক্কার পবিত্র মাটি স্পর্শ করার সাথে সাথে বিভিন্ন হজ্জ যাত্রীর মনে বিভিন্ন রকম অনুভূতির সৃষ্টি হয়। এটাও নির্ভর করে মর্জি, মেযাজ ও হজ্জযাত্রীর ধরণের উপর। এ কথা সত্য যে, সব হাজী সমভাবে পরহেযগার ও মুত্তাক্বী নন। হজ্জকালীন সময়ে দলবদ্ধ হবার একটা পরামর্শ দেয়া হয়ে থাকে। এ ব্যাপারে তাবলীগ জামা'আত প্রথম স্থান অধিকার করে থাকে। দ্বিতীয়তঃ দলবদ্ধভাবে চলতে চান আত্মীয়-স্বজনের দল। দলবদ্ধভাবে চলার ভাল ও মন্দ দিক উভয়ই বিদ্যমান।

আত্মীয়-স্বজন বা স্থানীয় লোকের দলবদ্ধতায় বেশ কিছু মন্দ দিক পরিলক্ষিত হয়েছে। এরমধ্যে নানা মুনির নানান মত প্রযোজ্য। বিভিন্ন জনের বিভিন্ন অভ্যাস। একেক জন একেক পরিবেশ থেকে এসেছেন। কিন্তু পবিত্র হজ্জ-এর উদ্দেশ্যে সকলকেই বেশ কিছু ত্যাগী হওয়া উচিত অর্থাৎ সবাইকেই পরহেযগারী ও তাক্বওয়া নিয়ে হজ্জ-এর রোকন পালন করতে হবে। কিন্তু দেখা যায় ডজন লোকের কেউ ব্যস্ত খাওয়া দাওয়া নিয়ে, কেউ ব্যস্ত সিগারেট ফুঁকা নিয়ে, কেউ ব্যস্ত বিদেশ থেকে ছেলে-মেয়ের ফোন আসা নিয়ে, কেউ হতাশ পরিস্থিতির সাথে খাপ খাওয়াতে না পেরে, আবার কেউ বা ব্যস্ত ইবাদত-বন্দেগী নিয়ে, যার সংখ্যা নিতান্তই নগন্য। মোটকথা এই যে, সামান্য পরহেযগার না হ'লে হজ্জ পালন অবস্থায় ইবাদত-বন্দেগী একত্রে করা খুবই মুশকিল। হজ্জ পালনে হুবহু এ রকম একটা পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছিল আমার ক্ষেত্রে। যদিও প্রথম থেকেই এরাদা করেছিলাম আল্লাহ্র মেহমান যখন হয়েছি তখন আল্লাহ যা করেন এবার হেরেম শরীফের আশেপাশে কোথাও রাত দিন কাটিয়ে ইবাদত-বন্দেগী করব। কিন্তু বাধ সাধলো সেই দলবদ্ধতা। দলের কনিষ্ঠ সদস্য হিসাবে আমার মুখ বন্ধ। সবার আদেশ শুনতে শুনতে আর সার্ভিস দিতে দিতে নিজের পরহেযগারী ও ইম্পিত ইবাদত-বন্দেগী তেমন করতে পারিনি বলে কিছুটা আফসোস। আল্লাহ্কে

ধন্যবাদ তিনি এমনতর অবস্থায়ও আমাকে সন্তুষ্টপূর্ণ ভূমিকা রাখতে সাহায্য করেছেন। দলগতভাবে ইবাদত করতে যে অসুবিধার সম্মুখীন হ'তে হয় তার উদাহরণ হিসাবে উল্লেখ করা যায় তাওয়াফ। তাওয়াফ করার সময় কি অবস্থা বা পরিস্থিতির শিকার হ'তে হয় তা হাজী ছাহেব মাত্রই জানেন। অথচ তাওয়াফ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, বরকতপূর্ণ ও ছওয়াবের কাজ। আল্লাহ্‌র কাছে হক যা চাওয়া যায় তাই আল্লাহ কবুল করেন তাতে কোন প্রকার সন্দেহ করা গোনাহের কাজ।

আল্লাহ্‌র আরশের নীচে যে বায়তুল্লাহ অবস্থিত সেই ঘর তাওয়াফের সময় অমুক ছাহেব পিছনে আছেন কি-না, তমুক চাচা পাশে আছেন কি-না, উনাদের পিছনে অমুক-অমুক ছিলেন উনারা ঠিকমত অনুসরণ করতে পারছেন কি-না? ইত্যাদি অনেক বিষয় যদি দলগতভাবে তাওয়াফ করার সময় দেখতে হয় তবে তত্ত্বাবধায়ক বা দলনেতা আল্লাহ্‌কে ডাকার ও খুশু-খুযূর অবস্থা কোথায় পাবেন? তাইতো আমার অভিজ্ঞতা থেকে বলছি, হজ্জ-এর নিয়ম-কানুন যথাযথভাবে পালন করতে 'একলা চল' নীতি সর্বোত্তম। কারণ, তাওয়াফের মত সাঈ করা, কঙ্কর মারা ইত্যাদি গুরুত্বপূর্ণ কাজ করার সময় আন্তরিকভাবে দো'আ করার অনেক কিছু আছে। তাছাড়া দলনেতা উচ্চৈঃস্বরে কিছু পড়লে তার অর্থ বোঝেন আর নাই বোঝেন তাতে আন্তরিকতার ছোঁয়া থাকে খুবই হালকা। এটাও সত্য যে, সব সময় দলবদ্ধভাবে চলা হজ্জ-এর সময় অত্যন্ত কঠিন ব্যাপার। হাজী ছাহেবদের ধাক্কার ফলে কে কখন কোথায় চলে যায় বলা মুশকিল। তাই দলগত হবার চিন্তা না করে ব্যক্তিগতভাবে একাকী অত্যন্ত দৃঢ় মনোবল নিয়ে হজ্জ পালন করা অতি উত্তম।

হজ্জ পালনের জন্য প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত অত্যন্ত ধৈর্যশীল হওয়া উচিত। আমাদের করণীয় ও বর্জনীয় উভয় দিক সম্বন্ধে সচেতন থাকতে হবে। প্রতিটা নিয়ম-কানূন যদি একজন হাজী ছাহেব খুবই সতর্কতার সাথে পালন করেন, তবেই আশা করা যায় আল্লাহ রাব্বুল ইয্যাত আমাদের কপালে 'হজ্জে মাবরুর' নছীব করবেন। আমি আন্তরিকভাবে দো'আ করি যেন আল্লাহ আমাদের সকলের ঐকান্তিক কামনা কবুল করেন এবং তাঁর রুবুবিয়াত ও রহমানিয়াতের তেজ আমাদেরকে বুঝতে দেন। -আমীন!

পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছ অনুযায়ী
জীবন গড়ার অনন্য মুখপত্র
'মাসিক আত-তাহরীক'
গ্রাহক হউন! বিজ্ঞাপন দিন!

মক্কা-মদীনায় হজ্জ নামে যা দেখেছি

*-ডাঃ মুহাম্মাদ মনছুর আলী**

ইসলামের পঞ্চস্তম্ভের মধ্যে হজ্জ অন্যতম একটি স্তম্ভ। আর্থিক ও শারীরিক সামর্থ্যবান মুসলমানদের উপর হজ্জ ফরয। আল্লাহপাক বলেন, وَلِلّٰهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيْلاً– 'মানুষের উপর আল্লাহ্‌র প্রাপ্য হচ্ছে- যাদের সামর্থ্য আছে সে পর্যন্ত পৌঁছার তারা যেন এ ঘরের হজ্জ করে' (আলে-ইমরান ৯৭)।

এই হজ্জ উপলক্ষে বিভিন্ন প্রান্তের লক্ষ লক্ষ মুসলমানের সমাবেশ ঘটে থাকে পবিত্রতম ভূমি মক্কা-মদীনায়। পারস্পরিক সম্প্রীতির এ এক সুমহান দৃষ্টান্ত। বিশ্ব ভ্রাতৃত্বের এক অনন্য উদাহরণ। ছোট-বড়, সাদা-কালোয় কোন ভেদাভেদ নেই। নেই কোন হিংসা-বিদ্বেষ। সকলে এক কাতারে শামিল হয়ে স্বীয় প্রভুর উদ্দেশ্যে সমস্বরে উচ্চারণ করছে -

لَبَّيْكَ اَللّٰهُمَّ لَبَّيْكَ لَبَّيْكَ لاَ شَرِيْكَ لَكَ لَبَّيْكَ إِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ لاَ شَرِيْكَ لَكَ

'তোমার দরবারে হাযির হে আল্লাহ! তোমার দরবারে হাযির। তোমার কোন শরীক নেই। নিশ্চয়ই যাবতীয় প্রশংসা, অনুগ্রহ ও সাম্রাজ্য তোমার। তোমার কোন শরীক নেই'।

কিন্তু এ হজ্জ সম্পাদনের নীতিমালা যেখানে সকল মুসলমানের এক ও অভিন্ন হওয়ার কথা সেখানে দেখা যায় বিভিন্ন মতানৈক্য। বিভিন্ন আক্বীদা পোষণকারী মানুষ হজ্জ উপলক্ষে এই পবিত্র স্থানে এসে যে সকল কর্মকাণ্ড করে থাকেন সত্যিই তা দুঃখজনক। শরীয়ত গর্হিত অসংখ্য বিদ'আতী কার্যকলাপের মাধ্যমে তারা হজ্জ সম্পাদন করে থাকেন। ভক্তির আতিশয্যে মনগড়া সব পদ্ধতি আবিষ্কার করে ইসলামের এই সুমহান ইবাদতে অতিরঞ্জন করে থাকেন।

আমাদের দেশে হজ্জে যাওয়ার দু'টি ব্যবস্থা আছে। সরকারী ও বেসরকারী। সরকারী ব্যবস্থাপনা উত্তম না হওয়ায় বেসরকারী ব্যবস্থাপনায় হজ্জে গমনের সংখ্যা ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাচ্ছে। বেসরকারী হজ্জ কাফেলাগুলো তাদের এজেন্টদের মাধ্যমে হাজী সংগ্রহ করে থাকে। আর এই ব্যবস্থায় মালিক ও এজেন্টগণ হাজীদের চেয়ে তাদের

* মলি ফার্মেসী, তাহেরপুর বাজার, রাজশাহী।

নিজেদের স্বার্থের প্রতিই বেশী নযর দিয়ে থাকেন। তবে সরকারী ব্যবস্থাপনার চেয়ে বেসরকারী ব্যবস্থাপনায় প্রশিক্ষণ তদবীর বেশী পাওয়া যায়। কিন্তু যাদের দ্বারা এই প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়, তারা নিজেরা শারঈ বিধান সম্পর্কে কতটুকু পরিজ্ঞাত এ প্রশ্ন সকলের। ফলে সুফলের চেয়ে কুফলই বেশী হয়ে থাকে।

আমি একজন চিকিৎসক হিসাবে চিকিৎসা জীবনের একটি ঘটনা বলছি- আমার দোকানে মানুষ ও গবাদী পশু-পাখীর ঔষধ পাওয়া যায়। পার্শ্ববর্তী গ্রামের জনৈক ভাই তার মায়ের ও গরুর জন্য এক সাথে ঔষধ ক্রয় করে বাড়ীতে টেবিলে রাখেন। রাতে মায়ের অসুখ বৃদ্ধি পেলে ছোট ভাইকে বলেন, মাকে ঔষধ খাইয়ে দিতে। ছোট ভাই তখন টেবিলের উপর থেকে ভুল করে গরুর ঔষধটি মাকে খাইয়ে দেয়। ফলে মায়ের অবস্থা আরো খারাপ হ'তে থাকে। বড় ভাই তখন জিজ্ঞেস করল, কোন ঔষধটা খাওয়ায়েছ? দেখা গেল যে, গরুর ঔষধটি মাকে খাওয়ানো হয়েছে। ঘটনাটি নিশ্চয়ই পাঠক মহল বুঝতে পেরেছেন। যদি গরুর ঔষধটি পৃথক করে রাখা হ'ত এবং গরু ও মানুষের ঔষধ সম্পর্কে জ্ঞান থাকত, তবে এরূপ হ'ত কি?

অনভিজ্ঞ প্রশিক্ষকগণের শিরক ও বিদ'আত-এর জ্ঞান না থাকায় হাজী ছাহেবানদের বিপদ থেকে মুক্ত করতে গিয়ে আরো বিপদের দিকে ঠেলে দেয়া হচ্ছে। আমি বেসরকারী প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত হাজী ছিলাম। এক্ষণে মক্কা-মদীনায় স্বচক্ষে যে সকল শরীয়ত গর্হিত কার্যক্রম দেখেছি তা পাঠকদের উদ্দেশ্যে উপস্থাপন করলাম-

মক্কায়ঃ

(১) কা'বা ঘরে মাথা ও বুক লাগিয়ে থাকা।

(২) কা'বা ঘর স্পর্শ করার জন্য অন্যদেরকে অযথা কষ্ট দেওয়া।

(৩) কা'বা ঘরকে স্পর্শ করতে না পারলে কা'বা ঘরের দেওয়ালে জায়নামাজ, রুমাল ইত্যাদি ছুঁড়ে দিয়ে সেটিতে বার বার চুমু খাওয়া।

(৪) বিদায়ী তাওয়াফ শেষ করে ফিরার সময় কা'বা ঘরের দিকে মুখ করে মাজার ভক্তদের মত পিছন দিকে হেঁটে আসা।

(৫) 'মসজিদে তানঈম' থেকে এহরাম বেঁধে বার বার বিভিন্নজনের নামে ওমরা করা। সবশেষে পুরুষদের মাথার ২/১ জায়গা থেকে সামান্য চুল কাটা।

(৬) তাওয়াফের সময় দৌড়ে ও দল বেঁধে যাওয়া এবং দো'আ পড়া। মহিলাদের সঙ্গে নিয়ে পুরুষের সারিতে ছালাত আদায় করা।

(৭) তামাত্তু হাজীগণ ৮ তারিখে মীনা ও আরাফাতে যাওয়ার পূর্বে সাফা-মারাওয়া সাঈ করা।

(৮) যমযমের নিকট দু'রাক'আত ছালাত আদায় করা।

(৯) সাফা পাহাড়ের মাথায় অযথা ভিড় করা এবং কুরআন পড়া।

(১০) তাওয়াফ অবস্থায় ছালাতের সময় হ'লে ছতর না ঢেকে ছালাত আদায় করা।

(১১) রোকনে ইয়ামেনী স্পর্শ না করে চুমু খাওয়া।

(১২) নামে নামে তাওয়াফ করা। (মায়ের নামে, ছেলের নামে ইত্যাদি)।

(১৩) যমযমের পানিতে কাফনের কাপড় ধোয়া। (যে কাপড় জানাযার সময় পরানো হবে)।

(১৪) হারামাইনের নিচের তলায় খুঁটির আড়ালে যুবতী দম্পতিদের পার্কের স্টাইলে আরাম করা, খাওয়া-দাওয়া করা ও ঘুমানো।

(১৫) ছালাতীদের সারির ভিতরে ঘুরে ঘুরে বিভিন্ন কায়দায় ভিক্ষা করা।

(১৬) তাওয়াফ শেষে দু'রাক'আত ছালাতের জন্য তাওয়াফের স্থানে বসে পড়া।

মিনায়ঃ

(১) জামারাতুল আকাবায় পাথর মারার সময় অযথা মানুষকে ধাক্কা দেওয়া ও শক্তি প্রয়োগ করা।

(২) পাথরের পরিবর্তে জুতা-স্যাণ্ডেল, ছাতা ইত্যাদি মারা।

(৩) কুরবানী কবুল হওয়া সম্পর্কে সন্দেহের বশবর্তী হয়ে নবী করীম (ছাঃ)-এর নামে কুরবানী করা।

(৪) ওযর ছাড়াই সূর্যোদয়ের বহু পূর্বে আরাফাতে গমন করা।

(৫) সম্পূর্ণ মাথা না মুড়ায়ে ২/১ জায়গা থেকে সামান্য চুল কাটা (পুরুষদের)।

আরাফায়ঃ

(১) 'আরাফা'র সীমানার বাইরে অবস্থান করা।

(২) 'জাবালে রহমত'-এ উঠে দু'রাক'আত ছালাত আদায় করা।

(৩) সাজানো উটে চড়ে ছবি তোলা।

(৪) জাবালে রহমতের বিভিন্ন অংশ থেকে পলিথিনের ব্যাগে মাটি সংগ্রহ করা ও ছালাত আদায় করা।

(৫) ৯ তারিখে সূর্যাস্তের বহু পূর্বে 'আরাফা ত্যাগ করা।

(৬) 'মসজিদে নামেরাতে এক আযানে দুই ইক্বামতে যোহর ও আছরের ছালাত আদায়কে সন্দেহ মনে করা।

মুযদালাফায়ঃ

(১) মুযদালাফার সীমানা মনে করে মুযদালাফার সীমানার বাইরে অবস্থান ও ছালাত আদায় করা ইত্যাদি।

(২) গভীর রাতে মুযদালাফার সীমানা ত্যাগ করে মিনায় প্রবেশ করা।

মদীনায়ঃ

(১) রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর কবরের সামনে বিদ'আতী দরূদ পাঠ এবং সালাম পেশ।

(২) কা'বাকে পিছনে রেখে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর কবরকে সামনে রেখে দো'আ করা। যা করলে পুলিশ বাধা দেয় ও মুখ ঘুরিয়ে কা'বার দিকে করে দেয়।

(৩) মসজিদে নববীর পার্শ্বে 'আলী মসজিদ, আবুবকর মসজিদ ইত্যাদিতে তালাবদ্ধ থাকা সত্ত্বেও ছালাত আদায় করা।

(৪) মসজিদে নববীর খুঁটিকে 'হান্না খুটি' 'আয়েশা খুটি' ইত্যাদি মনে করে জড়িয়ে ধরে এর অসীলায় দো'আ করা ইত্যাদি।

এ ছিল আমার দেখা মক্কা-মদীনায় হজ্জ-এর নামে করা শরীয়ত গর্হিত আমলের কিছু ছিটেফোঁটা। এতদ্ব্যতীত আমার চোখে পড়েনি এমন অসংখ্য কার্যক্রম থাকাও অস্বাভাবিক নয়। এক কথায় পবিত্র স্থান পেয়ে মনের মাধুরী মিশিয়ে যা ইচ্ছে তাই করা হচ্ছে। ফলে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছ সম্মত হজ্জ থেকে আমরা মাহরূম হচ্ছি।

অতএব উপরোক্ত ত্রুটি থেকে মুক্ত হয়ে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছ মোতাবেক হজ্জ করার তাওফীক আল্লাহ আমাদেরকে দান করুন-আমীন!!

রাজশাহী থাই এ্যালুমিনিয়াম এ্যান্ড গ্লাস সেন্টার

এজেন্টঃ কাই বাংলাদেশ এ্যালুমিনিয়াম লিমিটেড

(দেশী-বিদেশী এ্যালুমিনিয়াম এবং কাঁচ খুচরা ও পাইকারী বিক্রেতা)

- ❒ এ্যালুমিনিয়াম জানালা, দরজা, পার্টিশান।
- ❒ ফল্‌সসিলিং, অল-সোকেস, কাউন্টার।
- ❒ মোজাইক কাঁচ, বেসিনের কাঁচ, লুকিং গ্লাস।
- ❒ এ্যালুমিনিয়ামের যাবতীয় ফিটিং।
- ❒ পর্দার রেল ইত্যাদি প্রস্তুতকারী ও বিক্রেতা।

বিল সিমলা, গ্রেটাররোড, রাজশাহী।

এক নযরে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর হজ্জ

*-মুহাম্মাদ সাঈদুর রহমান**

☆ মীকাত হ'তে এহ্‌রাম বেঁধে 'লাব্বাইকা উমরাতান' অথবা 'আল্লা-হুম্মা লাব্বাইকা উমরাতান' বলে তালবিয়া পড়তে পড়তে কা'বা গৃহে পৌঁছবে। অতঃপর মসজিদে হারামে প্রবেশকালে ডান পা বাড়িয়ে বলবে-

بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم اغفرلى ذنوبى وافتح لى أبواب رحمتك أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وبسلطانه القديم من الشيطان الرجيم-

(বিস্‌মিল্লা-হি ওয়াছছালা-তু ওয়াসসালা-মু আলা রাসূলিল্লা-হি আল্লা-হুম্মাগ্‌ফিরলী যুনূবী ওয়াফতাহ্‌লী আবওয়াবা রাহমাতিকা আ'উযু বিল্লা-হিল আযীম ওয়াবিওয়াজহিহিল কারীম ওয়াবিসুলত্বানিহিল ক্বাদীমি মিনাশ শাইত্বা-নির রাজীম)

☆ 'হাজরে আসওয়াদ' চুম্বন করা সম্ভব না হ'লে 'বিসমিল্লা-হি ওয়াল্লা-হু আকবার' বলে হাত দিয়ে ইশারা করে 'হাজরে আসওয়াদ' হ'তে তাওয়াফ শুরু করে সেখানেই সাত তাওয়াফ সমাপ্ত করবে এবং 'রুকনে ইয়ামানী' ও 'হাজরে আসওয়াদ' -এর মধ্যে ربنا أتنا فى الدنيا حسنة و فى الآخرة حسنة و قنا عذاب النار *(রাব্বানা আ-তিনা ফিদ দুনইয়া হাসানাতাওঁ ওয়া ফিল আখিরাতে হাসানাতাওঁ ওয়া ক্বিনা আযা-বান না-র)* পড়তে হবে।

☆ তাওয়াফ শেষে 'মাকামে ইবরাহীমে' অথবা অন্য কোথাও দু'রাক'আত ছালাত আদায় করবে। অতঃপর যমযমের পানি পান করবে।

☆ অতঃপর প্রথমে 'ছাফা' পাহাড়ে উঠে কা'বার দিকে মুখ করে হাত উঠিয়ে কমপক্ষে তিন বার لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده

(লা ইলা-হা ইল্লাল্লা-হু ওয়াহদাহু আনজাযা ওয়া'দাহু ওয়া নাছারা আবদাহু ওয়া হাযামাল আহযা-বা ওয়াহদাহু)

* গ্রাজুয়েট, কিং সউদ বিশ্ববিদ্যালয়, রিয়াদ, সঊদী আরব ও উপাধ্যক্ষ, আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, নওদাপাড়া, রাজশাহী।

পড়ে 'মারওয়া'র দিকে 'সাঈ' শুরু করবে। অল্প দূর গিয়ে দুই সবুজ চিহ্নের মধ্যে কিছুটা দ্রুত চলবে। তবে মেয়েরা স্বাভাবিক গতিতে চলবে। 'ছাফা' হ'তে 'মারওয়া' পর্যন্ত একবার 'সাঈ' ধরা হবে। এইভাবে সাত বার 'সাঈ' করবে এবং 'মারওয়ায়' গিয়ে 'সাঈ' শেষ হবে।

☆ সাঈ শেষে মাথা মুণ্ডন করতে হবে। আর এটিই উত্তম। তবে সব চুল ছোট করাও জায়েয আছে। মেয়েরা চুলের অগ্রভাগ থেকে এক আঙ্গুলের মাথা বরাবর চুল ছাঁটবে।

☆ 'হজ্জে তামাত্তু' সম্পাদনকারী প্রথমে ওমরাহ শেষে পূর্ণ হালাল হয়ে সাধারণ কাপড় পরিধান করবে। কিন্তু 'হজ্জে ইফরাদ' ও 'ক্বেরান' সম্পাদনকারী এহরাম অবস্থায় থেকে যাবে, যদি সাথে কুরবানীর পশু না থাকে।

☆ ৮ই যুলহিজ্জার দিন মক্কায় স্বীয় আবাসস্থল হ'তে গোসল ও খোশবু লাগিয়ে হজ্জ -এর এহরাম বেঁধে 'লাব্বাইকা হাজ্জান' অথবা 'আল্লা-হুম্মা লাব্বাইকা হাজ্জান' বলে "لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك" বলতে বলতে মিনার দিকে অগ্রসর হবে।

☆ মিনায় পৌঁছে সেখানে যোহ্‌র, আছর, মাগরিব, এশা ও ফজরের ছালাত প্রত্যেক ওয়াক্তের নির্দিষ্ট সময় 'কছর' আদায় করবে। জমা করা চলবে না।

☆ ৯ই তারিখে সূর্যোদয়ের পর নীরবে আরাফার দিকে যাত্রা আরম্ভ করবে। সেখানে গিয়ে দো'আ ও যিকির-আযকার অধিক মাত্রায় করবে এবং মসজিদে নামেরায় আরাফার ভাষণ শেষে সমবেতভাবে সূর্য ঢলার সাথে সাথে যোহর ও আছরের ছালাত কছর ও জমা তাক্বদীম করে আদায় করতে হবে।

সূর্য ডুবার সাথে সাথে মুজদালেফার দিকে রওয়ানা দিতে হবে। আরাফায় মাগরিবের ছালাত আদায় করবে না বা মাগরিবের আগেও সেখান থেকে মুযদালিফায় রওয়ানা দিবে না।

☆ মুজদালিফায় পৌঁছে এক আযান ও দুই একামতে মাগরিব ও এশার ছালাত আদায় করবে। এ সময় মাগরিব ৩ রাক'আত ও এশার দু'রাক'আত কছর ছালাত পড়তে হবে। অতঃপর রাতে বিশ্রাম নিয়ে ফজরের দু'রাক'আত ছালাত আদায় করে ফর্সা হ'লে পুনরায় মিনার দিকে অগ্রসর হবে। মুজদালেফা হ'তে ৭টি কংকর সংগ্রহ করে সাথে নিয়ে আসবে।

☆ মিনায় পৌঁছে প্রথমে 'জামারাতুল আকাবা'তে গিয়ে ৭টি কংকর নিক্ষেপ করবে এবং প্রত্যেকবার 'আল্লাহু আকবার' বলবে। কংকর মারা হ'লে কুরবানী থাকলে যবেহ করতে হবে এবং মাথা মুণ্ডন বা চুল ছোট করে কাটতে হবে।

☆ অতঃপর হালাল হয়ে এহরাম খুলে সাধারণ কাপড় পরে আবার কা'বার দিকে রওয়ানা দিতে হবে 'তাওয়াফে ইফাযা' করার জন্য।

☆ 'তাওয়াফে ইফাযা' করে তামাত্তু হজ্জ সম্পাদনকারীকে পরে ছাফা-মারওয়া সাঈ করতে হবে। আর হজ্জে ক্বেরান কিংবা ইফরাদ সম্পাদনকারী প্রথমে মক্কায় পৌঁছে 'তাওয়াফে কুদুম' করে থাকলে শেষে 'তাওয়াফে ইফাযা'র পর সাঈ করবে না।

☆ কা'বা থেকে সেদিনই মিনায় চলে যাবে এবং সেখানে বিশ্রাম নিবে ও ১১, ১২ ও ১৩ তারিখে কেবল কংকর নিক্ষেপ করবে।

☆ ১১ তারিখে দুপুরে সূর্য ঢলার পর ২১টি কংকর সাথে নিয়ে ১ম জামারাতুল আকাবাতে ৭টি নিক্ষেপ করবে। অতঃপর ২য়টিতে ৭টি ও ৩য়টিতে ৭টি কংকর মারবে এবং প্রত্যেক বার 'আল্লাহু আকবার' বলবে।

☆ ১২ তারিখে ১১ তারিখের ন্যায় ২১টি কংকর মারবে। ১২ তারিখে কংকর মারার পর সূর্য ডুবার আগেই যদি কেউ ফিরতে চায় তবে ফিরতে পারে। আর যদি ১২ তারিখে সূর্য মিনায় ডুবে যায় তাহ'লে তাকে তথায় অবস্থান করে ১৩ তারিখে কংকর মেরে আসতে হবে।

☆ ১২ বা ১৩ তারিখে কংকর মারার পর কা'বা গৃহে এসে 'তাওয়াফে বিদা' বা বিদায়ী তাওয়াফ করতে হবে। শুধুমাত্র ঋতুবর্তী ও নেফাস ওয়ালী মেয়েদের জন্য এটা মাফ। 'তাওয়াফে বিদা'র মাধ্যমে হজ্জ সমাপ্ত হবে ইনশাআল্লাহ।[১০]

আল্লাহ সকলকে হজ্জে গমন করার এবং মহানবী (ছাঃ)-এর তরীকা মোতাবেক হজ্জ সম্পাদন করার তাওফীক দান করুন- আমীন!!

১০. মিশকাত হা/২৫৫৫; 'বিদায় হজ্জের বিবরণ' অনুচ্ছেদ।

মনীষী চরিত

ইবনু হাজার আসক্বালানী (রহঃ)

*-নূরুল ইসলাম**

উপক্রমণিকাঃ মানবতার মুক্তির দিশারী হযরত মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর তিরোধানের পর হিজরী সালের অষ্টম শতাব্দীতে যে সব প্রখর প্রতিভাধর মহামনীষী তাঁরই আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে আজীবন জ্ঞান সাধনার পাশাপাশি মুসলিম উম্মাহ্র জন্য জ্ঞানের (বিশেষতঃ হাদীছ শাস্ত্রের) এক সমৃদ্ধ ভাণ্ডার উপহার দিয়ে গেছেন, ইবনু হাজার আসক্বালানী ছিলেন তাদের অন্যতম ব্যক্তিত্ব। তিনি একাধারে মুহাদ্দিছ বিচারক, ফক্বীহ, ঐতিহাসিক, রিজালবিদ, পরীক্ষক, কবি এবং মুসলিম ধর্মীয় পাণ্ডিত্যের সর্বাপেক্ষা আদর্শ প্রতিনিধি ছিলেন। যাঁকে সকলে এক বাক্যে 'হাফেয' বলে চিনে, জানে এবং মানে। এ মর্মে আল্লামা শাওকানী তাঁর بَدْرُ الطَّالِع গ্রন্থে যথার্থই বলেছেন- وشهد له بالحفظ والإتقان القريب والبعيد والعدو والصديق حتى صار اطلاق لفظ الحافظ عليه كلمة اجماع

অর্থাৎ 'প্রত্যেক নিকটবর্তী, দূরবর্তী, শত্রু ও মিত্র সকলেই তাঁর মুখস্থশক্তি ও বিশ্বস্ততার সাক্ষ্য দিয়েছেন। এমনকি 'হাফেয' উপাধিটি তাঁর জন্য একটি সর্বসম্মত উপাধিতে পরিণত হয়েছে'।[১]

নাম ও বংশ পরিচয়ঃ তাঁর নাম আহমাদ, উপনাম আবুল ফযল, উপাধি শিহাবুদ্দীন। ইবনু হাজার তাঁর পরিচিতিগত নাম।[২] বংশ পরিচয় হ'লঃ আহমাদ ইবনে আলী ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে আলী ইবনে আহমাদ আল-কেনানী আল-আসক্বালানী আল-মিসরী আশ-শাফেঈ।[৩] মতান্তরে, আহমাদ ইবনে আলী ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে আলী ইবনে মাহমূদ ইবনে আহমাদ ইবনে হাজার।[৪] হাফেয সাখাবীর বর্ণনা মতে, ইবনু হাজারের 'হাজার' শব্দটি ছিল তাঁর ঊর্ধ্বতন কোন পূর্বপুরুষের উপাধি। ইবনু হাজার 'বনু কেনানা' বংশোদ্ভূত। 'বনু কেনানা' ছিল আরব দেশের একটি প্রসিদ্ধ গোত্র। তাঁর ঊর্ধ্বতন পূর্বপুরুষেরা ছিলেন সিরিয়ার একটি প্রসিদ্ধ শহর 'আসক্বালান'-এর অধিবাসী। এই দিক দিয়ে ইবনু হাজার 'আসক্বালানী' রূপে পরিচিত।[৫]

ইসলামী বিশ্বকোষে বলা হয়েছে- 'তিনি নিজে তাঁর পারিবারিক নাম 'ইবনু হাজার'-এর উৎপত্তি জানতেন না। পারিবারিক কিংবদন্তী অনুসারে 'আসক্বালানী' সম্বন্ধটি ৫৮৭/১১৯১ সন হ'তেই চলে আসছে। ছালাহুদ্দীন যখন 'আসক্বালান'-কে ধ্বংস করে উহার মুসলিম অধিবাসীদেরকে অন্যত্র পুনর্বাসনের নির্দেশ দেন, তখন ইবনু হাজারের পূর্বপুরুষগণ প্রথমে আলেকজান্দ্রিয়া এবং পরে কায়রো গমন করেন।[৬] আর তাঁকে মিসরী এ জন্য বলা হয় যে, মিসর হচ্ছে তাঁর জন্মস্থান, বড় হবার স্থান ও মৃত্যুস্থান এবং সেখানে তাঁর পৈতৃক ভিটাবাড়ীও ছিল।[৭]

জন্ম ও শৈশবঃ তাঁর জন্ম তারিখ নিয়ে মতভেদ বিদ্যমান। তিনি ১২ শা'বান, ৭৭৩ হিঃ/মোতাবেক ১৮ই ফেব্রুয়ারী, ১৩৭২ খৃঃ[৮] (মতান্তরে ১০ শা'বান[৯] অথবা ২২ শা'বান[১০] অথবা ২৩ শা'বান ৭৭৩ হিঃ[১১]) মিসরের আল-আতীক্বাহ (প্রাচীন কায়রো -Old Cairo)- নগরীতে জন্মগ্রহণ করেন।[১২]

---

* *আলিম ১ম বর্ষ, আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, নওদাপাড়া, রাজশাহী।*

১. *আব্দুর রহমান ইবনে আব্দির রহীম আল-মুবারকপুরী, তুহফাতুল আহওয়াযী বে-শারহে জামে' আত-তিরমিযী (বৈরুত- লেবাননঃ দারুল কুতুব আল-ইলমিইয়াহ, প্রথম প্রকাশঃ ১৪১০হি/১৯৯০ইং) মুক্বাদ্দামা, ১ম খণ্ড, পৃঃ ৩০০।*

২. *মাওলানা মুহাম্মাদ আব্দুর রশীদ নু'মানী, নিবন্ধঃ হায়াতে হাফেয ইবনে হাজার আসক্বালানী, মাকাতাবায়ে থানবী, দেওবন্দ থেকে প্রকাশিত উর্দূ-আরবী বুলূগুল মারাম মিন আদিল্লাতিল আহকাম-এর সাথে মুদ্রিত, তাবি, পৃঃ ২৭।*

৩. *আব্দুল হাই ইবনুল ঈমাদ হাম্বালী, শাযারাতুয যাহাব ফী আখবারে মান যাহাব (বৈরুতঃ দারুল ফিকর, প্রথম প্রকাশঃ ১৩৯৯ হিঃ/১৯৭৯ ইং), ৪র্থ জিলদ, ৭ম জুয, পৃঃ ২৭০।*

৪. *শাহ আব্দুল আযীয মুহাদ্দিছ দেহলবী, বুসতানুল মুহাদ্দিছীন, (ফারসী), উর্দূ অনুবাদঃ মাওলানা আব্দুস সামী' দেওবন্দী, (পাকিস্তানঃ এইচ, এম, সাঈদ কোম্পানী, আদাব মানযিল করাচী, তা. বি.) পৃঃ ৩০২।*

৫. *মাওলানা মুহাম্মাদ হানীফ গাঙ্গোহী, যাফরুল মুহাছছেলীন বাআহওয়ালিল মুছান্নেফীন, (দেওবন্দঃ হানীফ বুক ডিপো, ১৯৯৬ ইং) পৃঃ ২৩১।*

৬. *ইসলামী বিশ্বকোষ, (ঢাকাঃ ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৮৮ ইং) ৪র্থ খণ্ড, পৃঃ ২১০।*

৭. *শাযারাতুয যাহাব পৃঃ ২৭০।*

৮. *দায়েরায়ে মা'আরেফে ইসলামিইয়াহ (লাহোরঃ দানেশগাহে পাঞ্জাব, ১ম প্রকাশঃ আগষ্ট ১৯৬২), ১ম খণ্ড, পৃঃ ৪৭৯; আল্লামা জালালুদ্দীন সুয়ূত্বী, নাযমুল ইক্বয়ান ফী আ'ইয়ানিল আ'ইয়ান, সম্পাদনাঃ ডঃ ফিলিপ হিট্টি, (নিউইয়র্কঃ আল-মাতবা'আতুস্ সূরিইয়াহ আল-আমরীকিইয়াহ, তাবি), পৃঃ ৪৫।*

৯. *আত্-তাবারুরুল মাসবূক, সংগৃহীতঃ মাওলানা ছফিউর রহমান মুবারকপুরী, ইত্তেহাফুল কেরাম শারহু বুলূগিল মারাম মিন আদিল্লাতিল আহকাম (দামেশকঃ মাকতাবাতু দারিল ফীহা, ১৪১৪ হিঃ/১৯৯৪ খৃঃ), পৃঃ ৫।*

১০. *আব্বাস আল-আজাবী, তারীখুল আদাবিল আরাবী ফিল ইরাক্ব, (ইরাক্বঃ মাতবা'আতুল মাজমা'অ আল-ইলমী আল-ইরাক্বী, ১৩৮০ হিঃ/১৯৬০ খৃঃ), ১ম খণ্ড, পৃঃ ৮৩।*

১১. *বুসতানুল মুহাদ্দিছীন, পৃঃ ৩০২।*

১২. *জুরজী যায়দান, তারীখু আদাবিল লুগাতিল আরাবিইয়াহ (কায়রোঃ দারুল হিলাল, ১৯৫৭ খৃঃ), ৩য় খণ্ড, পৃঃ ১৭৯।*

শৈশবেই পিতা-মাতার মৃত্যুর ফলে তাঁদের স্নেহচ্ছায়া থেকে বঞ্চিত হন।[১৩] পিতার মৃত্যুর সময় তাঁর বয়স ছিল প্রায় ৪ বৎসর। এ সম্পর্কে তিনি নিজেই বলেছেন- 'যখন আমার পিতা মারা যান তখন আমার বয়স ৪ বৎসরও পূর্ণ হয়নি। আজ সেই স্মৃতি আমার কাছে একটি স্বপ্নের ন্যায় স্মরণ আছে। এমনিভাবেই স্মরণ আছে যে, তিনি বলেছিলেন, 'আমার ছেলে ইবনু হাজারের উপনাম আবুল ফযল'।[১৪] তাঁর পিতা ফিকহ, আরবী সাহিত্যের গদ্য-পদ্য এবং ইলমে ক্বিরআতে বিশেষ পারদর্শী ছিলেন।[১৫] সাথে সাথে তিনি ফৎওয়া প্রদান ও অধ্যাপনায় সনদ প্রাপ্ত ছিলেন।[১৬]

শিক্ষা জীবনঃ পাঁচ বৎসর বয়সে তিনি বিদ্যালয়ে ভর্তি হন।[১৭] তিনি ছিলেন প্রখর মেধাবী। এ সম্পর্কে ইমাম সুয়ূত্বী (রহঃ)-এর উক্তিটি প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেন,

له الحفظ الواسع الذى اذا وصفته فحدث عن البحر بن حجر لاحرج" অর্থাৎ- 'তাঁর মুখস্থশক্তি এতই প্রশস্ত ছিল যে, নিঃসন্দেহে তাঁর গুণাগুণ বর্ণনা করার সময় বাহার বিন হাজার তথা সমুদ্রের সাথে তুলনা করা যায়'।[১৮] ইমাম সুয়ূত্বীর এ উক্তি থেকে প্রতীয়মান হয় যে, তাঁর মুখস্থশক্তি ছিল অপ্রতুল। এটা ছিল সম্পূর্ণ আল্লাহ প্রদত্ত। বর্ণিত আছে যে, তিনি মুখস্থ শক্তিতে ইমাম যাহাবী (রহঃ)-এর সমতুল্য হবার মানসে যমযম কূপের পানি পান করেছিলেন। তাঁর এই স্বপ্ন পূরণ হয়েছিল।[১৯]

তিনি ৯ বৎসর বয়সে ফক্বীহ সাদরুদ্দীন আস্-সাকূতী (রহঃ) (মুখতাছার তাবরীযীর ভাষ্যকার)-এর নিকট পবিত্র কুরআন মাজীদ হিফ্য করেন।[২০]

অল্প সময়ে ফিক্হ, ছরফ ও নাহুর প্রাথমিক কিতাবগুলোর উপর যোগ্যতা অর্জন করেন। অতঃপর তিনি সমসাময়িক বিশিষ্ট শিক্ষক মণ্ডলীর নিকট নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত বিভিন্ন বিষয়ে জ্ঞানার্জন করতে থাকেন। মূলতঃ হাদীছ এবং ফিক্হ শাস্ত্র তিনি সিরাজুদ্দীন বুলাক্বীনী ইবনে আল-মুলাকক্বীন এবং ইয্যুদ্দীন ইবনে জামা'আহ-এর নিকট অধ্যয়ন করেন। তানূখীর নিকট ইলমে ক্বিরাআত, মুহিবুদ্দীন ইবনে হিশাম-এর নিকট আরবী সাহিত্য এবং বিশ্বখ্যাত আরবী অভিধান 'কামূস' প্রণেতা আল্লামা ফিরূযাবাদীর নিকট ইলমে লুগাত অধ্যয়ন করেন।

৭৯৩ হিজরী থেকে তিনি নিজেকে সর্বতোভাবে হাদীছ চর্চায় নিয়োজিত করেন। এতদুদ্দেশ্যে তিনি মিসর, শাম, হেজাজ এবং ইয়ামেনে বেশ কয়েকবার সফর করেন এবং সেখানকার বিদগ্ধ পণ্ডিতদের সাথে সাক্ষাত করেন। তিনি ধারাবাহিকভাবে ১০ বৎসর পর্যন্ত যায়নুদ্দীন ইরাক্বী (রহঃ)-এর নিকট হাদীছ শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন এবং তাঁর অধিকাংশ শিক্ষকই তাঁকে ফৎওয়া প্রদান ও পাঠদানের অনুমতি দান করেন।[২১]

হাদীছ শাস্ত্র অধ্যয়নে ইবনু হাজারের বিস্ময় সৃষ্টিঃ হাদীছ শাস্ত্র অধ্যয়নে তিনি এক অবিশ্বাস্য বিস্ময় সৃষ্টি করেন। বাহ্যদৃষ্টিতে তা বিশ্বাসযোগ্য না হ'লেও এর সত্যতা তাঁর স্বনামধন্য ছাত্রদের দ্বারা স্বতঃসিদ্ধ প্রমাণিত। মুহাদ্দিছ শাহ আব্দুল আযীয (রহঃ) বলেন, 'তিনি সুনানে ইবনে মাজাহ চার বৈঠকে, ছহীহ মুসলিম সমাপ্তি বৈঠক ব্যতীত চার বৈঠক অর্থাৎ দু'দিন কয়েক ঘন্টায় সমাপ্ত করেন।[২২] সুনানে কাবীর নাসাঈ দশ বৈঠকে শারফুদ্দীন বিন কোবাক-এর নিকট অধ্যয়ন করেন। মু'জামে ছাগীর ত্বাবারাণী (যার মধ্যে ১৫০০ হাদীছ সনদসহ রয়েছে) যোহর এবং আছরের মধ্যস্থিত এক বৈঠকে সমাপ্ত করেন। তাছাড়া ছহীহ বুখারী দশ বৈঠকে সমাপ্ত করেন।[২৩]

শিক্ষক মণ্ডলীঃ ইবনু হাজার আসক্বালানীর শিক্ষক মণ্ডলীর সংখ্যা ছিল অগণিত। তাঁদের সকলের নাম গণনা করা অসম্ভব। এজন্যই হাফেয ইবনু ফাহাদ যুক্তি সঙ্গত ভাবেই বলেছেন, ومسموعاته ومشائخه كثيرة جدا لا توصف ولا تدخل تحت الحصر-[২৪]

তিনি তাঁর উস্তাযগণের নিকট যেমন শিক্ষা গ্রহণ করেছেন, তেমনি তাঁর নিচু পর্যায়ের ও সমসাময়িক হাদীছ বেত্তাদের নিকটও প্রয়োজনে উপকার গ্রহণ করতে দ্বিধাবোধ করেননি। তাঁর ঘনিষ্ঠ ছাত্র হাফেয সাখাবী বলেন, وكثيرا جدا من المسموع والشيوخ فسمع العالى والنازل واخذ عن الشيوخ والاقران فمن دونهم-[২৫]

১৩. *দায়েরায়ে মা'আরেফে ইসলামিইয়াহ, ১ম খণ্ড, পৃঃ ৪৭৯।*
১৪. *আহওয়ালুল মুছান্নেফীন, পৃঃ ২৩১।*
১৫. *আররাওয আল-বাসসাম মিন তারজামাতে বুলূগিল মারাম ওয়া তারজামাতুল ইমাম ইবনে হাজার আল-আসক্বালানী, সম্পাদনাঃ কুতুবখানা রশীদিইয়াহ সম্পাদনা পরিষদ, নুখবাতুল ফিকর ও বুলূগুল মারাম সহ, (দিল্লীঃ কুতুবখানা রশীদিইয়াহ, ১ম প্রকাশঃ ১৩৮৭ হিঃ/১৯৬৮ খৃঃ) পৃঃ ৬।*
১৬. *দায়েরায়ে মা'আরেফে ইসলামিইয়াহ, ১ম খণ্ড, পৃঃ ৪৭৯।*
১৭. *হায়াতে ইবনে হাজার শীর্ষক নিবন্ধ, পৃঃ ২৮।*
১৮. *আহওয়ালুল মুছান্নেফীন, পৃঃ ২৩৬।*
১৯. *তুহফাতুল আহওয়াযী, ১ম খণ্ড, মুক্বাদ্দামা, পৃঃ ২৯৯।*
২০. *আর-রাওয আল-বাসসাম, পৃঃ ৭।*
২১. *দায়েরায়ে মা'আরেফে ইসলামিইয়াহ, ১ম খণ্ড, পৃঃ ৪৭৯-৪৮০।*
২২. *বুসতানুল মুহাদ্দিছীন, পৃঃ ৩০২; এজন্য তিনি গর্ব করে বলতেন- قرأت بجمد الله جامع مسلم + بجوف دمشق كرش الإسلام لى ناصر الدين الإمام بن جهبل + بحضرة حفاظ مجاميع الإعلام وتم بتوفيق الاله وفضله + قراءة ضبط فى ثلثة ايام দ্রঃ ঐ, পৃঃ ৩০৩।*
২৩. *ঐ, পৃঃ ৩০৩।*
২৪. *হায়াতে ইবনে হাজার শীর্ষক নিবন্ধ, পৃঃ ৩০।*
২৫. *ঐ, পৃঃ ৩০।*

তাঁর প্রসিদ্ধ কয়েকজন শিক্ষকের নাম ও তালিকা নিম্নরূপঃ

কায়রোঃ সিরাজুদ্দীন বুলাক্বীনী, হাফেয ইবনুল মুলাকক্বীন, হাফেয যায়নুদ্দীন ইরাক্বী, বুরহানুদ্দীন আবনাসী, নূরুদ্দীন হায়ছামী প্রমুখ।

সারয়াকূসঃ সাদরুদ্দীন আল-আবশীত্বী।

গাযাহঃ আহমাদ বিন মুহাম্মাদ আল-খালীলী।

রামলাহঃ আহমাদ বিন মুহাম্মাদ আল-আয়কী।

আল-খলীলঃ ছালেহ বিন খলীল বিন সালেম।

বায়তুল মুক্বাদ্দাসঃ শামসুদ্দীন আল-ক্বালক্বাশান্দী, বাদরুদ্দীন বিন মাক্বী, মুহাম্মাদ আল-মুমবেজী ও মুহাম্মাদ বিন উমর বিন মূসা প্রমুখ।

দামেশকঃ বাদরুদ্দীন বিন কাওয়াম আল-বালেসী, ফাতিমা বিনতে আল-মুনজা আত-তানূখিইয়াহ, ফাতিমা বিনতে আব্দিল হাদী, 'আয়েশা বিনতে আব্দিল হাদী ও অন্যান্য।

মিনাঃ যায়নুদ্দীন আবী বাকার বিন আল-হুসাইন।[২৬]

নির্দিষ্ট শিক্ষকঃ জীবনে যারা শিক্ষা-দীক্ষায় মর্যাদার ময়ূর সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হন, তাদের প্রত্যেকের একজন হিতাকাঙ্খী শিক্ষক থাকেন। এটা অনেকটাই স্বাভাবিক ব্যাপার। অন্যান্য শিক্ষকদের তুলনায় তিনি তার প্রিয়পাত্র হন এবং তার সান্নিধ্যে ইলম অর্জন করেন। বড় বড় মনীষীদের জীবনী পর্যালোচনা করলে এরূপ অনেক হিতাকাঙ্খী দৃষ্টিগোচর হয়। ইবনু হাজারের বেলায়ও এর ব্যতিক্রম হয়নি।

তিনি অগণিত শিক্ষক মহোদয়ের কাছ থেকে হাদীছ শাস্ত্রের জ্ঞানার্জন করেন। কিন্তু বিশেষভাবে এ শাস্ত্রে যিনি তাঁকে সুদীর্ঘ ১০ বৎসর ধারাবাহিকভাবে শিক্ষা দেন, তিনি হ'লেন হাফেয যায়নুদ্দীন ইরাক্বী (রহঃ)। হাফেয সাখাবী (রহঃ) বলেন-

فعكف على الزين العراقى وتخرج به وانتفع بملازمته–

'অতঃপর তিনি যায়নুদ্দীন ইরাক্বীর সান্নিধ্যে এসে এ বিষয়ে শিক্ষা লাভ করেন এবং তাঁর সাহচর্যের দ্বারা উপকৃত হন'।[২৭] তাঁর কাছে তিনি হাদীছ শাস্ত্রের ছোট-বড় অনেক কিতাব অধ্যয়ন করেন এবং তিনিই তাঁকে প্রথম হাদীছ পড়ানোর অনুমতি দান করেন।[২৮]

২৬. *শাযারাতুয যাহাব ৪র্থ জিলদ, ৭ম জুয, পৃঃ ২৭১।*
২৭. *আহওয়ালুল মুছান্নেফীন, পৃঃ ২৩৫; আল্লামা সুয়ূত্বী বলেন-*
ولازم حافظ عصره زين الدين العراقى حتى تخرج به، وكب عليه اكبابا لا مزيد عليه حتى رأس فيه فى حياة شيوخه حتى شهدوا له بالحفظ–
দ্রঃ নাযমুল ইক্বয়ান ফি আ'ইয়ানিল আ'ইয়ান, পৃঃ ৪৫।
২৮. *আহওয়ালুল মুছান্নেফীন, পৃঃ ২৩৫।*

কর্মজীবনঃ হাফেয ইবনু হাজার কর্মজীবনের বৃহত্তর অংশ ইলমে দ্বীন, বিশেষতঃ হাদীছ শাস্ত্রের অনুশীলন, হাদীছের দরস-তাদরীস তথা পঠন-পাঠন, হাদীছ গ্রন্থের সংকলন, প্রচার ও প্রকাশ এবং হাদীছ গ্রন্থের অতুল্য ব্যাখ্যা গ্রন্থসহ বহু সংখ্যক মৌলিক গ্রন্থ রচনা ও হাদীছ ভিত্তিক ফৎওয়া প্রদানে অতিবাহিত হয়েছে। এ প্রসঙ্গে Incyclopaedia of Islam- **গ্রন্থে যথার্থই বলা হয়েছে-** Whose life work constitues the final summation of the science of hadith.[২৯]

এছাড়া তিনি কায়রো শহরের প্রসিদ্ধ মাদরাসা সমূহে দীর্ঘকাল যাবত তাফসীর, হাদীছ এবং ফিক্বহ শিক্ষা দিয়েছেন। বস্তুত তিনি হাসীনিইয়াহ এবং মানছূরিইয়াহ্-তে তাফসীর, বাইবারাসিইয়াহ, জামালিইয়াহ, হাসানিইয়াহ, যায়নাবিইয়াহ, শাইখুনিইয়াহ, জামে' তুলুন ও কুব্বাহ্ মানছূরিইয়াহ-তে হাদীছের দরস দিয়েছেন। আর খারুবিইয়াহ নাযেমিইয়াহ, ছালাহিইয়াহ এবং মুয়াইয়েদিইয়াহ-তে ফিক্বহ -এর তা'লীম দেন। বাইবারাসিইয়াহর প্রিন্সিপ্যাল এবং শায়খও ছিলেন। 'দারুল আদল'-এ ফৎওয়া প্রদানের দায়িত্বও তাঁর উপর ন্যস্ত ছিল। জামে' আযহার এবং তারপরে জামে' আমর বিন আস (রাঃ)-এর খত্বীব ছিলেন।[৩০] তাছাড়া তিনি মাহমূদিইয়াহ-তে গ্রন্থাগারিকের দায়িত্বও পালন করেন। Incyclopaedia of Islam এ বলা হয়েছে-

In 826/1423. he took over the administration of the library of the Mahmuddiyya with its approximately 4000 valuable manuscripts. During his librarianship, which lasted until his death, he compiled two catalogues, one arranged alphabetically and the other according to topics.[৩১]

এতদ্ব্যতীত তিনি সহস্রাধিক 'ইমালা'র মজলিস পরিচালনা করেন।[৩২]

২৯. *The Encyclopaedia of Islam (Leiden: E.J. Brill, New edition 1979), V. 111, P. 776.*
৩০. *হায়াতে ইবনে হাজার শীর্ষক নিবন্ধ, পৃঃ ৩৪; Incyclopaedia of Islam-এ বলা হয়েছে- And that of associate preacher and imam in the mosque of Al-Azhar and the mosque of 'Amr. See: V. III. P. 777.*
৩১. *Ibid. P. 777.*
৩২. *মাওলানা মুশতাক আহমাদ ও মুহাম্মাদ আব্দুর রশীদ, প্রবন্ধঃ পবিত্র হাদীস গ্রন্থাবলীর পরিচিতি ও শ্রেণী বিভাগ, ইসলামিক ফাউণ্ডেশন ত্রৈমাসিক গবেষণা পত্রিকা, ৩৭ বর্ষ ৪র্থ সংখ্যা, এপ্রিল-জুন ১৯৯৮, পৃঃ ৪৭; মাওলানা আব্দুর রহমান মুবারকপুরীও অনুরূপ বলেছেন। তাঁর ভাষায়-*
وأملى اكثر من ألف مجلس
দেখুনঃ তুহফাতুল আহওয়াযী, মুক্বাদ্দামা, ১ম খণ্ড, পৃঃ ২৯৯, উল্লেখ্য যে, আরবী أَلْأَمَالِىْ -এর বহুবচন أمَالِى, এর অর্থ কোন কিছু লিখানো। অর্থাৎ অপরের দ্বারা লিখানোর জন্য বলা বা পাঠ করা, যাকে ইংরেজীতে বলে ডিক্টেট। প্রাচীনকালে হাদীছ

কাযীর দায়িত্ব পালনঃ বার বার তিনি বিচারপতির দায়িত্ব পালনে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করেন। অবশেষে তাঁর বন্ধু কাযীউল কুযাত (প্রধান বিচারপতি) জামালুদ্দীন আল-বুলাক্বীনীর অনুরোধে তাঁর সহকারী হ'তে সম্মত হন। ৮২৭ হিজরীর (১৪২৩ খৃঃ) মুহাররম/ডিসেম্বর মাসে তিনি প্রধান বিচারপতির পদ অলংকৃত করেন এবং প্রায় ২১ বছর এই মহান দায়িত্বে বহাল থাকেন। যদিও এ সুদীর্ঘ সময়ে তিনি একাধিকবার পদচ্যুত ও পুনর্বহাল হন।[৩৩]

পাণ্ডিত্যঃ ইবনু হাজার জ্ঞানের জগতের এক উজ্জ্বল ধ্রুবতারা ছিলেন। তাঁর সুদীর্ঘ শিক্ষকতা জীবনে অনেক ছাত্র তাঁর কাছে জ্ঞানার্জন করে। তাঁর স্বনামধন্য ছাত্র হাফেয সাখাবী বলেন, 'ছাত্র সংখ্যা অধিক হবার ফলে তাদের গণনা করা অসম্ভব। প্রত্যেক মাযহাবের বিদ্বানগণই তাঁর ছাত্রদের মাঝে শামিল'।[৩৪] তন্মধ্যে মুহাম্মাদ বিন আব্দুর রহমান সাখাবী (জন্মঃ ৮৩১ হিঃ, মৃত্যুঃ ১৬ শা'বান ৯০২ হিঃ), বুরহানুদ্দীন ইবরাহীম বিন উমর বাক্বাঈ (জন্মঃ ৮০৯ হিঃ, মৃত্যুঃ ৮৮৫ হিঃ), হাফেয উমর বিন ফাহাদ মাক্কী ও ক্বাযী যাকারিয়া বিন মুহাম্মাদ আনসারী (জন্মঃ ৮২৪ হিঃ, মৃত্যুঃ ৯২৬ হিঃ) বিশেষভাবে প্রসিদ্ধ ছিলেন।[৩৫]

রচনাবলীঃ শাহ আব্দুল আযীয মুহাদ্দিছ দেহলবী বলেন, ইবনু হাজারের রচনাবলী দেড় শতাধিক।[৩৬] হাফেয সাখাবীও অনুরূপ বলেছেন।[৩৭] হাফেয সুয়ূত্বীর মতে, ১৮৩ ও ইবনুল ঈমাদ হাম্বালী ৭২টি কিতাবের নাম লিখেছেন।[৩৮] তন্মধ্যে নিম্নে কয়েকটি উল্লেখ করা হলঃ-

১- তা'লীকুত-তা'লীক্ব। এটিই তাঁর প্রথম রচিত কিতাব। এটি একটি চমৎকার কিতাব।[৩৯]

২- ফাৎহুল বারী ফী শারহে ছাহীহিল বুখারী। এ গ্রন্থ সম্পর্কে মাওলানা মুহাম্মাদ হানীফ গাঙ্গোহী (রহঃ) বলেন, 'এই অতুলনীয় কিতাবই হাফেয ইবনু হাজারকে হাদীছ শাস্ত্রে জীবিত ও প্রতিষ্ঠিত করে দিয়েছে'।[৪০] মাওলানা আব্দুর রহমান মুবারকপুরী বলেন, 'এতে কোন সন্দেহ নেই যে, ফাৎহুল বারী-ই তাঁর রচিত সর্বশ্রেষ্ঠ কিতাব'।[৪১]

শিক্ষাদানের পদ্ধতি ভিন্ন রকমের ছিল। সেকালে উস্তাদ নির্দিষ্ট কোন সময়ে নিজের মুখস্থ হাদীছ সমূহ লেখানোর মজলিস করতেন। তাঁদের এ সকল মজলিসে দূর-দূরান্তের বহু শিক্ষার্থী জমায়েত হ'ত। উস্তাদ হাদীছ বলতেন আর ছাত্ররা শুনে শুনে তা লিখে নিত। এভাবে ছাত্রদের কাছে যে পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত হ'ত, সেসবকে সে উস্তাদের 'আমালী' বলা হ'ত। দ্রঃ ইসলামিক ফাউণ্ডেশন ত্রৈমাসিক গবেষণা পত্রিকা, ঐ, পৃঃ ৪৭।

৩৩. *দায়েরায়ে মা'আরেফে ইসলামিইয়াহ, ১ম খণ্ড, পৃঃ ৪৮০।*
৩৪. *আহওয়ালুল মুছান্নেফীন, পৃঃ ২৪০।*
৩৫. *ঐ, পৃঃ ২৪০-২৪১।*
৩৬. *বুসতানুল মুহাদ্দিছীন, পৃঃ ৩০৫।*
৩৭. *আহওয়ালুল মুছান্নেফীন, পৃঃ ২৪৭।*
৩৮. *শাযারাতুয যাহাব, ৪র্থ জিলদ, ৭ম জুয, পৃঃ ২৭১-২৭৩।*
৩৯. *ঐ, পৃঃ ২৭১।*
৪০. *আহওয়ালুল মুছান্নেফীন, পৃঃ ২৪৮।*
৪১. *তুহফাতুল আহওয়াযী, মুক্বাদ্দামা, ১ম খণ্ড, পৃঃ ৩০১।*

ইবনু হাজার নিজেও ফাৎহুল বারী, তা'লীকুত-তা'লীক্ব ও নুখবাতুল ফিকর-এর প্রশংসা করেছেন।[৪২]

৩- তাহযীবুত তাহযীব (রাবীদের জীবনী কোষ)।

৪- লিসানুল মীযান (দূর্বল রাবীদের জীবনী কোষ)।

৫- আল-ইছাবা ফী তামযীযিছ ছাহাবা (ছাহাবীদের জীবন চরিত)।

৬- আদ্-দুরারুল কামেনাহ ফী আ'ইয়ানিল মিয়াতিছ ছামেনাহ।

৭- আমবাউল গুমূর বেআবনাইল উমুর।

৮- আল-লুবাব ফী শারহে কাওলিত্-তিরমিযী ফিল বাব।

৯- আদ্-দেরায়াহ ফী মুনতাখাবে তাখরীজে আহাদীছিল হেদায়াহ।

১০- বুলূগুল মারাম মিন আদিল্লাতিল আহকাম।

১১- হেদায়াতুর রুওয়াত ফী তাখরীজে আহাদীছিল মাছাবীহ ওয়াল মিশকাত।

১২- তাশদীদুল ক্বাওস ফী আত্বরাফে মুসনাদিল ফেরদাউস।

১৩- আশ-শামসুল মুনীরাহ ফী তা'রীফিল কাবীরাহ।

১৪- নুযহাতুল আলবাব ফীল আলক্বাব।

১৫- আল-ইফসাহ বে-তাকমীলিন নাকতে 'আলা ইবনিছ ছালাহ।

১৬- তাক্বরীবুত তাহযীব।[৪৩]

আকৃতি ও স্বভাব-চরিত্রঃ তাঁর মুখমণ্ডল ছিল সুদর্শন। তিনি বেঁটে, সাদা দাঁড়িওয়ালা, হালকা-পাতলা দেহাবয়বাধারী, বিশুদ্ধ ভাষী এবং মায়াময় কথক ছিলেন। এ প্রসঙ্গে ইবনুল ঈমাদ হাম্বালী (রহঃ) বলেন,

"وكان رحمه الله تعالى صبيح الوجه للقصر أقرب ذا لحية بيضاء و فى الهامة نحيف الجسم فصيح اللسان شجى الصوت جيدا الذكاء عظيم الحذق" [৪৬]

লী যিন্দেগীতে ইত্তেবায়ে সুন্নাত (হাদীছের অনুসরণ)-এর গুরুত্বের নিদর্শন এমনই ছিল যে, মানুষেরা তাঁর খাওয়া-পরা ও চলাফেরা দেখে সুন্নাতী আমল শিখত। একদা তিনি অজ্ঞাতে সন্দেহযুক্ত খাবার ভক্ষণ করেন। পরে এ বিষয়ে জ্ঞাত হ'লে তিনি একটি বড় থালা বা বাসন চান এবং বলেন, 'হযরত আবুবকর (রাঃ) যা করেছিলেন আমিও তাই করব।' একথা বলে সমস্ত খাদ্য বমি করে বের করে দিলেন। তিনি অত্যধিক ছালাত ও ছিয়ামে অভ্যস্ত

৪২. *ঐ, পৃঃ ৩০১।*
৪৩. *বুসতান, পৃঃ ৩০৬-৩০৭; শাযারাতুয যাহাব, ৪র্থ জিলদ, ৭ম জুয, পৃঃ ২৭২-২৭৩, তুহফাতুল আহওয়াযী, ঐ, পৃঃ ৩০১; নাযমুল ইক্বইয়ান ফী আ'ইয়ানিল আ'ইয়ান, পৃঃ ৪১-৪৮ দ্রঃ।*
৪৪. *শাযারাতুয যাহাব, ৪র্থ জিলদ, ৭ম জুয, পৃঃ ২৭৩।*

ছিলেন। তাহাজ্জুদ ছালাতও আদায় করতেন।[৪৫]

তিনি বিনয়ী, ধীর-স্থীর ও নিষ্কলুষ চরিত্রাধিকারী ছিলেন। বন্ধু-বান্ধবদের সাথে সদা হাস্য ও ভদ্রতার সাথে কথোপকথন করতেন।[৪৬]

ইনতেকালঃ ইবনু হাজারের মৃত্যু সন ও তারিখ সম্পর্কে মতপার্থক্য রয়েছে। 'ইসলামী বিশ্বকোষ'-এ বলা হয়েছে '২৮ যুলহিজ্জা, ৮৫২ হিঃ/২২ ফেব্রুয়ারী, ১৪৪৯ খ্রিষ্টাব্দে তিনি ইনতেকাল করেন।[৪৭]

'আব্বাস আল-আজাবী[৪৮] এবং মাওলানা আব্দুর রহমান মুবারকপুরীর মতে তিনি যুলহিজ্জার শেষ দিকে ইনতেকাল করেন।[৪৯] তবে তাঁরা কোন নির্দিষ্ট তারিখ উল্লেখ করেননি।

মাওলানা ছফিউর রহমান মুবারকপুরী 'আত-তাবার্‌রুল মাসবূক'-এর বরাতে ৮ যুলহিজ্জা বলেছেন।[৫০]

ইমাম সুয়ূত্বীর মতে, ১৮ যুলহিজ্জা ৮৫২ হিজরী।[৫১] হাফেয ইবনুল ঈমাদ হাম্বালী বলেন-

"وتوفى ليلة السبت ثامن عشرى ذى الحجة"

অর্থাৎ 'তিনি ১৮ যুলহিজ্জা শনিবার রাতে ইন্তেকাল করেন'।[৫২]

উর্দূ বিশ্বকোষের বর্ণনা মতে, ১৮ যুলহিজ্জা, ৮৫২ হিঃ/ ১৩ ফেব্রুয়ারী, ১৪৪৯ খৃষ্টাব্দে তিনি পরপারে পাড়ি জমান।[৫৩]

সৈয়দ সাজ্জাদ হোসায়েন-এর মতে, তাঁর মৃত্যু হয় ১৪৪০ খৃষ্টাব্দে।[৫৪]

জানাযা ও দাফনঃ শনিবার দিন যোহর ছালাতের কিছুক্ষণ পূর্বে কায়রোর বাইরে 'রামীলাহ'-এর 'মুছাল্লাল মুমেনীন' (এটা সেই জায়গা যেখানে জানাযার ছালাত আদায় করা হ'ত)-এ তাঁর জানাযার ছালাত অনুষ্ঠিত হয়। জানাযায় লোকের সমাগম ছিল অত্যধিক।[৫৫] সে সময়ের খলীফা আল-মুসতাকফী বিল্লাহ আব্বাসী এবং সুলতান জাক্‌মাক্ তাঁর মন্ত্রী পরিষদসহ উপস্থিত ছিলেন।[৫৬] বড় বড় নেতারা তাঁর লাশ বহন করার জন্য ভীড় জমিয়েছিল।[৫৭] অবশেষে সুলতান খলীফাকে সামনে দেন এবং আমীরুল মুমেনীন তাঁর জানাযার ছালাত আদায় করেন। ইবনে তুলুনের বর্ণনায় আছে যে, শায়খ ইলমুদ্দীন বুলাক্বীনী খলীফার অনুমতি সাপেক্ষে তাঁর জানাযার ছালাত পড়ায়েছিলেন। অতঃপর তাঁর লাশকে উঠিয়ে 'কেরাফাহ সুগরাহ'-তে নিয়ে আসা হয় এবং জামে' দায়লামীর সম্মুখে বানুল-খারুবি-র কবরস্থানে ইমাম শাফেঈ ও শায়েখ মুসলিম সুলমীর কবরের মাঝখানে ইলমের এই উজ্জ্বল রবিকে সমাধিস্থ করা হয়।[৫৮]

ইমাম সুয়ূত্বী বলেন, আমাকে তদানীন্তন কবি শিহাবুদ্দীন মানছূরী বর্ণনা করেন যে, তিনি তাঁর জানাযায় উপস্থিত হয়েছিলেন। যখন তিনি ছালাতে জানাযায় পৌঁছেন, তখন ইবনু হাজারের লাশের উপর আকাশ বৃষ্টি বর্ষণ করতে আরম্ভ করে দিল। অথচ তখন বৃষ্টির সময় ছিল না। এ দৃশ্য অবলোকন করে তিনি তাঁর কাব্যবীনার সুললিত সুরে গেয়ে ওঠেন-

قد بكت السحب على + قاضى القضاة بالمطر

وانهدم الركن الذى + كان مشيدا من حجر

'নিঃসন্দেহে আকাশ কাযীউল কুযাত (প্রধান বিচারপতি) ইবনু হাজারের উপর বৃষ্টি বর্ষণ করে ক্রন্দন করছে'। অর্থাৎ আকাশ বৃষ্টি বর্ষণের মাধ্যমে তাঁর মৃত্যুতে গভীর বেদনার বহিঃপ্রকাশ ঘটাচ্ছে। (আজ ইবনু হাজারের মৃত্যুতে দ্বীনের) এমন একটি স্তম্ভ ধ্বংসপ্রাপ্ত হল, যা হাজার (পাথর) দ্বারা মজবুত করে তৈরী করা হয়েছিল'।[৫৯]

আল্লাহ তাঁকে জান্নাতুল ফেরদাউস দান করুন-আমীন!!

---

৪৫. আহওয়ালুল মুছান্নেফীন, পৃঃ ২৪২-২৪৩; ইবনুল ঈমাদ বলেন, "ومن عاصره هذا مع كثرة الصوم ولزوم العبادة واقتفاء السلف الصالح"

দ্রঃ শাযারাতুয যাহাব, ৪র্থ জিলদ, ৭ম জুয, পৃঃ ২৭৩।

৪৬. নিবন্ধঃ হায়াতে ইবনে হাজার, পৃঃ ৩৫।

৪৭. ইসলামী বিশ্বকোষ, ৪র্থ খণ্ড, পৃঃ ২১২; Incyclopaedia of Islam এ বলা হয়েছে- "A few month later, about an hour after the evening prayer in the night of saturday, on 28 Dhul- HidJdJa 852/Saturday, 22 February 1449, he died. See: V-III, P. 777.

৪৮. তিনি বলেন, وتوفى بها (القاهرة) فى اواخر ذى الحجة سنة ٨٥٢ هـ/١٤٤٩م

দ্রঃ তারীখুল আদাবিল আরাবী ফীল ইরাক্ব, ১ম খণ্ড, পৃঃ ৮৩।

৪৯. তুহফাতুল আহওয়াযী, মুক্বাদ্দামা, ১ম খণ্ড, পৃঃ ৩০১।

৫০. ইত্তেহাফুল কেরাম শারহু বুলূগিল মারাম মিন আদিল্লাতিল আহকাম', পৃঃ ৬।

৫১. নাযমুল ইক্বয়ান ফী আ'ইয়ানিল আ'ইয়ান, পৃঃ ৫১।

৫২. শাযারাতুয যাহাব, ৪র্থ জিলদ, ৭ম জুয, পৃঃ ২৭১।

৫৩. দায়েরায়ে মা'আরেফে ইসলামিইয়াহ, ১ম খণ্ড, পৃঃ ৪৮১।

৫৪. সৈয়দ সাজ্জাদ হোসায়েন, আরবী সাহিত্যের ইতিবৃত্ত, (ঢাকাঃ ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ, দ্বিতীয় (ইফাবা প্রথম) সংস্করণঃ জুন ১৯৯৭), পৃঃ ৫১।

৫৫. হায়াতে ইবনে হাজার শীর্ষক নিবন্ধ, পৃঃ ৩৮; আহওয়ালুল মুছান্নেফীন, পৃঃ ২৪৬।

৫৬. ঐ, পৃঃ ২৪৬।

৫৭. তুহফাতুল আহওয়াযী, ১ম খণ্ড, মুক্বাদ্দামা, পৃঃ ৩০২।

৫৮. হায়াতে ইবনে হাজার শীর্ষক নিবন্ধ, পৃঃ ৩৮।

৫৯. আর-রাওয আল-বাসসাম, পৃঃ ২-৩।

হাদীছের গল্প

কা'ব বিন মালিক (রাঃ)-এর ঘটনা

*-শিহাবুদ্দীন সুন্নী**

মহান আল্লাহ্‌র বাণীঃ 'আর সেই তিন জনেরও তওবা কবুল হ'ল যারা পশ্চাতে ছিল' (তওবা ১১৮)। সূরা তওবার এই আয়াতাংশটুকু যাদের শানে নাযিল হয়েছিল, তাঁদের অন্যতম ছিলেন ছাহাবী কা'ব বিন মালিক (রাঃ)।

আব্দুর রহমান ইবনে আব্দুল্লাহ ইবনে কা'ব ইবনে মালিক (রাঃ) থেকে বর্ণিত, কা'ব ইবনে মালিকের পুত্র আব্দুল্লাহ তাঁর পিতা কা'ব (রাঃ) জীবনের শেষ প্রান্তে অন্ধ হয়ে যাবার পর তাঁর রক্ষণাবেক্ষণ ও পরিচালনার দায়িত্বে ছিলেন। আব্দুল্লাহ বলেন, আমি কা'ব ইবনে মালিককে তাঁর তাবুক যুদ্ধে পেছনে থেকে যাওয়ার ঘটনা বর্ণনা করতে শুনেছি। কা'ব (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) যতগুলো যুদ্ধ করেছেন, তার মধ্যে তাবুক ও বদর ছাড়া আর কোন যুদ্ধেই আমি অনুপস্থিত থাকিনি। তবে বদর যুদ্ধে যাঁরা পেছনে থেকে গিয়েছিলেন তাঁদের কারো উপর আল্লাহ্‌র আক্রোশ পতিত হয়নি। কারণ, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) শুধুমাত্র একটি কুরাইশ কাফেলাকে লুট করার জন্য বের হয়েছিলেন।

কোন প্রতিশ্রুতি ছাড়াই অপ্রত্যাশিতভাবে তাঁদের ও শত্রুদের মাঝে এ যুদ্ধ সংঘটিত হয়। আর আকাবার রাতে আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর কাছে হাযির ছিলাম। তিনি ইসলামের উপর দৃঢ়ভাবে কায়েম থাকার জন্য আমাদের কাছ থেকে শপথ গ্রহণ করেন। তাই আমি আকাবার বায়'আতের চেয়ে বদরের যুদ্ধকে অধিক গুরুত্বপূর্ণ মনে করতাম না। যদিও বদর যুদ্ধ অধিক প্রসিদ্ধ ও গুরুত্বপূর্ণ ছিল। যাহোক ঘটনা এই যে, আমি যখন তাবুকের যুদ্ধে অনুপস্থিত ছিলাম, সে সময়ের চেয়ে অন্য কোন সময়েই আমি অধিক শক্তিশালী ও সচ্ছল ছিলাম না।

আল্লাহ্‌র কসম! ইতিপূর্বে আমার কাছে কখনো একসাথে দু'টো সওয়ারী ছিল না। অথচ এ যুদ্ধের সময় (অর্থাৎ যুদ্ধের পূর্বে) আমি তা সংগ্রহ করেছিলাম। আর রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) যখনই কোন যুদ্ধের ইচ্ছা করতেন, তখন (যাতে শত্রুরা বুঝতে না পারে) সেজন্য বিপরীত পন্থা অবলম্বন করতেন (যাকে তাওয়ারী বলা হয়)। কিন্তু এ যুদ্ধের সময় যখন আসলো তখন ছিল ভীষণ গরম। পথ ছিল দীর্ঘ এবং পানি, গাছপালা ও লতাপাতা শূন্য। শত্রুর সংখ্যা ছিল অনেক বেশী। কাজেই রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) যেদিকে যাত্রা করবেন, তা বলে দিলেন। তখন তাঁর সাথে বিপুল সংখ্যক মুসলমান ছিলেন। তবে তাঁদের নাম লিষ্টের কোন দপ্তর ছিলনা।

কা'ব (রাঃ) বলেন, ফলে যদি কেউ যুদ্ধে না যাওয়ার ইচ্ছা পোষণ করত, তবে সে গোপন থাকতে পারত, যতক্ষণ না তার বিষয়ে 'অহি' নাযিল হয়। এ যুদ্ধের প্রস্তুতি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এমন এক সময় শুরু করেন যখন ফল পেকে গিয়েছিল এবং ছায়ায় বসা আরামদায়ক মনে হ'ত। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এবং তাঁর সাথে সকল মুসলমানগণ যুদ্ধের প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন। আমি প্রত্যহ সকালে তাঁদের সাথে যুদ্ধের প্রস্তুতি নেবার জন্য মসজিদে যেতাম। কিন্তু ফিরে এসে কিছুই করতাম না। শুধু মনে মনে বলতাম, 'আমি তো যেকোন সময় প্রস্তুত হবার ক্ষমতা রাখি, কাজেই এত তাড়াহুড়া কিসের'?

এভাবে দিন অতিবাহিত হ'তে থাকে। একদিন সকালে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) মুসলমানদের নিয়ে রওয়ানা দিলেন। অথচ তখনো আমি কোন প্রকার প্রস্তুতি নেইনি। মনে মনে ভাবলাম, দু'এক দিন পরেও প্রস্তুতি নিয়ে তাঁদের সঙ্গে মিলিত হ'তে পারব। তাঁরা চলে যাবার পর একদা আমি মসজিদে গেলাম এবং প্রস্তুতি নেবার পরিকল্পনা করলাম। ফিরে এসে কিছুই করলাম না। পরদিন সকালে যাবার নিয়ত করলাম কিন্তু কিছুই করলাম না। আমার এ দোদুল্যমান অবস্থায় মুসলিম সেনারা দ্রুত চলছিলেন এবং বহুদূর চলে গেলেন। আমি কয়েকবার এরাদা করলাম বের হয়ে তাঁদের ধরে ফেলতে। আফসোস! যদি আমি এমনটি করে ফেলতাম! কিন্তু তা আমার ভাগ্যে ছিল না। এরপর রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর চলে যাবার পর আমি যখন বাইরে বের হ'তাম, তখন পথে-ঘাটে মুনাফিকদেরকে অথবা দুর্বল হবার কারণে আল্লাহ যাদেরকে অক্ষম করে দিয়েছেন, তাদেরকে ছাড়া অন্য কাউকে দেখতে পেতাম না।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) পথে কোথাও আমার কথা জিজ্ঞেস করলেন না, তবে তাবুকে পৌঁছে যখন তিনি সবাইকে নিয়ে বসলেন, তখন আমার কথা জিজ্ঞেস করলেন। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, কা'বের কি হল? বণী সালামার এক ব্যক্তি বললেন, তাঁর বসন-ভূষণ ও আত্মম্ভরিতায় তাঁকে বাঁধা দিয়েছে। মু'আয ইবনে জাবাল বললেন, 'তুমি তো ভাল কথা বললেনা। আল্লাহ্‌র কসম! আমরা তাঁর ব্যাপারে ভাল বৈ আর কিছুই জানিনা'। এতদশ্রবণে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) চুপ করে থাকলেন।

কা'ব ইবনে মালেক (রাঃ) বলেন, যখন আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর প্রত্যাবর্তন সম্পর্কে অবহিত হ'লাম, তখন আমি ভীষণ চিন্তিত হয়ে পড়লাম। ভাবতে লাগলাম কোন মিথ্যা তালবাহানা করা যায় কি-না? যার ফলে আমি তাঁর ক্রোধ

* মুহতামিম, দক্ষিণ ফুলবাড়ী মাদরাসা, গোবিন্দগঞ্জ, গাইবান্ধা।

থেকে বাঁচতে পারি। এ ব্যাপারে পরিবারের কিছু বিচক্ষণ ব্যক্তির পরামর্শও চেয়েছিলাম। কিন্তু যখন শুনলাম রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) মদীনার একেবারে নিকটে এসে পৌঁছে গেছেন তখন আমার মন থেকে বাতিল ধ্যান-ধারণা বিদূরিত হয়ে গেল। আমি নিশ্চিত হয়ে গেলাম যে, তাঁর নিকট মিথ্যা বলে আমি মুক্তি পাব না। সুতরাং সত্য বলার জন্য দৃঢ়প্রত্যয়ী হ'লাম। সকালে রাসূল (ছাঃ) মদীনায় পৌঁছে গেলেন। আর তাঁর নিময় ছিল যখনই তিনি সফর থেকে ফিরে আসতেন প্রথমে মসজিদে যেতেন, সেখানে দু'রাক'আত ছালাত আদায় করতেন। তারপর লোকদের সাথে সাক্ষাৎ করার জন্য বসে যেতেন।

যখন তিনি ছালাত শেষ করে (মসজিদে নববীতে) বসে গেলেন। তখন তাবুক যুদ্ধ থেকে পিছিয়ে থাকা লোকেরা আসতে লাগল। তাঁরা নিজেদের ওযর পেশ করতে লাগলেন এবং কসম খেতে লাগলেন। এদের সংখ্যা ছিল আশির উর্ধ্বে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাদের ওযর কবুল করতঃ তাদের কাছ থেকে পুনরায় বায়'আত নিলেন। তাদের জন্য মাগফেরাতের দো'আ করলেন এবং তাদের মনের গোপন য়িষয় আল্লাহ্র হাতে সোর্পদ করলেন।

কা'ব (রাঃ) বলেন, 'আমিও আসলাম তাঁর কাছে। আমি সালাম দিতে তিনি বিরাগমিশ্রিত মুচকি হেসে বললেন, এসো এসো। আমি গিয়ে সামনে বসে পড়লাম। অতঃপর তিনি আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, কি কারণে তুমি পশ্চাতে থাকলে? তুমি কি যুদ্ধে যাওয়ার জন্য বাহন ক্রয় করনি? আমি বললাম জি, (ক্রয় করেছি)'। আরো বললাম, 'আল্লাহ্র কসম! যদি আমি আপনার সামনে না বসে দুনিয়ার অন্য কোন লোকের সামনে বসতাম, তাহ'লে আমি নিশ্চিত যে, যেকোন যুক্তি-বুদ্ধি দিয়ে তার নিকট হ'তে মুক্তি পেয়ে যেতাম। কারণ, কথা বলার ব্যাপারে আমি কম পারদর্শী নই। কিন্তু আল্লাহ্র শপথ! আমি জানি আজ যদি আপনার কাছে মিথ্যা বলে আপনাকে খুশী করে যাই, তাহ'লে কাল আল্লাহ আপনাকে আমার উপর নাখোশ করে দিবেন। আর যদি আজ আপনার সাথে সত্য কথা বলে যাই, তাতে আপনি নাখোশ হ'লেও আল্লাহ্র ক্ষমা লাভের আশা করা যায়। আল্লাহ্র কসম! আমার কোন ওযর ছিল না। আল্লাহ্র কসম! আমি যখন (অর্থাৎ তাবুক যুদ্ধে) আপনাদের থেকে পেছনে থেকে যাই তখনকার মত আর কোন সময় ততটা শক্তি সামর্থ্যের অধিকারী ছিলাম না'। একথা শুনে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, যদি আসলে এরূপ হয়, তবে কা'ব সত্য বলেছে। ঠিক আছে, চলে যাও, দেখো আল্লাহ তোমার ব্যাপারে কি ফায়সালা দেন।

আমি উঠে পড়লাম। বণী সালামার কিছু লোক আমাকে অনুসরণ করতে লাগল। তারা আমাকে বলল, আল্লাহ্র কসম! আমরা তো এ যাবৎ তোমার কোন গোনার কথা জ্ঞাত নই। পেছনে থেকে যাওয়া অন্যান্য লোকদের মত তুমিও রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নিকট একটা বাহানা উপস্থাপন করতে পারলে না? তাহ'লে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর ক্ষমা প্রার্থনাই তোমার পাপ মোচনের জন্য যথেষ্ট হয়ে যেত। তারা আমাকে এমনভাবে দোষারোপ করতে লাগল যে, একপর্যায়ে আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর কাছে ফিরে এসে আমার প্রথম কথাটিকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করার মনস্থ করলাম তাদেরকে জিজ্ঞেস করলাম, আচ্ছা, আমার মতো নিজের ভুল স্বীকার করেছে এমন আর কাউকেও কি তোমরা সেখানে দেখেছ? তারা জবাব দিল, হ্যাঁ, আরো দু'জন লোককে আমরা দেখেছি, তারাও তোমার মত একই কথা বলেছে। আর তাদেরকেও সেই একই কথা বলা হয়েছে, যা তোমাকে বলা হয়েছে। আমি জিজ্ঞেস করলাম, তারা কারা? লোকেরা জবাব দিল, তারা দু'জন হচ্ছেন মুরারাহ বিন রাবী আমরাবী এবং হিলাল বিন উমাইয়া আল-ওয়াকেফী। তারা আমার কাছে এমন দু'জন লোকের কথা বলল, যাঁরা ছিলেন সৎ যাঁরা বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন এবং আদর্শ স্থানীয় ছিলেন। তাঁদের দু'জনের কথা শুনে আমি চলতে শুরু করলাম।

এদিকে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) পেছনে থেকে যাওয়া লোকদের মধ্য থেকে আমাদের এ তিনজনের সাথে কথা বলা সমস্ত মুসলমানদের জন্য নিষিদ্ধ ঘোষণা করে দিয়েছিলেন। কাজেই লোকেরা আমাদের এড়িয়ে চলতে লাগল। যেন ভাবখানী এমন যে, তারা আমাদের একেবারে চেনেই না। অবস্থাদৃষ্টে মনে হ'তে লাগল যে, দুনিয়ার চিরচেনা সবকিছু বদলে গেছে। এ বয়কট আমাদের উপর ৫০ দিন পর্যন্ত বহাল ছিল। আমার সাথীদ্বয় ঘরের মধ্যে বসে গেলেন এবং কান্নাকাটি করতে লাগলেন। তবে আমি ছিলাম খুব শক্তিশালী যুবক। তাই আমি বাইরে বের হ'তে থাকলাম। মুসলমানদের সাথে ছালাতে যোগ দিতাম ও বাজারে ঘুরাফিরা করতাম। কিন্তু কেউ আমার সাথে কথা বলত না। আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর কাছে আসতাম। তিনি তখন ছালাতের পর মজলিসে বসতেন। আমি তাঁকে সালাম দিতাম। আমি মনে মনে বলতাম, আমার সালামের জবাবে তাঁর ঠোঁট নড়ল, কি নড়ল না। তারপর, আমি তার সন্নিকটে ছালাত আদায় করতাম। আমি আঁড়চোখে লুকিয়ে লুকিয়ে তাঁকে দেখতাম। কাজেই দেখতে পেতাম যে, যখন আমি ছালাতে মশগূল থাকি, তখন তিনি আমার দিকে তাকিয়ে থাকেন। আবার আমি যখন তাঁর দিকে দৃষ্টি দিতাম তখন তিনি মুখ ফিরিয়ে নিতেন। এ অবস্থায় দীর্ঘদিন অতিবাহিত হয়ে গেল। এভাবে লোকদের বিমূখতা আমাকে দিশেহারা করে তুলল। তাই একদিন আমার চাচাত ভাই আবু ক্বাতাদাহ-র বাগানের প্রাচীর টপকে তার কাছে

আসলাম। সে ছিল আমার কাছে সবচেয়ে প্রিয়। আমি তাকে সালাম দিলাম। কিন্তু আল্লাহ্‌র কসম! সে আমার সালামের জবাব দিলনা। আমি তাকে বললাম, হে আবু ক্বাতাদাহ! আল্লাহ্‌র দোহাই দিয়ে আমি তোমাকে জিজ্ঞেস করি, তুমি কি জানো না, আমি আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (ছাঃ) কে ভালবাসি? সে চুপ করে থাকল। আমি আবার আল্লাহ্‌র নামে কসম করে তাকে এ প্রশ্ন করলাম। এবারও সে চুপ করে থাকল। আমি তৃতীয়বার তাকে একই প্রশ্ন করলাম। এবার সে জবাব দিল, '(এ ব্যাপারে) আল্লাহ ও তাঁর রাসূলই ভাল জানেন'। (এতদশ্রবণে আমি আর নিজেকে সামলাতে পারলাম না) আমার দু'চোখ থেকে ঝরঝর করে পানি পড়তে লাগল। অতঃপর প্রাচীর টপকে পুনরায় ফিরে এলাম। ইত্যবসরে একদিন আমি মদীনার বাজারে হাঁটছিলাম। সিরিয়ার একজন খৃষ্টান কৃষক মদীনার বাজারে খাদ্যশস্য বিক্রি করতে এসেছিল। সে লোকদেরকে জিজ্ঞেস করছিল, কে আমাকে কা'ব বিন মালিকের ঠিকানা বলে দিতে পারে? লোকেরা তাকে ইশারা করে দেখিয়ে দিল। সে আমার কাছে এসে গাস্‌সানের রাজার একটি চিঠি আমার হস্তে অর্পণ করল। চিঠিতে রাজা লিখেছেন, আমি জানতে পেরেছি আপনার রাজা আপনার উপর নির্যাতন চালাচ্ছেন। অথচ আল্লাহ আপনাকে লাঞ্ছনা ও অবমাননাকর অবস্থায় রাখেননি। আপনি আমাদের এখানে চলে আসুন। আমরা আপনাকে মর্যাদা ও আরামের সাথে রাখব। চিঠিটা পড়ে আমি বললাম, এটাও আর একটা পরীক্ষা। কাজেই চিঠিটা আমি তন্দুরের আগুনে নিক্ষেপ করলাম।

এভাবে ৫০ দিনের মধ্যে ৪০ দিন অতিবাহিত হয়ে গেল। এমন সময় আমার কাছে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর একজন দূত আসলেন। তিনি বললেন, রাসূল (ছাঃ) তোমাকে তোমার স্ত্রী থেকে পৃথক থাকার আদেশ করেছেন। আমি বললাম, আমি কি তাকে তালাক দিব, না কি করব? তিনি বললেন, না, তালাক দিবে না। বরং তার থেকে পৃথক থাকবে এবং তার কাছে যাবেনা। আমার অন্য দু'জন সাথীর কাছেও এ মর্মে দূত পাঠানো হ'ল। আমি আমার স্ত্রীকে বললাম, তুমি নিজের আত্মীয়দের কাছে চলে যাও। আর আল্লাহ আমার এ ব্যাপারে কোন ফায়সালা না দেয়া পর্যন্ত তাদের সাথে অবস্থান কর। কা'ব (রাঃ) বলেন, হিলাল ইবনে উমাইয়ার স্ত্রী রাসূল (ছাঃ)-এর কাছে এসে বললেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল (ছাঃ)! হিলাল ইবনে উমাইয়া অতি বৃদ্ধ হয়ে পড়েছে। তার কোন সেবক নেই। যদি আমি তার সেবা করি, তবে কি আপনি অপসন্দ করবেন? তিনি জবাব দিলেন, না, তবে সে যেন তোমার কাছে না আসে। হিলাল ইবনে উমাইয়ার স্ত্রী বললেন, আল্লাহ্‌র কসম! তার মধ্যে এ কাজের প্রতি উৎসাহবোধ-ই নেই। আল্লাহ্‌র কসম! যেদিন থেকে এ ঘটনা ঘটেছে সেদিন থেকে সে কেঁদে চলেছে এবং আজো সে কাঁদছে।

(কা'ব (রাঃ) বলেন) আমাকেও আমার পরিবারের কেউ কেউ বলল, তুমিও যাও না রাসূল (ছাঃ)-এর কাছে। তোমার স্ত্রীর ব্যাপারে অনুমতি নিয়ে এসো, যাতে সে তোমার সেবা করতে পারে, যেমন হিলাল ইবনে উমাইয়ার স্ত্রী তার স্বামীর সেবার অনুমতি নিয়ে এসেছে। আমি বললাম, আল্লাহ্‌র কসম! আমি রাসূল (ছাঃ)-এর কাছে কোন অনুমতি আনতে যাবনা। জানিনা যখন আমি এ ব্যাপারে অনুমতি চাইব তখন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) কি বলবেন। কারণ, আমি একজন যুবক।

এভাবে আরো দশটি দিন অতিবাহিত হয়ে গেল। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আমাদের সাথে কথাবার্তা বন্ধ করে দেবার পর পঞ্চাশতম রাত্রিটিও অতিক্রম করে সকালে ফজরের ছালাত আদায় করলাম। ছালাতের পর আমাদের ঘরের ছাদে বসেছিলাম। আমার মনের অবস্থা ছিল অত্যন্ত করুণ। মনে হচ্ছিল জীবন ধারণ আমার জন্য দুঃসাধ্য হয়ে পড়েছে। পৃথিবী যেন তার সমস্ত বিস্তীর্ণতা সত্ত্বেও আমার জন্য অত্যন্ত সংকীর্ণ হয়ে পড়েছে। এমন সময় আমি 'সালম' পর্বতের উপর উচ্চৈঃস্বরে চিৎকারকারী একজনের শব্দ শুনতে পেলাম। সে চিৎকার করে বলছে, সুসংবাদ গ্রহণ কর হে কা'ব বিন মালিক। কা'ব (রাঃ) বলেন, আমি আল্লাহ্‌র দরবারে সিজদাবনত হ'লাম। আমি অনুধাবন করতে পারলাম, এবার সংকট কেটে গেছে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ফজরের ছালাতের পর ঘোষণা করে দিয়েছিলেন যে, আল্লাহ আমাদের তওবা কবুল করেছেন। কাজেই লোকেরা আমার কাছে সুসংবাদ ও মুবারকবাদ দেবার জন্য আসতে লাগল এবং আমার অপর দু'জন সাথীর কাছেও তারা একইভাবে সুসংবাদ ও মুবারকবাদ দেবার জন্য যেতে লাগল। একজন তো ঘোড়ায় চড়ে এক দৌড়ে আমার কাছে আসলেন। আর আসলাম গোত্রের এক ব্যক্তি দৌড়িয়ে পাহাড়ে উঠলেন। তার কথা অশ্বারোহীর চেয়েও দ্রুততর হ'ল। তার সুসংবাদ শুনে আমি এতই খুশী হয়েছিলাম যে, আমার পোশাক জোড়া খুলে তাকে পরিয়ে দিলাম। আল্লাহ্‌র কসম! তখন আমার কাছে ঐ পোশাক জোড়া ছাড়া আর কোন কাপড় ছিল না। তারপর আমি একজোড়া পোশাক ধার করে নিলাম এবং তা পরিধান করে রাসূল (ছাঃ)-এর সাথে সাক্ষাতের নিমিত্তে বের হ'লাম। পথে দলে দলে লোকেরা আমার সাথে মোলাকাত করছিল এবং তওবা কবুল হবার জন্য আমাকে মুবারকবাদ জানাচ্ছিল। তারা বলছিল, তোমার তওবা কবুল করে আল্লাহ তোমাকে যে পুরস্কৃত করেছেন, এজন্য তোমাকে মুবারকবাদ। কা'ব (রাঃ) বলেন, এভাবে আমি মসজিদে প্রবেশ করলাম। সেখানে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বসেছিলেন। তাঁর চারিদিকে

লোকেরা তাঁকে বেষ্টন করে রেখেছিল। ত্বালহা ইবনে উবাইদুল্লাহ (রাঃ) আমাকে দেখে দৌড়ে এসে মুছাফাহা করলেন এবং ধন্যবাদ জ্ঞাপন করলেন। মুহাজিরদের মধ্য থেকে সে ব্যতীত অন্য কেউ এভাবে এসে আমাকে ধন্যবাদ জানায়নি। আল্লাহ সাক্ষী, আমি কোনদিন তাঁর ইহসান ভুলবনা। কা'ব (রাঃ) বলেন, তারপর আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে সালাম দিলাম। তখন খুশীতে তাঁর চেহারা উজ্জ্বল হয়ে উঠেছিল। রাসূল (ছাঃ) বললেন, (হে কা'ব)! আজকের দিনটি তোমার জন্য মুবারক হোক, যা তোমার জন্মের পর থেকে আজ পর্যন্ত অতিক্রান্ত দিনগুলোর মধ্যে সবচেয়ে ভাল। কা'ব (রাঃ) বলেন, আমি বললাম, হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)! এ (ক্ষমা) আপনার পক্ষ থেকে, না আল্লাহ্র পক্ষ থেকে? তিনি বললেন, না, এতো আল্লাহ্র পক্ষ থেকে।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) যখন খুশী হ'তেন, তখন তাঁর চেহারা মোবারক চাঁদের মত উজ্জ্বল হয়ে উঠত। আমরা চেহারা দেখে তাঁর খুশী বুঝতে পারলাম। তারপর আমি তাঁর সামনে বসে বললাম, হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)! আমার তওবা কবুলের জন্য শুকরিয়া স্বরূপ আমি আমার সমস্ত ধন-সম্পদ আল্লাহ ও রাসূলের পথে ছাদাক্বা করে দিতে চাই। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, তোমার সম্পদের কিছু অংশ নিজের জন্য রেখে দাও। তাতে তোমার ভাল হবে। আমি বললাম, তাহ'লে আমি শুধু খায়বারের অংশটুকু আমার জন্য রাখলাম। বাকি সব আল্লাহ ও রাসূলের পথে দান করে দিলাম। তারপর আমি বললাম, হে আল্লাহ্র রাসূল! আল্লাহ এবার সত্য কথা বলার কারণে আমাকে মুক্তি দিয়েছেন। কাজেই আমার এ তওবা কবুল হবার কারণে আমি জীবনের অবশিষ্ট দিনগুলোতে সত্য কথাই বলতে থাকব। আল্লাহ্র কসম! আমি জানিনা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর কাছে সত্য কথা বলার কারণে সেদিন থেকে আজ পর্যন্ত আল্লাহ আমার প্রতি যে মেহেরবানী করেছেন, তেমনটি আর কোন মুসলমানের উপর করতেন কি-না? আর রাসূল (ছাঃ)-কে যেদিন থেকে একথা বলেছি সেদিন থেকে সজ্ঞানে মিথ্যা কথা বলিনি। জীবনের অবশিষ্ট দিনগুলোয় আল্লাহ আমাকে মিথ্যা থেকে বাঁচাবেন বলে আমি আশা করি। আর আল্লাহ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর উপর নিম্নোক্ত আয়াত নাযিল করেছেন, 'আল্লাহ নবী, মুহাজির ও আনসারদের মাফ করে দিয়েছেন' থেকে 'তোমরা সত্যবাদীদের সহযোগী হ'য়ে যাও' পর্যন্ত। আল্লাহ্র কসম! ইসলাম গ্রহণ করার পর এর চাইতে বড় আর কোন অনুগ্রহ হ'তে দেখিনি যে, রাসূল (ছাঃ)-এর সামনে সত্য বলার তাওফীক দান করে আমাকে ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করা হয়েছে। অন্যথায় অন্য মিথ্যাচারীদের মত আমিও ধ্বংস হয়ে যেতাম। কারণ অহি যখন নাযিল হচ্ছিল (অর্থাৎ রাসূল (ছাঃ)-এর জীবদ্দশায়) সে সময় যারা মিথ্যা বলেছিল তাদের সম্পর্কে আল্লাহ যে মারাত্মক কথা বলেছিলেন তা আর কারোর সম্পর্কে বলেননি। মহান আল্লাহ বলেছিলেন, 'এরা মিথ্যা শপথ করবে, যাতে তুমি তাদেরকে মাফ করে দাও। কিন্তু তাদের স্থান হচ্ছে জাহান্নাম'..... থেকে..... 'কারণ আল্লাহ ফাসেক্বদের দলের প্রতি কখনো খুশী হ'তে পারেন না' পর্যন্ত। কা'ব (রাঃ) বলেন, আর আমরা তিনজন সেসব লোকদের থেকে আলাদা যারা তাদের যুদ্ধে না যাবার জন্য রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর কাছে বাহানা পেশ করেছিল, মিথ্যা শপথ করেছিল এবং রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাদের কথা মেনে নিয়ে তাদেরকে বায়'আত করায়েছিলেন এবং তাদের জন্য মাগফেরাতের দো'আ করেছিলেন। কিন্তু আমাদের ব্যাপারটি তিনি ছেড়ে দিয়েছিলেন (আল্লাহ্র উপর)। শেষ পর্যন্ত আল্লাহ সে ব্যাপারে ফায়ছালা দিয়েছিলেন। সে ব্যাপারে আল্লাহ বলেছিলেন, 'সেই তিনজন, যারা পেছনে থেকে গিয়েছিল।' (অর্থাৎ আল্লাহ তাদেরকে মাফ করে দিয়েছিলেন)। যারা জেনে বুঝে জিহাদ থেকে পেছনে থেকে গিয়েছিল, তাদের কথা এখানে বলা হয়নি। বরং এখানে কেবল আমাদের (তিনজনের) কথা বলা হয়েছিল। আর যারা হলফ করেছিল ও ওযর পেশ করেছিল এবং তাদের ওযর রাসূল (ছাঃ) মেনে নিয়েছিলেন তাদের থেকে আমাদের ব্যাপারের ফায়ছালাটি পিছিয়ে দেয়া হয়েছিল।

[ছহীহ বুখারী, ২য় খণ্ড, ৬৩৪-৩৬ পৃঃ আসাহহুল মাতাবে']

হাদীছটির শিক্ষাঃ পাঠক ভেবে দেখুন-

(ক) বিনা কারণে যুদ্ধে না যাওয়ার ন্যায় কাবীরা গোনাহের জন্য ইসলামে বয়কট ব্যবস্থা কত কঠিন।

(খ) সমস্ত ছাহাবায়ে কেরাম কত সতর্কতা ও সাবধানতার সাথে বয়কট ব্যবস্থা পালন করেছেন।

(গ) পার্থিব সুখ-শান্তিকে গৌণ মনে করে যাঁরা জিহাদে গিয়েছিলেন তাদের ফযীলত।

(ঘ) যুদ্ধের পরিবেশ তথা ভীষণ গরম, পথের দূরত্ব, বিপুল শত্রু ইত্যাদীর ভয়ে যারা যুদ্ধে গেলেন না তাদের কি দুর্ণাম।

(ঙ) সত্য বলার জন্য ছাহাবী কা'ব বিন মালিকের তওবা কবুলের ন্যায় কি মহান পুরস্কার।

(চ) তওবা কবুলের আনন্দ সংবাদে দিশেহারা না হয়ে মহান প্রভুর শুকরিয়া জ্ঞাতার্থে সিজদা করার কি মহান আদর্শ!

(ছ) তওবা কবুলের শুকর আদায়কল্পে সমস্ত সম্পদ আল্লাহ্র পথে ব্যয়ের ন্যায় ত্যাগের অনুপম দৃষ্টান্ত।

আসুন! আমরা অতীতের অবহেলা ও পাপপঙ্কিলতা হ'তে তওবা করতঃ জান, মাল ও সময়ের কোরবানী দিয়ে আহলেহাদীছ আন্দোলনকে বেগবান করার মানসে সর্বাত্মক সহযোগিতার হাত বাড়াই। আল্লাহুমা আমীন!!

গল্পের মাধ্যমে জ্ঞান

আল্লাহ যা করেন, বান্দার মঙ্গলের জন্যই করেন

*কামরুয্যামান বিন আব্দুল বারী**

প্রাচীন কালে পারস্যে এক বদমেজাজী রাজা ছিলেন। একদিন চেরী কাটতে গিয়ে তাঁর হাতের আঙ্গুলের মাথা কেটে গেল। প্রচুর রক্তক্ষরণে রাজা শয্যাশায়ী হয়ে পড়লেন। উযীরে আ'যম সংবাদ পেয়ে রাজাকে দেখতে গেলেন। উযীরে আ'যম ছিলেন খুবই ধর্মপরায়ণ। রাজার এ অবস্থা দেখে তিনি বললেন, 'ইন্না লিল্লা-হ; আল্লাহ যা করেন বান্দার মঙ্গলের জন্যই করেন'। এতে রাজা উযীরের প্রতি খুবই অসন্তুষ্ট হ'লেন। ভাবলেন- ভীষণ ব্যথা ও প্রচুর রক্তক্ষরণে আমি শয্যাশায়ী, আর সে বলে 'আল্লাহ যা করেন বান্দার মঙ্গলের জন্যই করেন'। বেটাকে উচিত শিক্ষা দিতে হবে। কিন্তু রাজ্যের অধিকাংশ প্রজা উযীরে আ'যমের সততা, ন্যায়পরায়ণতা, বিচক্ষণতা ও ধর্মপরায়ণতায় মুগ্ধ ছিল। তাই সরাসরি তাঁকে শাস্তি দিলে ফলাফল প্রতিকূলে অবস্থান নিতে পারে ভেবে রাজা অন্য ফন্দি আঁটলেন।

অতঃপর সুস্থ হয়ে রাজা মন্ত্রীপরিষদের সাথে পরামর্শ করে একদিন শিকারে বের হ'লেন। সাথে উযীরে আ'যমকেও নিলেন। গভীর অরণ্যে প্রবেশ করে পূর্ব পরিকল্পনা অনুযায়ী উযীরে আ'যমকে এক অন্ধকার কূপে ফেলে দিয়ে তাঁরা শিকারে মনোনিবেশ করলেন। অতঃপর রাজা এক মায়া হরিণের কবলে পড়ে হরিণটি শিকার করার জন্য ঘোড়া নিয়ে ছুটলেন। রাজার ঘোড়া এমন দ্রুত দৌড়াচ্ছিল যে, সাথীগণ তাঁকে অনুসরণ করতে পারছিল না। দৌড়াতে দৌড়াতে রাজা রাজ্যের সীমানা অতিক্রম করে অন্য রাজ্যে পৌঁছে গেলেন। এ দিকে ঐ রাজ্যের রাজার খুবই প্রিয় একটি ঘোড়া ছিল। কয়েকদিন আগে জনৈক চোর ঘোড়াটি চুরি করে পারসীয় এই রাজার নিকট বহুমূল্যে বিক্রি করেছিল। আর সেই ঘোড়াটি নিয়েই পারস্যের রাজা শিকারে বের হয়েছিলেন। এদিকে ঐ রাজার সৈন্য বাহিনীও ঘোড়াটিকে তন্ন তন্ন করে খুঁজছিল। এমন সময় পারসীয় রাজা তাদের সামনে দিয়েই ঊর্ধ্বশ্বাসে ঘোড়ায় সওয়ার হয়ে যাচ্ছিলেন। সৈন্য বাহিনী তাদের রাজার ঘোড়াটি চিনতে পেরে পারস্যের রাজাকে বন্দী করে কয়েদ খানায় প্রেরণ করে।

ঐ দেশের রাজা ছিল মূর্তি পূজারী। সেদেশের প্রথা ছিল প্রতিবছর নির্দিষ্ট সময়ে সুদর্শন, সুঠামদেহী, নিঁখুত একজন লোককে তাদের দেবতার নামে আনুষ্ঠানিকভাবে 'বলি' দেয়া। অধিকাংশ সময় সে লোক সরবরাহ করা হ'ত কয়েদখানা হ'তে। আর এ সময়টি ছিল তাদের সেই বলি অনুষ্ঠানের সময়। তাই সুদর্শন, সুঠামদেহী কয়েদী রাজাকে মনোনীত করা হ'ল 'বলি' দেয়ার জন্য। নির্দিষ্ট সময়ে কয়েদী রাজাকে বলির মঞ্চে হাযির করা হ'লে সেদেশের রাজা কয়েদীর সারা শরীর অনুসন্ধান করতে লাগলেন কোন খুঁত আছে কি-না দেখার জন্য। অতঃপর কয়েদীর হাতের আঙ্গুলে কাটার দাগ দেখতে পেয়ে রাজা বললেন, এটা বলি দেয়ার উপযুক্ত নয়। অন্য একজনকে খুঁজে আন।

এমন সময় কয়েদী (পারস্যের রাজা) বললেন, উযীরের কথাই সত্যি হ'ল যে, 'আল্লাহ যা করেন বান্দার মঙ্গলের জন্যই করেন'। এ কথা শুনে ঐ দেশের রাজা জিজ্ঞেস করল, কি বললে তুমি? কি এর মর্মার্থ? তখন পারস্যের রাজা তাঁর পরিচয়সহ সমস্ত ঘটনা খুলে বললেন। কয়েদীর পরিচয় ও ঘটনা শুনে সে দেশের রাজা লজ্জিত ও অনুতপ্ত হয়ে বললেন, আপনার উযীর ঠিকই বলেছে। 'আল্লাহ যা করেন বান্দার মঙ্গলের জন্যই করেন'। অতঃপর সসম্মানে পারস্যের রাজাকে মুক্তি দেয়া হ'ল এবং ঘোড়াটিও তাঁকে উপহার দেয়া হ'ল।

মুক্তি পেয়ে পারস্যের রাজা রাজ্যে ফিরে এসে প্রথমেই উযীরে আ'যমের খুঁজে সেই অন্ধকার কূপের নিকট গিয়ে দেখলেন- উযীর এখনও বেঁচে আছে এবং পাশেই বসবাস করছে। রাজা উযীরে আ'যমকে আবেগে জড়িয়ে ধরে বললেন, আমি তোমাকে ভুল বুঝে তোমার প্রতি অন্যায় করেছি, তুমি আমাকে ক্ষমা করে দাও ভাই। তুমি সত্যিই বলেছিলে যে, 'আল্লাহ যা করেন বান্দার মঙ্গলের জন্যই করেন'। যদি আমার আঙ্গুলে কাটার দাগ না থাকত তবে আজ আমি মৃত্যুর রাজ্যে চলে যেতাম। তখন উযীরে আ'যম বললেন, আপনার দেয়া শাস্তিকে আমি হাসি মুখে বরণ করে নিয়েছিলাম এ জন্য যে, আমি বিশ্বাস করি 'আল্লাহ যা করেন বান্দার মঙ্গলের জন্যই করেন'। ভেবে দেখুন- আপনি যদি আমাকে কূপের মধ্যে না ফেলতেন তবে আমি কিছুতেই আপনার পিছু ছাড়তাম না। ফলে সে দেশের সৈন্য বাহিনীর হাতে আপনার সাথে আমিও বন্দী হ'তাম এবং আমাকেই তাদের প্রথানুযায়ী 'বলি' দেয়া হ'ত। কেননা আমার শরীরে কোন খুঁত নেই।

উপদেশঃ সম্মানিত পাঠক-পাঠিকাগণ! আলোচ্য গল্প হ'তে আমাদের শিক্ষা গ্রহণ করা উচিত যে, সকল বিপদ-আপদ ও বালা-মুছীবতে আল্লাহ্র প্রতি তাওয়াক্কুল রেখে ধৈর্যের সাথে বিপদ-মুছীবতকে হাসি মুখে বরণ করে নিতে হবে এবং সর্বদা বিশ্বাস রাখতে হবে যে, 'আল্লাহ যা করেন বান্দার মঙ্গলের জন্যই করেন'। আল্লাহ তাঁর বান্দাকে বিভিন্ন বালা-মুছীবত দিয়ে পরীক্ষা করে থাকেন। যারা বালা-মুছীবতে ধৈর্য ধারণ করতে পারে তাদের জন্য রয়েছে সুসংবাদ। আল্লাহ বলেন, 'নিশ্চয়ই আমি তোমাদেরকে পরীক্ষা করব ভয়-ক্ষুধা-ধনসম্পদ-প্রাণ এবং ফল-শস্যের ক্ষয় ক্ষতির দ্বারা। আর (হে রাসূল)! আপনি ধৈর্যশীলীদেরকে সু-সংবাদ প্রদান করুন। যারা তাদের উপর কোন বিপদ আসলে বলে, নিশ্চয়ই আমরা আল্লাহ্র জন্য এবং নিশ্চয়ই আমরা তাঁর দিকেই প্রত্যাবর্তনকারী'। তাদের উপর তাদের প্রতিপালকের পক্ষ হ'তে শান্তি ও করুণা বর্ষিত হবে এবং তারাই সঠিক পথ প্রাপ্ত' (বাক্বারাহ ১৫৫, ৫৬, ৫৭)।

* আরামনগর আলিয়া মাদরাসা, সরিষাবাড়ী, জামালপুর।

চিকিৎসা জগৎ

রাতকানা রোগের কারণ এবং সহজলভ্য প্রতিকার

-ডাঃ মুহাম্মাদ গোলাম জিলানী

ভিটামিন বা খাদ্যপ্রাণ মানবদেহের জন্য একটি অতি প্রয়োজনীয় খাদ্য উপাদান। এর অভাবে শরীরে নানা প্রকার জটিলতা দেখা যায় এবং শরীর অপুষ্টিতে ভোগে। বর্তমানে অপুষ্টিজনিত অন্ধত্ব বাংলাদেশের একটি অন্যতম স্বাস্থ্য সমস্যায় পরিণত হয়েছে। ভিটামিন 'এ' এই অপুষ্টিজনিত অন্ধত্বের বা রাতকানা রোগের প্রধান কারণ। রাতকানা রোগ চলতে থাকলে তা চিরস্থায়ী অন্ধত্বে পরিণত হ'তে পারে। রাতকানা রোগ হ'ল অন্ধত্বের পূর্ব অবস্থা। রাতকানা অবস্থায় অল্প আলোতে অর্থাৎ খুব ভোরে, সন্ধ্যায় এবং রাতে দেখা যায় না। ভিটামিন 'এ' রাতের বেলায় আমাদের দেখতে সাহায্য করে। দেশের প্রায় ১০ লাখ শিশুর মধ্যে অপুষ্টিজনিত অন্ধত্বের লক্ষণ দেখা গেছে। তার মধ্যে শুধু মাত্র ভিটামিন 'এ'-এর অভাবে প্রতি বছর প্রায় ৩০ হাযার শিশু অনিচ্ছা সত্ত্বেও অন্ধত্বকে বরণ করে নিতে বাধ্য হচ্ছে। ভিটামিন 'এ'-এর এই অভাবজনিত অপুষ্টিতে শিশুদের প্রায় অর্ধেকই মারা যায়। আবার গর্ভবতী মহিলাদের মধ্যে প্রতি বছর প্রায় ২ লাখ থেকে ৩ লাখ রাতকানা রোগে ভোগেন। অথচ আমাদের খাদ্য তালিকায় ভিটামিন 'এ'-এর পরিমাণ মত উপস্থিতিই পারে একমাত্র এ সমস্যা থেকে মুক্তি দিতে।

ভিটামিন 'এ' আমাদের শরীরের বিভিন্ন স্থানের আবরণের পিসিলিয়ামের স্বাভাবিক কার্যক্ষমতা ও সক্রিয়তা রক্ষা করে। তাছাড়া আমাদের চোখের রেটিনার কোষের আলোক সংবেদী পিগমেন্টের স্বাভাবিক তৈরিতে সাহায্য করে। শিশুদের ক্ষেত্রে ভিটামিন 'এ' স্বল্পতা চোখের উপর মারাত্মক বিপর্যয় ডেকে আনতে পারে। প্রথমে শিশুরা রাতে দেখে না। যাকে রাতকানা বা 'নাইট ব্লাইন্ডনেস' রোগ বলে। চোখের কনজাংটিভা শুষ্ক, পুরু ও পিগমেন্টেড হয়ে যায়। এক ধরনের ধোঁয়াটে অবস্থার সৃষ্টি হয়। কনজাংটিভার স্বাভাবিকতা কমে যায়। চকচকে সাদা পুরু ছোট গোটার সৃষ্টি হয়, যা সাধারণত তিন কোণা আকৃতির হয়ে থাকে যাকে 'বিট্‌টস্ স্পার্ট' বলে। কনজাংটিভার শুষ্কাবস্থা ছড়িয়ে পড়ে কর্নিয়াতেও। কর্নিয়া চলতি কথায় আমরা যাকে চোখের মণি বলি। সাদা কনজাংটিভার মাঝখানে গোলাকার কালো অংশকেই আমরা কর্নিয়া বলি। এই কর্নিয়ার চকচকে ভাব হারিয়ে গিয়ে হয়ে পড়ে ঘোলাটে। কেরাটিনাইজেশনের জন্য কর্নিয়ার ইপিথিলিয়ামের এ পরিবর্তন দেখা যায়। এই অবস্থাকে 'জেরপথ্যালমিয়া' বলে। পরে চোখের কর্নিয়া নরম হয়ে যায় এবং নেকরোসিস হয়ে আলসার বা ঘা দেখা দেয়। জেরপথ্যালমিয়া সাধারণত জন্ম থেকে ৬ বছর বয়সী শিশুদের মধ্যে দেখা যায় প্রধানত পুষ্টিহীনতার কারণে। আর খাদ্য তালিকায় দীর্ঘদিন ভিটামিন 'এ' সমৃদ্ধ খাবার না থাকার কারণে। তবে এ রোগ যে কোন লোকের হ'তে পারে। শুধুমাত্র পুষ্টি উপাদান ভিটামিন 'এ'-এর অভাবেই এ রোগ হয়ে থাকে। এ রোগ কোন সংক্রামক রোগ নয়। আমাদের দেশে ভিটামিন 'এ' সমৃদ্ধ খাবারের কোন অভাব নেই। অভাব রয়েছে শুধু পরিমিত জ্ঞান ও সচেতনতার। ভিটামিন 'এ'-এর অভাবজনিত কারণে চোখ অন্ধ হয়ে গেলে চিকিৎসা প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়ে। তবে, ভিটামিন 'এ'-এর অভাবজনিত জটিলতার প্রাথমিক স্তরে রোগ ধরা পড়লে চোখের দৃষ্টিশক্তি রক্ষা করা যেতে পারে। তবে সেক্ষেত্রে অবশ্যই নিকটস্থ স্বাস্থ্য কেন্দ্র বা হাসপাতালে চক্ষু বিষয়ে অভিজ্ঞ চিকিৎসকের পরামর্শ নেয়া অবশ্য কর্তব্য। মনে রাখতে হবে, চোখের দৃষ্টিশক্তি রক্ষা করতে হ'লে দ্রুত ও সঠিক চিকিৎসা এক্ষেত্রে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। তা না হ'লে একজন শিশুকে সারা জীবনের জন্য বয়ে বেড়াতে হ'তে পারে অন্ধত্বের অভিশাপ। চিরদিন তাকে অপরের উপর নির্ভরশীল হয়ে থাকতে হয়। এভাবে সমাজে দিন দিন অন্ধ শিশু বোঝা হিসাবে দেখা দেয়। আর এর ফলে জাতীয় অগ্রগতি বিরাট বাধার সম্মুখীন হয়।

এ রোগের চিকিৎসায় প্রতিরোধই সবচেয়ে ভালো ব্যবস্থা। বাংলাদেশে ১৯৭৩ সালে অপুষ্টিজনিত নিবারণ কর্মসূচি শুরু হয়। কিন্তু পুষ্টি উন্নয়ন কর্মসূচী ব্যাপক আকারে শুরু হয় ১৯৮১ সাল থেকে। আমাদের দেশে ইউনিসেফ, হেলেন কিলার ইন্টারন্যাশনালের সহযোগিতায় অন্ধত্ব প্রতিরোধ কর্মসূচী শুরু হয়েছে। এই কর্মসূচীর মাধ্যমে সরকার প্রতি বছর দু'বার উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন ভিটামিন 'এ' ক্যাপসুল ৬ মাস থেকে ৬ বছরের শিশুদের মধ্যে বিতরণ করে থাকে। সাধারণত মাঠ কর্মীদের মাধ্যমে এ ক্যাপসুল বিতরণ করা হয়ে থাকে। প্রতিটি ক্যাপসুলে ২ লাখ ইউনিট করে ভিটামিন 'এ' থাকে। রাতকানা রোগ প্রতিরোধের জন্য ৬ মাস থেকে ১ বছর পর্যন্ত শিশুর জন্য অর্ধেক ক্যাপসুল অর্থাৎ ৪ ফোঁটা ওষুধ বছরে ২ বার খেতে হয়। আর যাদের রাতকানা রোগ দেখা দিয়েছে তাদেরকে ১ম দিন ১টা ক্যাপসুল, ২য় দিন আর ১টা ক্যাপসুল এবং ১৫ দিন পর পুনরায় ১টা ক্যাপসুল অর্থাৎ মোট ৩টা ক্যাপসুল খাওয়াতে হবে।

তাছাড়া ডায়রিয়া, হাম অথবা বেশি জ্বর হ'লে অসুখের সময় অতিরিক্ত ১টা ক্যাপসুল খাওয়াতে হয়। ভিটামিন 'এ' ক্যাপসুল শরীরে বিশেষ করে লিভারে জমা হয়। নির্দিষ্ট নিয়মের বাইরে খেলে ক্ষতি হয়। তাই নির্দিষ্ট নিয়মের বাইরে উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন ভিটামিন 'এ' ক্যাপসুল খেতে হয় না। বিভিন্ন প্রকার হলুদ ও লাল ফলমূলে প্রচুর পরিমাণে ভিটামিন 'এ' থাকে। যেমন পাকা পেঁপে, আম, কাঁঠাল, কলা, বিভিন্ন প্রকার সবজি যেমন মিষ্টি কুমড়া, গাজর,

টমেটো ইত্যাদিতে ভিটামিন 'এ' থাকে। ছোট মাছ বিশেষ করে মলা ঢেলা মাছের মাথায় প্রচুর ভিটামিন 'এ' থাকে। দুধ, ডিম, দৈ, মাখন, পনির ইত্যাদিতেও ভিটামিন 'এ' আছে। কচুশাক, লালশাক, ডাটাশাক, পুঁইশাক, কলমিশাক প্রভৃতি সব রকমের সবুজ রঙ-এর শাকে প্রচুর ভিটামিন 'এ' পাওয়া যায়। মায়ের দুধে প্রচুর ভিটামিন 'এ' থাকে। তাই শিশুর জন্মের পর শিশুকে শাল দুধ খাওয়ানোসহ শিশুকে বুকের দুধ খাওয়াতে হবে। তাছাড়া বাচ্চাদের খাবার তেল দিয়ে রেঁধে খাওয়ানো ভাল। কারণ ভিটামিন 'এ' একটি তেলে দ্রবণীয় খাবার। তেল ছাড়া এ খাদ্য উপাদানটি আমাদের শরীরে প্রবেশ করতে পারে না। মলের সাথে বের হয়ে আসে। সে জন্য প্রত্যেক দিন শিশুদের খাবারে তেল দিয়ে রান্না অল্প কিছু শাক-সবজি থাকা প্রয়োজন। আমরা আমাদের বাড়ির আশপাশে পতিত জমিতে শাকসবজির চাষ করে ভিটামিন 'এ'-র জোগান সহজতর করতে পারি এবং পরিবারের ভিটামিন 'এ'-এর চাহিদা অনেকাংশে মেটাতে পারি। শিশুদের পেটে যাতে কৃমি না থাকে সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। কৃমির চিকিৎসা করতে হবে। যেখানে সেখানে পায়খানা না করে জলবদ্ধ পায়খানা বা আধুনিক স্যানিটারী ল্যাট্রিন ব্যবহারে অভ্যস্ত হ'তে হবে। শিশুর যাতে সংক্রামক রোগগুলো না হ'তে পারে সেজন্য বাচ্চাকে টিকা কেন্দ্রে নিয়ে গিয়ে নিয়মিত টীকা দিতে হবে।

ফলে শিশুর রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়বে। ঘন ঘন অসুখ হবে না। কেননা ঘন ঘন অসুখ হ'লে শরীরে ভিটামিন 'এ'-এর অভাব হয়। বিশেষ করে হাম হ'লে ভিটামিন 'এ'-এর অভাব বেশী করে হয়। আবার ডায়রিয়া হ'লেও ভিটামিন 'এ'-এর অভাব হয়। তাই ডায়রিয়া হাম, শ্বাসকষ্টসহ বিভিন্ন সংক্রামক ব্যাধির চিকিৎসা করা ও বাচ্চাকে কৃমির সংক্রমণ থেকে দূরে রাখতে পারলে ভিটামিন 'এ' সহ অপুষ্টিজনিত অন্ধত্বের হাত থেকে শিশুকে রক্ষা করা সম্ভব হবে। এ সমস্ত রোগ শরীর থেকে প্রয়োজনীয় ভিটামিন 'এ' বের করে দেয় অথবা তাদের গ্রহণ ও মজুত ক্ষমতা কমিয়ে দেয়।

পরিশেষে বলব যে, চোখ আমাদের শরীরের এক অমূল্য সম্পদ। অন্ধত্ব বরণ আমাদের কারও কাম্য নয়। আমাদের শপথ হবে অশিক্ষা ও অজ্ঞতার বশে আমরা যেন আমাদের দৃষ্টিশক্তি অকালে না হারাই। তাই আমাদের উচিত হবে জন্ম থেকেই ভিটামিন 'এ'-এর পর্যাপ্ত গ্রহণ সম্পর্কে সচেতন থাকা।

॥ সংকলিত ॥

তাবলীগী ইজতেমা-২০০০ সফল হোক

শিক্ষানগরী রাজশাহীতে
অর্ধশতাব্দীর অভিজ্ঞতা সম্পন্ন

দি বেঙ্গল প্রেস

রাণীবাজার, রাজশাহী-৬১০০। ফোনঃ ৭৭৪৬১২

আপনার সেবার জন্য

- ✔ কম্পিউটার কম্পোজ
- ✔ গ্রাফিক্স ডিজাইন
- ✔ স্ক্যান- সাদা কালো এবং রঙ্গীন
- ✔ ১৩" X ২০" সাইজ লেজার প্রিন্ট
- ✔ কোয়ালিটি অফসেট প্রিন্ট
- ✔ সঠিক সময়ে সরবরাহ

কবিতা

ফজরের আযান

-আমীরুল ইসলাম (মাষ্টার)
ভায়া লক্ষ্মীপুর, বাঁকড়া
চারঘাট, রাজশাহী।

রাত পোহাল ফজর হ'ল
মুয়ায্যিন ঐ হাঁকছে আযান
উচ্চ কণ্ঠে ঘোষণা দেয়
আল্লাহ মহান, আল্লাহ মহান।
সাক্ষ্য দেয়, তাঁর সমান
নাইকো কেহ দু'জাহানে
মুহাম্মাদ (ছাঃ) যে আল্লাহ্র রাসূল
বলছে অতি সত্য জেনে।
জলদি ধর মসজিদের পথ
কায়েম কর আপন ছালাত
এই পথেই তো মঙ্গল আছে
জোরছে ডেকে বলছে তা আজ।
ঘুম হ'তে যে ছালাত ভাল
শয্যা ছেড়ে ওঠো জেগে
দু'জাহানের শান্তি ও সুখ
ছালাত মাঝে লও গো মেগে।
অলস কুঁড়ে যারা ভবে
ঘুমে কাটায় বিভাবরী
ধ্বংস তাদের ধর্ম কর্ম
ধ্বংস তাদের দুনিয়াদারী।
হও হুঁশিয়ার থাকতে সময়
ছাড় সকল অলসতা
দেখবে তোমার সকল কাজে
আসবে দারুণ সফলতা।

***

আজকের রাজনীতি

-আব্দুল্লাহ আল-মামূন
নাগোরঘোপ মাধ্যমিক বিদ্যালয়
চিনাটোলা, মণিরামপুর, যশোর।

আজকের রাজনীতি
পাল্টেছে রীতিনীতি,
কতরকম দূর্নীতি
ক্ষমতার নেশায় মাতি।
আনকোরা পলিটিকস্
শাসন-শোষণের নতুন ট্রিকস্।
নেতা আর নীতির লড়াই
দেখবে কত মিথ্যা বড়াই
মিছিল মিটিং সমাবেশে
গরম কথার খই ফোঁটে।
অন্যের মাথায় ঘোল ঢালতে
ময়দানে বোম ফাটে।
অপরের দোষ ধরতে
বড়ই সবে ওস্তাদ,
কটু কথার ফুলঝুরি
যেন সমরাঙ্গন 'সংসদ'।
আজকের রাজনীতি
প্রাণ নিয়ে টানাটানি
আদর করে গুণ্ডা পুষে
অস্ত্রের ঝনঝনানি।
মুখে বলে 'সন্ত্রাস
করতে হবে দমন',
দুধ-কলা খাইয়ে তারাই
সন্ত্রাস করছে পালন।
জনদরদী না দেশদ্রোহী
বোঝা বড়ই মুশকিল,
সাপোর্টারের ভিড়েই সার
আন্দাজে ছোড়া ঢিল।
জনসেবা নয় পেট পুঁজা
এই হ'ল রাজনীতি
জনগণের চোখে ধুলো দেওয়া
গদির দলের মূলনীতি।
এই কি ছিল কভু
মহানবীর (ছাঃ) রাজনীতি?
ওয়াদা ভঙ্গ, মিথ্যাচার,
কোন দেশী রীতি?
এই দেশে যদি চলে
কুরআন-হাদীছের নীতি
ঃআসবে আবার শান্তি ফিরে
দূর হবে সব ভীতি।

***

যুদ্ধ ও আমরা

-মুহাম্মাদ গোলাম সারওয়ার
১ম বর্ষ, ইতিহাস বিভাগ
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

এ জীবন যুদ্ধের, এ যুদ্ধ জীবনের
এ যুদ্ধের ডাক এসেছে ভূমিষ্ঠ হওয়ার
প্রতি মুহূর্তেই, "লড়তে হবে অসাম্যের
বিরুদ্ধে"; পরক্ষণেই হ্যাঁ সূচক
শ্লোগানে চিৎকার করে উঠেছিলাম
আমরা সবাই।
শুধু আমরা একা নই
আরো লক্ষ কোটি শিশু যারা জন্মেছিল
চেচনিয়া, বসনিয়া, কসোভো, ফিলিস্তিন
তুরস্ক, শ্রীলঙ্কা, কাশ্মীর আরো
হাযারো নির্যাতিতদের দেশে।
কিন্তু তোমরা কি জান?
আজ আমরা সবাই শৈশব, কৈশোর পেরিয়ে
যৌবনে পৌঁছেছি একত্রে।
এখন আমরা সেই লক্ষ কোটি প্রাণ
তারুণ্যের দীপ্তিতে উদ্ভাসিত
আমাদের হাত মুষ্টিবদ্ধ, উত্তোলিত,
আমরা প্রস্তুত! আমরা প্রস্তুত!
যেহেতু এ যুদ্ধ জীবনের, এ জীবন যুদ্ধের,
এ যুদ্ধ পৃথিবীর শেষ যুদ্ধ॥

***

দো'আ

দো'আর ফযীলতঃ হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) হ'তে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, মুসলমান যখন অন্য কোন মুসলমানের জন্য দো'আ করে, যার মধ্যে কোনরূপ গোনাহ বা আত্মীয়তা ছিন্ন করার কথা থাকেনা, আল্লাহ পাক উক্ত দো'আর বিনিময়ে তাকে তিনটির যেকোন একটি দান করে থাকেন। তার দো'আ দ্রুত কবুল করেন অথবা তার প্রতিদান আখেরাতে প্রদান করার জন্য রেখে দেন অথবা তার থেকে অনুরূপ আরেকটি কষ্ট দূর করে দেন। একথা শুনে ছাহাবীগণ বললেন, তাহ'লে আমরা বেশী বেশী দো'আ করব। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, আল্লাহ আরও বেশী দো'আ কবুলকারী' (আহমাদ, মিশকাত হা/২২৫৯ 'দো'আ সমূহ' অধ্যায়; ছহীহ, তানক্বীহ ২/৬৯)। অত্র হাদীছে বর্ণিত উপরোক্ত শর্তটির সাথে অন্যান্য ছহীহ হাদীছে বর্ণিত আরও তিনটি শর্ত রয়েছে। যথাঃ দো'আকারীর খাদ্য, পানীয় ও পোষাক পবিত্র হওয়া (অর্থাৎ হারাম না হওয়া) এবং দো'আ কবুল হওয়ার জন্য ব্যস্ত না হওয়া' (তানক্বীহ)।

২০. নতুন চাঁদ দেখার দো'আঃ

اللهُ أَكْبَرُ، اَللَّهُمَّ أَهِلَّهُ عَلَيْنَا بِالْأَمْنِ وَالْإِيْمَانِ وَالسَّلَامَةِ وَالْإِسْلَامِ وَالتَّوْفِيْقِ لِمَا تُحِبُّ وَتَرْضَى، رَبُّنَا وَرَبُّكَ اللهُ-

উচ্চারণঃ আল্লা-হু আকবর। আল্লা-হুম্মা আহিল্লাহু আলায়না বিল আমনে ওয়াল ঈমা-নি ওয়াস সালা-মাতি ওয়াল ইসলা-মি ওয়াত তাওফীক্বি লিমা তুহিব্বু ওয়া তারযা। রাব্বুনা ওয়া রাব্বুকাল্লা-হু।

অর্থঃ আল্লাহ সবার চাইতে বড়। হে আল্লাহ! আপনি আমাদের উপরে চাঁদকে উদিত করুন শান্তি ও ঈমানের সহিত, নিরাপত্তা ও ইসলামের সহিত এবং ঐসকল কাজের তাওফীকের সহিত যে সকল কাজ আপনি ভালবাসেন ও পসন্দ করে থাকেন। (হে চন্দ্র!) আমাদের ও তোমার প্রভু আল্লাহ'।[১]

২১. ঝড়ের সময়কার দো'আঃ

اللَّهم إِنِّى أَسْأَلُكَ خَيْرَهَا وَخَيْرَ مَا فِيْهَا وَخَيْرَمَا أُرْسِلَتْ بِهِ وَأَعُوْذُبِكَ مِنْ شَرِّهَا وَمِنْ شَرِّ مَا أُرْسِلَتْ بِهِ-

উচ্চারণঃ আল্লা-হুম্মা ইন্নী আসআলুকা খায়রাহা ওয়া খায়রা মা ফীহা ওয়া খায়রা মা উরসিলাত বিহী, ওয়া আ'উযুবিকা মিন শার্রিহা ওয়া মিন শার্রি মা উরসিলাত বিহী'।

অর্থঃ হে আল্লাহ! আমি আপনার নিকটে উহার মঙ্গল, উহার মধ্যকার মঙ্গল ও যা নিয়ে ওটি প্রেরিত হয়েছে, তার মঙ্গল সমূহ প্রার্থনা করছি এবং আমি আপনার আশ্রয় প্রার্থনা করছি উহার অকল্যাণ হ'তে এবং যা নিয়ে ওটি প্রেরিত হয়েছে তার অকল্যাণ সমূহ হ'তে'।[২]

১. দারেমী সনদ হাসান, আল-আযকার পৃঃ ৮২।
২. মুসলিম; আল-আযকার পৃঃ ৭৮।

ছহীহ ইবনু হিব্বানের অন্য বর্ণনায় এসেছে, اَللَّهُمَّ لَقْحًا لَا عَقِيْمًا আল্লা-হুম্মা লাক্বহান লা 'আক্বীমান 'হে আল্লাহ! মঙ্গলপূর্ণ কর মঙ্গলশূন্য নয়'।[৩]

২২. বজ্রের আওয়ায শুনে দো'আঃ

سُبْحَانَ الَّذِيْ يُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ خِيْفَتِهِ

উচ্চারণঃ সুবহা-নাল্লাযী ইয়ুসাব্বিহুর রা'দু বিহামদিহী ওয়াল মালা-ইকাতু মিন খীফাতিহি'।

অর্থঃ মহা পবিত্র সেই সত্তা যাঁর গুণগান করে বজ্র ও ফেরেশতামণ্ডলী সভয়ে'।[৪]

২৩. বৃষ্টির দো'আঃ

(ক) বৃষ্টির মেঘ দেখে صَيِّبًا نَافِعًا 'ছাইয়েবান না-ফে'আ' '(হে আল্লাহ!) পূর্ণ ও উপকারী বর্ষণ দাও' (বুখারী)।

(খ) হালকা ও অপূর্ণ বৃষ্টির সময়- اَللَّهُمَّ صَيِّبًا هَنِيْئًا আল্লা-হুম্মা ছাইয়েবান হানীআ 'হে আল্লাহ! পূর্ণ ও ধীর বর্ষণ দাও' (আবুদাঊদ)।

(গ) অতি বৃষ্টির সময় اَللَّهُمَّ حَوَالَيْنَا وَلَا عَلَيْنَا আল্লা-হুম্মা হাওয়া-লায়না ওয়া লা 'আলায়না 'হে আল্লাহ! ফিরিয়ে নিন, আমাদের উপরে আর নয়' (মুসলিম)।[৫]

২৪. খরা ও অনাবৃষ্টির সময়ঃ

اَللَّهُمَّ أَغِثْنَا আল্লা-হুম্মা আগেছনা 'হে আল্লাহ আমাদেরকে বৃষ্টি দান করুন' (৩ বার)।[৬]

৩. হাদীছ ছহীহ, ঐ পৃঃ ৭৯। ৪. রা'দ ১৩; বুখারী, ঐ পৃঃ ৭৯।
৫. ঐ পৃঃ ৮০, ৭৯, ৮১। ৬. মুসলিম, ঐ পৃঃ ৮১।

বাংলাদেশ ব্যাংক অনুমোদিত

জেড আহমেদ মানি চেঞ্জার

১. বিদেশী মুদ্রা (ডলার, পাউন্ড, স্টার্লিং, ডয়েস মার্ক, ফ্র্যাঙ্ক, ইয়েন, রিংগিট, দিনার, রিয়াল) ইত্যাদি ক্রয়-বিক্রয় করা হয়।

২. ডলার ড্রাফ সরাসরি নগদ টাকায় ক্রয় করা হয়।

৩. পাসপোর্ট ডলারসহ এনডোর্সমেন্ট করা হয়।

২০/৩১ সুলতানাবাদ, গোরহাঙ্গা
(হোটেল গুলশান সংলগ্ন পশ্চিম পার্শ্বে)
বোয়ালিয়া, রাজশাহী। ফোনঃ ৭৭৪৪২২।

সোনামণিদের পাতা

গত সংখ্যার যাদের উত্তর সঠিক হয়েছে ঃ

❐ **গঙ্গারামপুর মনিগ্রাম জামে মসজিদ, বাঘা, রাজশাহী থেকেঃ** শাহীনুল ইসলাম, আব্দুর রশীদ, মাসঊদ রানা, মনীরুযযামান, আবদুর রাযযাক ও যিয়াউল আলী।

❐ **তাঁতিহাটি ফুরক্বানিয়া মাদরাসা, গোদাগাড়ী, রাজশাহী থেকেঃ** মতী'উর রহমান, রুকনুযযামান, মামূন, ওয়াসিম, সেলিম রেযা, নাজমুল হুদা, বকুল, ফারুক আহমাদ, খায়রুল বাছার, ইবরাহীম, শাহীন, সালমা খাতুন, আয়েশা খাতুন, রেশমা, নাসরীন, শাম্মী আখতার, ইসমত আরা, আফরোযা, রোযীনা, সুলতানা, মরিয়ম, সারিনা, রোখসানা, মাসুরা, বিউটি, আরিফা, লায়লী, বুলবুলি ও লিলি খাতুন।

গত সংখ্যার মেধা পরীক্ষার সঠিক উত্তর

১. ৯ নং মাস। মুত্তাক্বী হওয়ার জন্য (বাক্বারাহ ১৮৩)।
২. বাক্বারাহ ১৮৫ নং আয়াত।
৩. ১২টি। সূরা তওবা ৩৬ নং আয়াত।
৪. লাইলাতুল ক্বদর। সূরা ক্বদর ৩নং আয়াত।
৫. আল্লাহ। ১০ থেকে ৭০০ গুণ পর্যন্ত (বুখারী, মুসলিম)।

গত সংখ্যার একটুখানি বুদ্ধি খাটাও-এর সঠিক উত্তর

১. একই সঙ্গে পড়বে।
২. ধীর গতিসম্পন্ন।
৩. ঐ দলে ৩ জন ছেলে আছে।
৪. মন্ত্রীর বোনই বাদশার বেগম।
৫. মুখে উত্তর দিবে।

চলতি সংখ্যার সাধারণ জ্ঞান (কুরআন)

১. আল্লাহ কোথায় সমাসীন আছেন?
২. ক্বিয়ামতের দিন আল্লাহ্র আরশ কতজন ফেরেশতা মাথায় বহন করবেন?
৩. মহান আল্লাহ কাদেরকে ভালবাসেন?
৪. ক্বিয়ামতের দিন আল্লাহ পা বের করে দিয়ে কি নির্দেশ দিবেন?
৫. রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) কিসের তৈরী? আমাদের সাথে রাসূল (ছাঃ)-এর মৌলিক পার্থক্য কি?

সোনামণি সংবাদ

শাখা গঠনঃ

(১২৭) ইসলাবাড়ী জামে' মসজিদ (বালিকা শাখা) বাগমারা, রাজশাহীঃ

প্রধান উপদেষ্টাঃ আলহাজ্জ মুহাম্মাদ আইয়ূব আলী সরকার
উপদেষ্টাঃ মাওলানা মুহাম্মাদ তোফাযযল হোসাইন
পরিচালকঃ মাওলানা মুহাম্মাদ ইবরাহীম হোসাইন

শাখা কর্মপরিষদ ঃ
১. সাধারণ সম্পাদিকা ঃ মুসাম্মাৎ সাবানা খাতুন
২. সাংগঠনিক সম্পাদিকা ঃ মুসাম্মাৎ শাহিনা আখতার
৩. প্রচার সম্পাদিকা ঃ মুসাম্মাৎ আখতারুন নেসা (বড়)
৪. সাহিত্য ও পাঠাগার সম্পাদিকা ঃ মুসাম্মাৎ আখতারুন নেসা (ছোট)
৫. স্বাস্থ্য ও সমাজকল্যাণ সম্পাদিকা ঃ মুসাম্মাৎ সাবিনা আখতার।

(১২৮) নরসিংহপুর বান্দাইখাড়া বহুমুখী ফাযিল মাদরাসা (বালক) শাখা, বাগমারা, রাজশাহীঃ

প্রধান উপদেষ্টাঃ আলহাজ্জ মুহাম্মাদ আইয়ূব আলী সরকার
উপদেষ্টাঃ মুহাম্মাদ ইলিয়াস শাহ
পরিচালকঃ মুহাম্মাদ আমজাদ হোসাইন

শাখা কর্মপরিষদ ঃ
১. সাধারণ সম্পাদক ঃ মুহাম্মাদ বাবর আলী
২. সাংগঠনিক সম্পাদক ঃ মুহাম্মাদ হেলালুদ্দীন
৩. প্রচার সম্পাদক ঃ আবদুল হান্নান
৪. সাহিত্য ও পাঠাগার সম্পাদক ঃ মুহাম্মাদ আবদুর রাযযাক
৫. স্বাস্থ্য ও সমাজকল্যাণ সম্পাদক ঃ মুহাম্মাদ মাজেদুর রহমান।

(১২৯) নরসিংহপুর বান্দাইখাড়া বহুমুখী ফাযিল মাদরাসা (বালিকা) শাখা, বাগমারা, রাজশাহীঃ

প্রধান উপদেষ্টাঃ আলহাজ্জ মুহাম্মাদ আইয়ূব আলী সরকার
উপদেষ্টাঃ মুহাম্মাদ ইলিয়াস শাহ
পরিচালকঃ মুহাম্মাদ আমজাদ হোসাইন

শাখা কর্মপরিষদ ঃ
১. সাধারণ সম্পাদিকা ঃ মুসাম্মাৎ গুল নাহার
২. সাংগঠনিক সম্পাদিকা ঃ মুসাম্মাৎ রেহেনা খাতুন
৩. প্রচার সম্পাদিকা ঃ মুসাম্মাৎ নাসিমা খাতুন
৪. সাহিত্য ও পাঠাগার সম্পাদিকা ঃ মুসাম্মাৎ রোযিনা খাতুন
৫. স্বাস্থ্য ও সমাজকল্যাণ সম্পাদিকা ঃ মুসাম্মাৎ আঙ্গুরা খাতুন।

(১৩০) সিংহমারা দক্ষিণ পাড়া (বালক) শাখা, মোহনপুর, রাজশাহীঃ

প্রধান উপদেষ্টাঃ মুহাম্মাদ আব্দুল বারী
উপদেষ্টাঃ মুহাম্মাদ আব্দুল আযীয
পরিচালকঃ মুহাম্মাদ আফাযুদ্দীন

শাখা কর্মপরিষদ ঃ
১. সাধারণ সম্পাদক ঃ মুহাম্মাদ সোহেলরানা
২. সাংগঠনিক সম্পাদক ঃ সরওয়ার জাহান
৩. প্রচার সম্পাদক ঃ আবদুল মতীন
৪. সাহিত্য ও পাঠাগার সম্পাদক ঃ আব্দুর রউফ
৫. স্বাস্থ্য ও সমাজকল্যাণ সম্পাদক ঃ রেযাউল করীম।

(১৩১) সিংহমারা দক্ষিণ পাড়া (বালিকা) শাখা, মোহনপুর, রাজশাহীঃ

প্রধান উপদেষ্টাঃ মুহাম্মাদ আব্দুল বারী
উপদেষ্টাঃ মুহাম্মাদ আব্দুল আযীয
পরিচালকঃ মুহাম্মাদ আফাযুদ্দীন

শাখা কর্মপরিষদ ঃ
১. সাধারণ সম্পাদিকা ঃ হুসনেয়ারা পারভীন
২. সাংগঠনিক সম্পাদিকা ঃ আমেনা খাতুন
৩. প্রচার সম্পাদিকা ঃ রুনা খাতুন
৪. সাহিত্য ও পাঠাগার সম্পাদিকা ঃ সুমি খাতুন
৫. স্বাস্থ্য ও সমাজকল্যাণ সম্পাদিকা ঃ রুখসানা খাতুন।

(১৩২) সিংহমারা উত্তর পাড়া (বালক) শাখা, মোহনপুর, রাজশাহী।

প্রধান উপদেষ্টাঃ মুহাম্মাদ আব্দুল বারী
উপদেষ্টাঃ মুহাম্মাদ আকবর হোসাইন
পরিচালকঃ মুহাম্মাদ রবীউল ইসলাম।

শাখা কর্মপরিষদ ঃ
১. সাধারণ সম্পাদক ঃ মুহাম্মাদ মুছাব্বির হোসাইন
২. সাংগঠনিক সম্পাদক ঃ মুহাম্মাদ আব্দুর রাযযাক
৩. প্রচার সম্পাদক ঃ আবুবকর
৪. সাহিত্য ও পাঠাগার সম্পাদকঃ আব্দুর রাক্বীব
৫. স্বাস্থ্য ও সমাজকল্যাণ সম্পাদকঃ মুহাম্মাদ সোহেল রানা।

(১৩৩) সিংহমারা উত্তর পাড়া (বালিকা) শাখা, মোহনপুর, রাজশাহী

প্রধান উপদেষ্টাঃ মুহাম্মাদ আব্দুল বারী
উপদেষ্টাঃ মুহাম্মাদ আকবর হোসাইন
পরিচালকঃ মুহাম্মাদ রবী'উল ইসলাম

শাখা কর্মপরিষদ ঃ
১. সাধারণ সম্পাদিকা ঃ মুবাশশিরা পারভীন
২. সাংগঠনিক সম্পাদিকা ঃ নূর জাহান
৩. প্রচার সম্পাদিকা ঃ আরিফা খাতুন
৪. সাহিত্য ও পাঠাগার সম্পাদিকা ঃ শেফালী খাতুন
৫. স্বাস্থ্য ও সমাজকল্যাণ সম্পাদিকা ঃ নূরুন নাহার।

(১৩৪) ফুলবাড়ী ইশা'আতে ইসলাম সালাফীয়া মাদরাসা শাখা, গাইবান্ধা।

প্রধান উপদেষ্টাঃ মাওলানা শিহাবুদ্দীন সুন্নী
উপদেষ্টাঃ মুহাম্মাদ রফীকুদ্দীন
পরিচালকঃ মুহাম্মাদ মুশফিকুর রহমান

শাখা কর্মপরিষদ ঃ
১. সাধারণ সম্পাদক ঃ আব্দুল আলীম
২. সাংগঠনিক সম্পাদক ঃ খাইরুল ইসলাম
৩. প্রচার সম্পাদক ঃ আব্দুল আউয়াল
৪. সাহিত্য ও পাঠাগার সম্পাদক ঃ শহীদুল ইসলাম
৫. স্বাস্থ্য ও সমাজকল্যাণ সম্পাদক ঃ আল-মামূন।

(১৩৫) ফুলবাড়ী দাখিল মাদরাসা (বালক) শাখা, গোবিন্দগঞ্জ, গাইবান্ধা।

প্রধান উপদেষ্টাঃ মাওলানা মুহাম্মাদ উসমান গণী
উপদেষ্টাঃ মুহাম্মাদ আব্দুর রাযযাক
পরিচালকঃ মাওলানা মুহাম্মাদ মানসুরুল ইসলাম
সহকারী পরিচালকঃ আনোয়ার বিন খায়রুযযামান।

শাখা কর্মপরিষদ ঃ
১. সাধারণ সম্পাদক ঃ মুহাম্মাদ 'আবিদুল ইসলাম
২. সাংগঠনিক সম্পাদক ঃ মুহাম্মাদ মুযযাম্মিল মিঁয়া
৩. প্রচার সম্পাদক ঃ মুহাম্মাদ শামীম হোসাইন
৪. সাহিত্য ও পাঠাগার সম্পাদক ঃ মুহাম্মাদ জুয়েল মিঁয়া
৫. স্বাস্থ্য ও সমাজকল্যাণ সম্পাদক ঃ মুহাম্মাদ রায়হান মিঁয়া।

(১৩৬) পূর্ব বর্ষাপাড়া বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় (বালক) শাখা, গোপালগঞ্জ।

প্রধান উপদেষ্টাঃ কামরুযযামান
উপদেষ্টাঃ সেকেন্দার আলী মোল্লা
পরিচালকঃ শাহাবুদ্দীন ফকীর।

শাখা কর্মপরিষদ ঃ
১. সাধারণ সম্পাদক ঃ মাহবুব শিকদার
২. সাংগঠনিক সম্পাদক ঃ শহীদুল ইসলাম
৩. প্রচার সম্পাদক ঃ জিন্নাত মোল্লা
৪. সাহিত্য ও পাঠাগার সম্পাদক ঃ ফয়সাল মোল্লা
৫. স্বাস্থ্য ও সমাজকল্যাণ সম্পাদক ঃ জুয়েল শিকদার।

(১৩৭) বর্ষাপাড়া মাদরাসা মক্তব (বালিকা) শাখা গোপালগঞ্জ।

প্রধান উপদেষ্টাঃ মামূন শিকদার
উপদেষ্টাঃ হাফেয বেলায়েত হোসাইন
পরিচালিকাঃ আছলিয়া খানম।

শাখা কর্মপরিষদ ঃ
১. সাধারণ সম্পাদিকা ঃ নাজমা খানম
২. সাংগঠনিক সম্পাদিকা ঃ শাহিনুর খানম
৩. প্রচার সম্পাদিকা ঃ লাখিয়া সুলতানা
৪. সাহিত্য ও পাঠাগার সম্পাদিকা ঃ কুলছুম খানম
৫. স্বাস্থ্য ও সমাজকল্যাণ সম্পাদিকা ঃ মহূরোন খানম।

(১৩৮) সোনার বাংলা উচ্চ বিদ্যালয় (বালক) শাখা গোপালগঞ্জ।

প্রধান উপদেষ্টাঃ মাওলানা আব্দুল হান্নান (শিক্ষক)
উপদেষ্টাঃ বাবুল হোসাইন (শিক্ষক)
পরিচালকঃ মামূনুর রশীদ শিকদার
সহকারী পরিচালকঃ মুস্তাফীযুর রহমান (শিক্ষক)।

শাখা কর্মপরিষদ ঃ
১. সাধারণ সম্পাদক ঃ মসিউর রহমান
২. সাংগঠনিক সম্পাদক ঃ মুন্সী বাদল
৩. প্রচার সম্পাদক ঃ আনিছ মোল্লা
৪. সাহিত্য ও পাঠাগার সম্পাদক ঃ পলাশ ফকীর
৫. স্বাস্থ্য ও সমাজকল্যাণ সম্পাদক ঃ আমীনুর বিশ্বাস।

(১৩৯) ছত্রকান্দা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় (বালক) শাখা, গোপালগঞ্জ।

প্রধান উপদেষ্টাঃ জাহাঙ্গীর হোসাইন গাযী (শিক্ষক)
উপদেষ্টাঃ বি, এম, আকরাম হোসাইন
পরিচালকঃ মাহমূদুল হাসান (উজ্জ্বল)
সহকারী পরিচালকঃ ফায়েকউয-যামান বিশ্বাস।

শাখা কর্মপরিষদ ঃ
১. সাধারণ সম্পাদক ঃ শামসু বিশ্বাস
২. সাংগঠনিক সম্পাদক ঃ রবীউল মোল্লা

৩. প্রচার সম্পাদক ঃ দিদার মোল্লা
৪. সাহিত্য ও পাঠাগার সম্পাদক ঃ নাসির বিশ্বাস
৫. স্বাস্থ্য ও সমাজকল্যাণ সম্পাদক ঃ ইমরান বিশ্বাস।

(১৪০) পশ্চিম বর্ষাপাড়া (বালক) শাখা, গোপালগঞ্জঃ

প্রধান উপদেষ্টাঃ টিটু গাযী
উপদেষ্টাঃ তারিক বিশ্বাস
পরিচালকঃ মাহবূব শেখ
সহকারী পরিচালকঃ লিটন বিশ্বাস।
শাখা কর্মপরিষদ ঃ
১. সাধারণ সম্পাদক ঃ মামূন মুন্সী
২. সাংগঠনিক সম্পাদক ঃ পলাশ গাযী
৩. প্রচার সম্পাদক ঃ মে'রাজুল
৪. সাহিত্য ও পাঠাগার সম্পাদক ঃ সোহেল শেখ
৫. স্বাস্থ্য ও সমাজকল্যাণ সম্পাদক ঃ বাবু গাযী।

বিঃ দ্রঃ সকল সম্মানিত দায়িত্বশীল ও সুধীদের অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে, 'সোনামণি গঠনতন্ত্রে'র ধারা-১০ ও ১২ মোতাবেক শাখা গঠন করার জন্য বিশেষভাবে অনুরোধ করা গেল। একই ব্যক্তি দু'টির বেশীর শাখার উপদেষ্টা ও পরিচালক হ'তে পারবে না। পরিচালকের বয়স ১৪-৩২ এর মধ্যে হতে হবে। স্ব স্ব যেলার প্রতিযোগিতার বিজয়ীদের তালিকা যেলা পরিচালকের সুপারিশক্রমে কেন্দ্রে পাঠানোর জন্য অনুরোধ করা গেল।

সমাবেশঃ

পবিত্র রামাযান উপলক্ষে বিশেষ সোনামণি সমাবেশ

সোনামণি কেন্দ্রীয় সংগঠনের উদ্যোগে পবিত্র রামাযান মাসে বিশেষ সফরসূচীর আওতায় ৪০টির অধিক সোনামণি সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। এ সময় ৮টি নতুন সোনামণি শাখা ও ২টি যেলা পরিচালনা পরিষদ গঠন করা হয়।

সোনামণিদের সবচেয়ে বড় সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয় ১৬ই ডিসেম্বর বিশ্বনাথপুর আহলেহাদীছ জামে' মসজিদ, চাঁপাই-নবাবগঞ্জে। উক্ত সমাবেশে ৫০০ জন সোনামণি, ২০০ জন মহিলা সংস্থার সদস্যা ও ৩০০ এর অধিক সুধী উপস্থিত ছিলেন। ১৮ই ডিসেম্বর নীলফামারী, ২৯, ৩০ ও ৩১শে ডিসেম্বর যথাক্রমে পঞ্চগড়, গাইবান্ধা (পূর্ব) ও বগুড়ায় অনুষ্ঠিত সমাবেশ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

এছাড়া ১০ই ডিসেম্বর ডাইং পাড়া, ১১ই ডিসেম্বর হরিষার ডাইং, ১২ই ডিসেম্বর ধুরইল, ১৫ই ডিসেম্বর দরিয়াপুর, ১৭ই ডিসেম্বর পশ্চিম ভাটপাড়া ও বাদুড়িয়া, ১৮ই ডিসেম্বর মণিগ্রাম ও হাবাসপুর, ১৯শে ডিসেম্বর গোপালপুর, ২১শে ডিসেম্বর বায়তুল আমান জামে' মসজিদ, ২২শে ডিসেম্বর ধোপাঘাটা, ২৩শে ডিসেম্বর সন্তোষপুর, ২৪শে ডিসেম্বর বজরপুর, ২৫শে ডিসেম্বর ইসলাবাড়ী, ৩১শে ডিসেম্বর নোনামাটিয়াল ও রসূলপুর, ৩রা জানুয়ারী কৃষ্ণপুর, ৫ই জানুয়ারী খাসখামার (দুর্গাপুর) এ সোনামণি সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। প্রতিটি সমাবেশে ৫০ থেকে ২৫০ জন সোনামণি উপস্থিত ছিল এবং তাদের মধ্যে অত্যন্ত আনন্দমুখর ও আকর্ষণীয় ভাব বিরাজ করছিল।

সোনামণি কেন্দ্রীয় পরিচালক মুহাম্মাদ আযীযুর রহমান, সূরা আহযাবের ২১ নং আয়াতের আলোকে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর আদর্শে সোনামণিদের চরিত্র গঠনের উপর গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা রাখেন। রাসূল (ছাঃ) সকল কাজের তথা দিক ও বিভাগের একমাত্র উত্তম নমুনার আলোচনা করতে গিয়ে তিনি খাওয়ার, চুল আচড়ানোর, জুতা পরার নিয়মনীতি ও কথা বলার আদব কায়েদাহ এবং সর্বোপরি পবিত্র রামাযানের গুরুত্ব ও মর্যাদার উপর অত্যন্ত সুন্দর ও সাবলীলভাবে সোনামণিদের উদ্দেশ্যে প্রশিক্ষণমূলক বক্তব্য রাখেন। তিনি বাংলাদেশের সকল সোনামণিদেরকে এ আদর্শ শিশু-কিশোর সংগঠনে যোগদান করে রাসূল (ছাঃ)-এর আদর্শ যথাযথ অনুসরণ করে কুসংস্কারমুক্ত ভবিষ্যৎ ইসলামী সমাজ ও দেশ গড়ার আহবান জানান। সোনামণি কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক শিহাবুদ্দীন আহমাদ ও আবুবকর ছিদ্দীক্ব এবং সোনামণি রাজশাহী যেলা ও মহানগরীর পরিচালনা পরিষদ উল্লেখিত সমাবেশ সমূহে সোনামণি সংগঠনের বিভিন্ন বিষয়ের উপর গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা রাখেন।।

মাসিক আত-তাহরীক-এর
বিশেষ সংখ্যা প্রকাশে
আমাদের আন্তরিক শুভেচ্ছা
মুক্তি ক্লিনিক
লক্ষ্মীপুর, রাজশাহী।

মহিলাদের পাতা

আদর্শ মাতা

*-আনজুমানারা সুলতানা**

ইসলামী সমাজ ব্যবস্থায় সন্তানের প্রতি মাতার ভূমিকা ও দায়িত্ব-কর্তব্য কম নয়। একজন মাতার উপর নির্ভর করে নতুন প্রজন্মের ভাল-মন্দ। নেপোলিয়ান তাই বলেছিলেনঃ "Give me a good mother I shall give you a good nation." 'আমাকে একজন ভাল মা দাও! আমি তোমাদের একটি ভাল জাতি উপহার দিব'। পিতার দায়িত্ব-কর্তব্য সমূহ পালনে সর্বতোভাবে সাহায্য-সহযোগিতা করা মাতার দায়িত্ব। তাছাড়াও মাতার একক কিছু দায়িত্ব-কর্তব্য রয়েছে, যা পিতার পক্ষে পালন করা আদৌ সম্ভব নয়। জনৈক ব্যক্তি মহানবী (ছাঃ)-এর নিকট এসে জিজ্ঞেস করল, হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)! আমার সাহচর্যে কার অধিকার সবচেয়ে বেশী? তখন মহানবী (ছাঃ) বললেন, তোমার মা। লোকটি বলল, তারপর কে? হুযূর (ছাঃ) বললেন, তোমার মা। লোকটি আবারও জিজ্ঞেস করল, তারপর কে? হুযূর (ছাঃ) বললেন, তোমার পিতা। অপর এক বর্ণনায় আছে, হুযূর (ছাঃ) বললেন, তোমার মা, অতঃপর তোমার মা, অতঃপর তোমার মা, তারপর তোমার বাবা, তারপর তোমার নিকটতম আত্মীয়-স্বজন এবং বন্ধু-বান্ধব' *(বুখারী ও মুসলিম)*।

আলোচ্য হাদীছ হ'তে মাতার ভূমিকা, দায়িত্ব-কর্তব্য পালনের ব্যাপকতা এবং গুরুত্বের স্পষ্টতা বুঝা যায়। মাতাকে একাধারে গর্ভধারিণী, স্তন্যদায়িনী, পালনকারিনী, সেবিকা, ধাত্রী, শিক্ষয়িত্রী এবং অভিভাবিকা প্রভৃতি বহু দায়িত্ব পালন করতে হয়। মহানবী (ছাঃ) মাতার ভূমিকা সম্পর্কে বলেন,

اَلْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَى بَيْتِ زَوْجِهَا وَوَلَدِهِ

'মহিলা নিজের স্বামীর গৃহ ও সন্তানের যিম্মাদার' (বুখারী ও মুসলিম)।

মাতাকে পরিবারের সকল সদস্যের সুখ-সুবিধা, খাওয়া-দাওয়া, সেবা-যত্ন, লালন-পালন, শিক্ষা-স্বাস্থ্য প্রভৃতির প্রতি সর্বদা লক্ষ্য রাখতে হয়। তাই ইসলাম মাতাকে বিশেষ গুরুত্ব দান করেছে।

মাতার দায়িত্ব ও কর্তব্য সমূহ নিম্নরূপঃ

(১) গর্ভধারণ ঃ বিশ্ব প্রভুর যে নে'মত মায়ের গর্ভে আশ্রয় নিচ্ছে তাকে সাদরে ও সানন্দে গ্রহণ করা জননীর কর্তব্য। আর সন্তানের কল্যাণার্থে এ সময় তার দেহ, মন ও মানসিকতাকে সুস্থ রাখতে হবে। সৎ চিন্তা, কুরআন-হাদীছ এবং আদর্শ মনীষীদের জীবনী পাঠ করতে হবে এবং শুনতে হবে। হালাল খাবার খেতে হবে। খারাপ ও অশ্লীলতা থেকে বেঁচে থাকতে হবে। কেননা এ সময়কার মায়ের আচরণ ও মনোভাব সন্তানের ওপর যথেষ্ট প্রভাব ফেলে। মায়ের এ অবস্থার কথা বর্ণনা করতে গিয়ে আল্লাহপাক বলেন,

حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ

'তার মাতা কষ্টের পর কষ্ট সহ্য করে তাকে গর্ভে ধারণ করেছে' (লুক্বমান ১৪)।

তারপর ভূমিষ্ঠ হওয়ার সময়কার এবং দুধ পান করানোর সময়কার কষ্টের কথা বলতে গিয়ে আল্লাহপাক এরশাদ করেন, حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا

'মাতা সন্তানকে গর্ভে ধারণ করেছে অতি কষ্টে এবং প্রসব করেছে সীমাহীন কষ্টে' (আহক্বাফ ১৫)।

(২) দুধ পান করানোঃ নিজের গর্ভে সন্তানকে আশ্রয় দান, জন্মদান এবং তার প্রবৃদ্ধির জন্য নিজের বুকের দুধ পান করানো প্রত্যেক মায়েরই স্বভাবজাত প্রবৃত্তি। এটি মায়ের উপর সন্তানের অধিকার ও মাতৃত্বের দাবীও বটে। সন্তানের স্বাস্থ্য, মন-মানস, রুচি, মেধা গঠনে মায়ের দুধের বিকল্প নেই। পবিত্র কালামে পাকে ইরশাদ হয়েছে-

اَلْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ اَوْلاَدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ اَرَادَ اَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ –

'মায়েরা নিজের সন্তানকে পূর্ণ দু'বৎসর দুধ পান করাবে যারা দুধ পানের পূর্ণ মেয়াদ সমাপ্ত করতে চায়' (বাক্বারাহ ২৩৩)।

(৩) সন্তানের সেবা-যত্নঃ মাতার যাবতীয় কর্মকাণ্ডের প্রকৃত ক্ষেত্র হ'ল তার গৃহ এবং আসল কৃতিত্ব হ'ল সন্তানের দেখাশোনা ও তার প্রতিপালনে সুন্দর সেবা দান। ইসলাম এ খেদমতকেই তার দায়িত্বে অর্পণ করেছে। এটাই তার সাফল্যের প্রকৃত ময়দান এবং এটাই তার আসল কৃতিত্ব। এ ব্যাপারে তাকে ক্বিয়ামতের দিন জবাবদিহি করতে হবে। মহানবী (ছাঃ) বলেন, اَلْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ فِىْ بَيْتِ زَوْجِهَا وَهِىَ مَسْئُوْلَةٌ عَنْ رَعِيَّتِهَا

'মহিলারা স্বামীর গৃহের যিম্মাদার। আর এ ব্যাপারে সে জিজ্ঞাসিত হবে' *(বুখারী ও মুসলিম)*।

পাশ্চাত্য মনীষী ডঃ জুড লিখেছেন- 'যদি মহিলারা নিজের গৃহ দেখাশোনা এবং সন্তান লালন-পালনের দায়িত্ব পালনেই সন্তুষ্ট থাকে, তাহ'লে আমার পূর্ণ আস্থা রয়েছে যে, এ দুনিয়া জান্নাতের প্রতীক হয়ে যাবে' *(ইসলামী সমাজ ব্যবস্থা পৃঃ ২৪৫)*।

(৪) সন্তানের প্রাথমিক শিক্ষাদানঃ সন্তানের প্রাথমিক শিক্ষার দায়িত্ব মাতার উপরই ন্যাস্ত। যেহেতু শিশুরা মায়ের সান্নিধ্যেই বেশীক্ষণ থাকে, তাই মাতাই হ'লেন শিশুর প্রথম ও

**হাড়াভাঙ্গা, মেহেরপুর।*

শ্রেষ্ঠ শিক্ষয়িত্রী। মায়ের অনুকরণই শিশুরা বেশী করে থাকে। তাই মাকে এ সময় অত্যন্ত সতর্কতার সাথে ইসলামী আদর্শ মোতাবেক চলতে হবে এবং শিশুকে ইসলামী আদর্শ মোতাবেক গড়ে তুলতে হবে। সন্তানের শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের ব্যাপারে যদিও পিতাকেই দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে, তবুও সন্তান লালন-পালনে মায়ের তৎপরতা বিশেষ গুরুত্বের দাবীদার। এতে মায়েরই সিংহভাগ প্রচেষ্টা থাকে। সন্তানের শারীরিক যত্ন ও লালন-পালনে মায়ের একনিষ্ঠ প্রচেষ্টার যেমন প্রয়োজন, ঠিক তেমনি সন্তানের শিক্ষা দীক্ষাতেও তার বিশেষ অংশ রয়েছে। মায়ের প্রশিক্ষণেই শিশু সন্তান যোগ্য হয়ে গড়ে ওঠে। ফলে দেশ ও জাতির সম্মান বৃদ্ধি পায়। সাথে সাথে মাতা-পিতার ভাগ্যেও সুখ-সমৃদ্ধি ঘটে।

(৫) পিতৃহীন সন্তানকে প্রতিষ্ঠিত করাঃ পিতার মত মাতাও সন্তানকে সমাজে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য সম্ভাব্য সব রকমের সহযোগিতা করবে। পিতার অবর্তমানে মাতাকেই এ গুরু দায়িত্ব পালন করতে হবে।

কোন মা যদি নিজের সন্তানের জন্য ব্যয় করেন তাহ'লে সে ছওয়াব ও পুরস্কার পাবেন। হযরত উম্মে সালামা (রাঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, আমি নবী করীম (ছাঃ)-কে জিজ্ঞেস করলাম, আমি কি আবু সালামার (রাঃ) পুত্রদের পিছনে ব্যয় করার জন্য ছওয়াব পাব? আমি তো তাদেরকে এভাবে ছেড়ে দিতে পারি না যে, তারা পথে-প্রান্তরে ঘুরে বেড়াবে। তারা আমারই পুত্র। তিনি বললেন, হ্যাঁ, তুমি তাদের পিছনে ব্যয় করলে অবশ্যই ছওয়াব পাবে' *(বুখারী, মুসলিম)*।

মোটকথা সন্তানের সামগ্রিক মঙ্গল ও কল্যাণার্থে এবং দেশ ও জাতির স্বার্থে নিজেদের নয়নের মণি, কলিজার টুকরা সন্তানদেরকে আদর্শ সন্তান রূপে গড়ে তোলা ও সমাজে সুপ্রতিষ্ঠিত করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা পিতামাতার অপরিহার্য কর্তব্য। আর এ জন্য তাঁরা মহান আল্লাহ্‌র নিকট থেকে প্রতিদানও পাবেন। আল্লাহ আমাদের তাওফীক দিন- আমীন!!

নগদ যা পাও

গত ১৭ই জানুয়ারী ২০০০ ইনকিলাবের পাতায় 'এ কোন উন্মাদনা' শীর্ষক প্রতিবেদনটি চোখে পড়ল। আমরা একটি মুসলিম দেশের নাগরিক। বর্ষ, শতাব্দী ও সহস্রাব্দ বরণ ইসলামে বৈধ নয়। অনুষ্ঠানের নামে গভীর রাত অব্দি নারী-পুরুষের অবাধ বিচরণ নিঃসন্দেহে অশোভনীয়।

সব বয়সী প্রেমিক মনই নীল রঙের প্রতি একটু বেশি আসক্ত থাকে, চাই সে হৌক কারো শাড়ীর আঁচল অথবা নারীর নীলাভ চোখের চাহনী কিংবা নীল খাম চিঠি। সেজন্য প্রথম দেখাতেই ওই তরুণীটিকে ভাল না লেগে পারেনি। বিশেষ করে পুরুষগুলো ছিল নারী লিপ্সু। গভীর রাতে একাকী পথচলা তরুণীকে দেখে তারা হয়ত কবির সুরে ভেবেছিল 'নগদ যা পাও হাত পেতে নাও, বাকীর খাতা শুন্য থাক'।

অপরদিকে দোয়েল চত্বরে যার প্রাইভেটকার থাকল, সেই মেয়ে কেন শামসুন নাহার হলের সামনে দিয়ে একা হাঁটছে? গাড়ীটি হলের সামনে রাখলে তো কোন ক্ষতি ছিল না। আমার পক্ষপাতিত্বকে কেউ-ই সহজভাবে মানবেনা জানি, তবুও বলছি, ওই মেয়ে যদি এত রাতে ঘর ছেড়ে ঐ পিচঢালা পথটাকে ভাল না বাসত তবে হয়ত এ বিপত্তি ঘটত না। পুরুষগুলোর দোষ অবশ্যই স্বীকার করি। কিন্তু মেয়েরা যদি তাসলীমা নাসরীনের মত সমমর্যাদার শ্লোগান না দিয়ে মা আয়েশার মত ঘরমুখো হ'ত তবে কি এ ধরনের অঘটন ঘটত? পুরুষরা তো আমাদেরকে ঘর থেকে টেনে-হেঁচড়ে রাস্তায় নামাতে পারত না। ক্ষুধার্ত লাওয়ারীশের দল তো ঐ নীল শাড়ী পরা তরুণীকে ঘর থেকে বের করে আনে নি। পেয়েছে মিলেনিয়াম উদযাপনের অনুষ্ঠানে। তাও আবার গভীর রজনীতে একা একা। বোনটির নিকট আমার প্রশ্ন- ঢাকার রাজপথকে কেন এত নিরাপদ ভাবলে যে, রাত ২টা ৪০ মিনিটে একা রাস্তায় হাঁটছিলে? প্রতিবেদক খ.ম.হারুণ অবশ্য ওইসব পুরুষদের জন্মের স্বাভাবিকতা ও অস্বাভাবিকতা সম্পর্কে প্রশ্ন তুলেছেন। আমি বলব, অস্বাভাবিকতা নিয়ে কেউ জন্মায় না। বরং পরিবেশের কারণেই অস্বাভাবিকভাবে বেড়ে উঠতে বাধ্য হয়। আজ যদি আমাদের দেশ সত্যিকার অর্থে ইসলামী বিধান মত চলত, তবে মেয়েদেরকে পুরুষের উন্মাদনার শিকার হ'তে হ'ত না। দুর্ভাগ্য, পাশ্চাত্য সংস্কৃতি আর ডিশ এন্টিনার হিংস্র থাবায় আমাদের সমাজ প্রতিনিয়ত বিধ্বংস হচ্ছে। ধ্বংস হচ্ছে যুব চরিত্র।

ইসলাম নারীকে মাতৃত্বের চির গৌরব দান করেছে। জাহেলী যুগের নিগৃহিত, নির্যাতিত ও বঞ্চিত নারীদের সম্মানিত করেছে। দিয়েছে উত্তরাধিকারের সুমহান মর্যাদা। অথচ সে নারী আজ তার মাতৃত্বের মর্যাদা হারাতে বসেছে। প্রতিনিয়ত নির্যাতিত হচ্ছে। বঞ্চিত হচ্ছে তার অধিকার থেকে। কিন্তু কেন? এ জন্য দায়ী কে? শুধু কি একচেটিয়া পুরুষদের ঘাড়ে দোষ চাপিয়ে নিজেরা বাঁচার চেষ্টা করব? না, এজন্য মূলতঃ নারীরাই দায়ী। নারীরাই আজ সমানাধিকারের ধূয়া তুলে রাস্তায় নেমেছে। মিছিল, মিটিং সহ যাবতীয় পুরুষ সুলভ আচরণ করছে। সঙ্গত কারণেই নারীর আজ এ দশা।

সেদিন যুবকরা মেয়েটিকে সম্মানের সাথে তার গন্তব্যে পৌঁছে দিলেই হয়ত সমীচীন হ'ত। কিন্তু আমরা মেয়েরা যখন রাত-দিন না ভেবেই রাস্তায় নেমে পুরুষের সামনে বিভিন্ন আঙ্গিকে নিজেকে উপস্থাপন করছি, তখন গভীর রাতের পশুমন জেগে ওঠায় পুরুষের দোষ কতটুকু? রাস্তা আর ময়দানকে ঘর না ভেবে সত্যিকারভাবে ঘরোয়া হ'লে কারো সাধ্য ছিল না রাস্তার মাঝখানে বিবস্ত্র করার।

অতএব মুসলিম বোন আসুন! আমরা নিজস্ব গণ্ডির মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকি। তবেই হবে নারী মুক্তি। আমরা হব সভ্য সন্তানের জননী। যাদের জন্মের অস্বাভাবিকতা নিয়ে অদূর ভবিষ্যতে আর প্রশ্ন উঠবেনা। পুরুষ ভাইদের উদ্দেশ্যে বলছি, ঐ মেয়েটিতো হ'তে পারত আপনার বোন বা মেয়ে। আর তারা যদি এরকম কোন ঘটনার সম্মুখিন হ'ত, তখন কি আপনি এ ঘটনাকে নিরবে সমর্থন জানাতেন, না প্রতিবাদী হতেন? নিশ্চয়ই প্রতিবাদী হতেন। তবে অন্যের বেলায় কেন এরকম ন্যাক্কারজনক ভূমিকা। সত্যিকার শিক্ষিত মানুষ হ'তে চেষ্টা করুন। নিজে আদর্শবান হউন এবং অন্যকে আদর্শবান হ'তে সাহায্য করুন। আল্লাহপাক আমাদেরকে হেদায়াত দান করুন।-আমীন!

❒ *ওয়াহীদা*
এম, এ, শেষ বর্ষ (ইসলামী শিক্ষা)
বি.এল.কলেজ, খুলনা।

স্বদেশ-বিদেশ

স্বদেশ

শিক্ষাঙ্গণ থেকে সন্ত্রাস নির্মূল করতে ছাত্র রাজনীতি বিলুপ্ত করুন!

-রাষ্ট্রপতি সাহাবুদ্দীন আহমাদ

রাষ্ট্রপতি বিচারপতি সাহাবুদ্দীন আহমাদ শিক্ষাঙ্গণে সন্ত্রাস নির্মূলের লক্ষ্যে প্রধান বিলুপ্ত এবং যেকোন ছাত্র সংগঠনের সঙ্গে তাদের সংশ্লিষ্টতা সম্পূর্ণ রূপে বন্ধ করার আহবান জানিয়েছেন। গত ২২শে জানুয়ারী অর্থমন্ত্রী শাহ এএমএস কিবরিয়ার লেখা 'বাংলাদেশ অ্যাট দ্য ক্রসরোডস' এবং 'দ্য এমার্জিং নিউ ওয়ার্ল্ড অর্ডার', নামক বই দু'টির প্রকাশনা অনুষ্ঠানে রাষ্ট্রপতি এ আহবান জানান। রাষ্ট্রপতি সাহাবুদ্দীন আহমাদ বলেন, যদি সরকার ও প্রধান বিরোধীদল তাদের ছাত্র সংগঠন বিলুপ্ত করে এবং ছাত্রদের যেকোন সংগঠনের সঙ্গে সংশ্লিষ্টতা সম্পূর্ণ রূপে ঘুচিয়ে ফেলে তাহ'লে শিক্ষাঙ্গণ থেকে সন্ত্রাস এমনিতেই নির্মূল হয়ে যাবে। তিনি বলেন, আমার মনে হয় বর্তমানে বই পড়া মানুষের অনভ্যাস হয়ে দাঁড়িয়েছে। রাজনৈতিক নেতা-কর্মীদের ক্ষেত্রে এ কথাটি বেশী প্রযোজ্য। রাষ্ট্রপতি রাজনৈতিক নেতা-কর্মীদের উদ্দেশ্যে প্রশ্ন তোলেন, যদি তাঁরা একে অপরের সমালোচনা ও নিন্দা চর্চায় সব সময় ব্যস্ত থাকেন, তাহ'লে বই পড়ার সময় পাবেন কখন? প্রকাশনা অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন বই দু'টির লেখক শাহ এএমএস কিবরিয়া, 'দ্য ডেইলি ষ্টার' সম্পাদক মাহফুয আনাম, বাংলা একাডেমির মহাপরিচালক ডঃ সৈয়দ আনোয়ার হোসায়েন, সাবেক পররাষ্ট্র সচিব ব্যারিষ্টার এ কে এইচ মোর্শেদ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলর অধ্যাপক এ কে আজাদ চৌধুরী প্রমুখ।

সন্ত্রাসীদের গ্রেফতার করার সময় পালিয়ে গেলে গুলি করার নির্দেশ

নবনিযুক্ত ঢাকা মহানগর পুলিশ কমিশনার মতীউর রহমান গত ১৮ই ডিসেম্বর সাংবাদিকদের সঙ্গে এক সৌজন্য সাক্ষাৎকারে বলেছেন, নগরবাসীর নিরাপত্তার স্বার্থে ছিনতাইকারী, মাস্তান ও সন্ত্রাসীদের গ্রেফতার করতে না পারলে পালিয়ে যাবার সময় এদের গুলি করা হবে। রাজধানীর আইন-শৃংখলা পরিস্থিতির অবনতি, ছিনতাই, রাহাজানি, মাস্তানি ও সন্ত্রাস বেড়ে যাওয়ায় অপরাধীদের ভীত-সন্ত্রস্ত করে তোলার জন্য এ ধরনের পদক্ষেপ নেয়া হচ্ছে বলে তিনি জানান। তিনি আরো জানান, সন্ত্রাসীদের গ্রেফতার করতে গেলে সন্ত্রাসী ও ছিনতাই কারীদের সাথে পুলিশের সংঘাত ও বন্দুক যুদ্ধের বহু ঘটনা ঘটেছে। সময় গোয়েন্দা পুলিশের ডেপুটি কমিশনার আব্দুল হান্নান বলেন, সাধারণ নাগরিকদের মত আমিও নিরাপত্তার অভাব বোধ করি। তিনি নিজের অভিমত ব্যক্ত করে বলেন, ছিনতাইকারী, মাস্তান ও সন্ত্রাসীরা অপরাধ ঘটিয়ে নির্বিঘ্নে পালিয়ে যেতে পারে এমন সুযোগ দেওয়া ঠিক নয়। প্রয়োজনে এদের গুলি করে আহত করে গ্রেফতার করতে হবে। পুলিশ কমিশনার বলেন, ছিনতাইকারীসহ অপরাধীরা যখন দেখবে রাজপথে ছিনতাই করার সময় পুলিশ এদের গুলি করছে, তখন তাদের মধ্যেও পুলিশের ভীতি কাজ করবে।

লণ্ডনের স্কুল গুলোতে বাংলাভাষার প্রচলন

লন্ডনের স্কুলের ছাত্র/ছাত্রীরা ইংরেজীর পর সবচেয়ে বেশী কথা বলে বাংলা ভাষায়। প্রায় আড়াই'শ বছর পূর্বে ইংরেজরা বাংলাদেশে এসে ইংরেজী ভাষা চালু করেছিল। আর এখন বাঙালীরাই ইংরেজদের দেশে যেয়ে বাংলা ভাষা চালু করে এক রকম প্রতিশোধ নিচ্ছে। আর এটা সম্ভব হয়েছে লন্ডনে বসবাসরত প্রবাসী বাংলাদেশীর সংখ্যা অধিক হওয়ায়।

সম্প্রতি লন্ডনের কয়েকজন বিশিষ্ট শিক্ষাবিদদের পরিচালিত এক গবেষণায় দেখা গেছে, লন্ডনের স্কুল গুলোতে ছাত্র/ছাত্রীরা তিনশ'রও বেশী ভাষায় কথা বলে। স্কুলে যাচ্ছে এমন সাড়ে আট লাখ ছাত্র/ছাত্রীর প্রায় দুই তৃতীয়াংশ কথা বলে ইংরেজীতে। তার পরই রয়েছে বাংলা ভাষার স্থান। বাংলা ভাষা-ভাষী ছাত্র/ছাত্রীদের সংখ্যা প্রায় সাড়ে ৪০ হাযার। এর পরই রয়েছে পর্যায়ক্রমে পাঞ্জাবী, গুজরাটী, হিন্দী, উর্দূ, তুর্কী, চীনা ও আরবী ভাষার।

এক বোটায় ৪২টি লাউ!

লাউ গাছের একটি বোটায় ৪২টি লাউ ধরেছে। এ অবিশ্বাস্য ঘটনাটি ঘটেছে রাজশাহী মহানগরীর রাজপাড়া থানার বসুয়া গ্রামের রহমত আলীর বাড়ীতে। গত মৌসুমে লাগানো রহমত আলীর লাউগাছটিতে লাউ ধরেছিল মাত্র ১টি। মৌসুম শেষে লাউ গাছটি কেটে ফেলার নিয়ম থাকলেও গৃহকর্তা গাছটি কাটেনি। আর এই পুরাতন গাছটিতেই এবছর শুধু মাত্র ১টি বোটায় ৪২টি লাউ ধরে চাঞ্চল্য সৃষ্টি করেছে। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্ভিদ বিজ্ঞান বিভাগের ছাত্র/শিক্ষক লাউগাছটির বিভিন্ন পরীক্ষা নিরীক্ষা করছে। লাউগাছটি দেখার জন্য প্রতিদিন লোকজন ভীড় জমাচ্ছে।

রাজশাহী শিক্ষাবোর্ডে ২৪ হাযার পরীক্ষার্থীর এইচএসসি পরীক্ষায় অংশগ্রহণ অনিশ্চিত

রাজশাহী শিক্ষাবোর্ডের অধীনে অনুষ্ঠিতব্য চলতি বছরের এইচএসসি পরীক্ষায় ২৪ হাযার ছাত্র/ছাত্রীর অংশগ্রহণ

অনিশ্চিত হয়ে পড়েছে। এই বিপুল সংখ্যক ছাত্র/ছাত্রীর কাগজ পত্রে ত্রুটি ধরা পড়ায় এ অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে। শিক্ষা বোর্ড সূত্রে জানা গেছে, চলতি ২০০০ সালে অনুষ্ঠিত এইচএসসি পরীক্ষায় অংশগ্রহণকারী ছাত্র/ছাত্রীর প্রবেশ পত্র ইস্যুর কাজ চলছে। কিন্তু প্রায় ৫৮টি কলেজের ২৪ হাযার ছাত্র/ছাত্রীর রেজিষ্ট্রেশন নম্বর এবং এসএসসি পরীক্ষার সার্টিফিকেটে ত্রুটি ধরা পড়ায় তাদের ক্রমে প্রবেশপত্র ইস্যু করা সম্ভব হচ্ছে না। অন্যান্য কাগজ পত্রে ত্রুটি থাকায় নতুন ভাবে রেজিষ্ট্রেশন নম্বরও দেয়া যাচ্ছে না। এ কারণে বোর্ড কর্তৃপক্ষ কলেজগুলোকে এসব ছাত্র/ছাত্রীর প্রয়োজনীয় কাগজ পত্র দাখিল করার জন্য নির্দেশ দিয়েছিলেন। কিন্তু সংশ্লিষ্ট কলেজ প্রধানগণ এ নির্দেশের প্রতি সাড়া দিয়ে বোর্ডে প্রয়োজনীয় কাগজ পত্র জমা দেয়নি। বোর্ড কর্তৃপক্ষ বিষয়টি খতিয়ে দেখতে একটি তদন্ত কমিটি গঠন করেছে। এই কমিটি ২৪ হাযার ছাত্র/ছাত্রীর এসএসসি পরীক্ষার সার্টিফিকেট, মার্কসিট, রেজিষ্ট্রেশন নম্বরসহ অন্যান্য কাগজ পত্র খতিয়ে দেখা শুরু করেছে। সূত্রটি জানায় এসব ছাত্র/ছাত্রী এসএসসি পরীক্ষার ভুয়া অথবা জাল সার্টিফিকেট ও মার্কসিট দাখিল করে কলেজে ভর্তি হয়েছিল। ইতিমধ্যে ১৭৯ জন ছাত্র/ছাত্রীর এসএসসি পরীক্ষার মার্কসিট ও সার্টিফিকেট জাল প্রমাণিত হওয়ায় তা বাতিল করা হয়েছে। অন্যান্য ছাত্র/ছাত্রীর সার্টিফিকেট ও মার্কসিটে নানা ভুল ধরা পড়ছে।

১১ জন বাংলাদেশী অপহৃত

গত ডিসেম্বর ও জানুয়ারী মাসে ভারতীয় দুষ্কৃতিকারী এবং ভারতীয় সিমান্তরক্ষী বাহিনী বাংলাদেশে অন্যায়ভাবে অনুপ্রবেশ করে ১১ জন বাংলাদেশী নাগরিককে অপহরণ করে নিয়ে গেছে। অপহৃতদের মধ্যে রয়েছে নওগাঁ যেলার ধামুইরহাট এলাকার দুর্গাপুরের ২ জন শিশুসহ ৩ জন ও রাজশাহী যেলার গোদাগাড়ীর ৮ জন জেলে।

জানা গেছে, গত ৮ ডিসেম্বর ভারতের পশ্চিম দিনাজপুর যেলার বালুয়াঘাট এলাকার কুখ্যাত সন্ত্রাসী যোথিষ্টি ও অমলের নেতৃত্বে একদল সন্ত্রাসী ধামুইরহাট সীমান্তের দুর্গাপুর গ্রামে হামলা চালিয়ে লুটপাটের চেষ্টা করে। এ সময় গ্রামের লোকজন ঐক্যবদ্ধ হয়ে যোথিষ্টি ও অমলকে আটক করে। অন্যরা পালিয়ে যায়। যোথিষ্টি ও অমলের আটকের সংবাদ পেয়ে ভারতীয় সন্ত্রাসীরা ঐদিন সন্ধ্যায় পুনরায় হামলা চালিয়ে হুমায়ুন (৩৪) নামের এক বাংলাদেশী নাগরিককে অপহরণ করে নিয়ে যায়। এছাড়া ঐ গ্রাম থেকে গত ৬ ডিসেম্বর ভারতীয় দুষ্কৃতিকারীরা ১ জোড়া গরু সহ হাসানুল (১৬) ও ওবায়দুল (১৭) নামের দুই কিশোরকে অপহরণ করে নিয়ে যায়।

এদিকে গত ১৪ জানুয়ারীতে ভারতের কিছু সন্ত্রাসী ও বিএসএফ সদস্যরা রাজশাহী যেলার গোদাগাড়ীর জলসীমানায় মাছ ধরারত অবস্থায় ২টি নৌকাসহ ৮ জন জেলেকে অপহরণ করে নিয়ে গেছে। অপহরণকারীরা জেলেদের প্রথমে ভারতের কুঠিবাড়ী সীমান্ত এলাকায় নিয়ে গিয়ে মাছ লুট করে নেওয়ার পর ফাঁড়িতে নিয়ে তাদের উপর নির্যাতন চালায়। নির্যাতনের পর ৬ জন জেলেকে ছেড়ে দিলেও হাসমত (৩০) ও মনীরুল (৩২) নামের ২ জন জেলেকে ছেড়ে দেয়নি।

উল্লেখ্য, গত বছরের মে মাসে একই এলাকা থেকে ভারতীয় দুষ্কৃতিকারী ও বিএসএফ সদস্যরা ২২ জন জেলেকে অপহরণ করেছিল।

চলতি অর্থ বছরে দেশে খাদ্য ঘাটতি ১১ লাখ ১৩ হাযার মেট্রিক টন

চলতি অর্থ বছরে দেশের খাদ্য ঘাটতির পরিমাণ ১১ লাখ ১৩ হাযার মেট্রিক টন। গত ১৬ জানুয়ারী সংসদে এক প্রশ্নের জবাবে খাদ্য মন্ত্রী আমীর হোসেন আমু এ কথা জানান।

গত বছরে সারাদেশে খুন হয়েছে ২৩৯৪ জন নারী নির্যাতনের শিকার ১৬৪৬ জন

গত বছর ১লা জানুয়ারী থেকে ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত সারা দেশে ২৩৯৪ জন খুন হয়েছে। একই সময়ে ১৮৭ জন তরুণী এসিড নিক্ষেপ ও ১৫৮ জন মহিলা যৌতুক নির্যাতনের শিকার হয়েছে। বাংলাদেশ মানবাধিকার ব্যুরো এ তথ্য জানিয়েছে।

মানবাধিকার ব্যুরোর মহাসচিব এ্যাডভোকেট শাহজাহান গত ২রা জানুয়ারী প্রকাশিত তথ্যে জানিয়েছেন, গত বছরে দেশে পুলিশ ও কারা হেফাযতে মারা গেছে ২৩ জন, ধর্ষণের শিকার হয়েছে ৮শ জন মহিলা, অপহৃত হয়েছে ৫০১ জন। এছাড়া গত বছরে রাজনৈতিক সহিংসতা এবং ভাষা সন্ত্রাসের প্রয়োগ হয়েছে মাত্রাতিরিক্ত। হরতালে নিহত হয়েছে ৩৪ জন। এছাড়া আত্মহত্যা জনিত অপমৃত্যু হয়েছে ৬৮৯ জনের। একই বছরে দুর্ঘটনা জনিত মৃত্যুর সংখ্যা ২১৪৪টি। তিনি বলেন, আমরা যে রিপোর্ট প্রকাশ করলাম তা প্রকৃত চিত্রের চেয়ে অনেক কম। কারণ, অনেকেই নিজেদের সম্মান রক্ষা এবং সন্ত্রাসীদের ভয়ে তাদের উপর অমানবিক নির্যাতন নীরবে সহ্য করেছে।

ছিনতাইকারীদের হাতে যুগ্ম সচিব খুন

ছিনতাইকারীদের নির্মম ছুরিকাঘাত কেড়ে নিয়েছে স্থানীয় সরকার পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রাণালয়ের যুগ্ম সচিব নিকুঞ্জ বিহারীর প্রাণ। এই মর্মান্তিক ঘটনাটি ঘটেছে গত ১৩ জানুয়ারী। ঐ দিন তিনি ঈদের ছুটি শেষে চট্টগ্রাম থেকে ট্রেনযোগে ঢাকায় আসেন। ভোর ৬টায় কমলাপুর ষ্টেশনে নামার পর রিক্সাযোগে আজিমপুরস্থ সরকারী বাসভবনে রওয়ানা দেন। কিন্তু পথিমধ্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের জগন্নাথ হলের মোড়ে ল্যাবরেটরী স্কুলের

গেটের পূর্ব পার্শ্বে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের অনতিদূরে ১০/১২ জন ছিনতাইকারী তার পথরোধ করে টাকা দাবী করে। নিকুঞ্জ বিহারী একজন সরকারী উচ্চ পর্যায়ের কর্মকর্তা হ'লেও ছিনতাইকারীদের কাছে কাতর। তাই তিনি তার পকেট হ'তে ১০০ টাকার ১টি নোট বের করে দেন। কিন্তু ছিনতাইকারীরা ১০০ টাকায় সন্তুষ্ট না হয়ে ছুরি দিয়ে তাকে এলোপাথাড়ী আঘাত করে। মুমূর্ষ অবস্থায় প্রথমে বাসায় ও পরে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নেওয়ার পর কর্তব্যরত ডাক্তার তাকে মৃত বলে ঘোষণা করেন।

বিমান ছিনতাই প্রচেষ্টার অভিযোগে তিন পাইলট বরখাস্ত

গত ১২ জানুয়ারী বুধবার বাংলাদেশের জাতীয় এয়ারলাইন্স বাংলাদেশ বিমানের কলিকাতা থেকে ঢাকাগামী রুটে একটি বিমানের ১১ জন যাত্রীকে সম্ভাব্য বিমান ছিনতাইয়ের ষড়যন্ত্রে জড়িত থাকার সন্দেহে ভারতীয় কর্তৃপক্ষ গ্রেফতার করেছে। ১১ জন যাত্রীকে গ্রেফতারের পর ভারতের গোয়েন্দা সংস্থা জানায়, বাংলাদেশের সাবেক রাষ্ট্রপতি শেখ মজিবুর রহমানের হত্যাকাণ্ডের অভিযোগে মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্তদের মুক্তি আদায়ের লক্ষ্যে বিমান ছিনতাইয়ের পরিকল্পনা করায় এদের গ্রেফতার করা হয়েছে। ঘটনার পর থেকে বাংলাদেশের বিমান ও বিমান বন্দরগুলিতে নিরাপত্তা জোরদার করা হয়েছে। অবশ্য অভিযোগ প্রমাণিত না হওয়ায় ভারতীয় কর্তৃপক্ষ ঐ দিন রাত সাড়ে ১০টায় গ্রেফতারকৃতদের মুক্তি দেয় এবং ঢাকা পাঠানোর ব্যবস্থা করে।

এদিকে বাংলাদেশ সরকার শেখ মজিবুর রহমানের হত্যাকারীদের মুক্তির জন্য বিমান ছিনতাইয়ের উড়ো খবর পেয়ে বাংলাদেশ বিমানের ৩ জন পাইলটকে চাকুরী হ'তে বরখাস্ত করেছে। বরখাস্তকৃত ৩ বৈমানিক হ'লেন শেখ মুজিব হত্যার মৃত্যুদণ্ড প্রাপ্ত আসামী কর্ণেল ফারূকের বোন ক্যাপ্টেন ইয়াসমিন ও তার স্বামী ক্যাপ্টেন ইশফাক্ব রহমান। অপর পাইলট হচ্ছেন একই মামলার মৃত্যুদণ্ড প্রাপ্ত আসামী ক্যাপ্টেন মহিউদ্দীনের ভাই ক্যাপ্টেন আনসার আলী।

উল্লেখ্য, আওয়ামী সরকার ক্ষমতায় আসার পর এই ৩ বৈমানিককে গত ৩ বছরের বেশি সময় ধরে বিমান চালনার কোন কাজ দেওয়া হয়নি।

খুলনায় আহলেহাদীছ মসজিদ ও লাইব্রেরীতে হামলার প্রতিবাদ

'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘে'র কেন্দ্রীয় সভাপতি হাফেয মুহাম্মাদ আযীযুর রহমান ও সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মাদ জালালুদ্দীন এক যুক্ত বিবৃতিতে খুলনার খালিশপুরে আহলেহাদীছ মসজিদ ও লাইব্রেরীতে হামলার তীব্র প্রতিবাদ জানিয়েছেন। গত ৪ঠা ফেব্রুয়ারী ২০০০ তারিখে খুলনার খালিশপুরের চিত্রালী মাঠে আহলেহাদীছ এর উদ্যোগে আয়োজিত জনসভায় কথিত ইমাম পরিষদের সন্ত্রাসীরা বাদ জুম'আ অতর্কিত হামলা চালিয়ে জনসভা প্যাণ্ডেল ভাংচুর করে। পরক্ষণে তারা খালিশপুর ১২ নং রোডস্থ আহলেহাদীছ জামে মসজিদ, লাইব্রেরী এবং প্রখ্যাত আলেম মাওলানা আব্দুর রউফ ছাহেবের বাড়িতে ব্যাপক ভাংচুর ও ক্ষতি সাধন করে। কেন্দ্রীয় নেতৃদ্বয় তাঁদের বিবৃতিতে বলেন, ধর্মীয় জনসভা ও মসজিদের উপরে হামলার মত নিকৃষ্ট কাজের মাধ্যমে ধর্ম ব্যবসায়ীদের মুখোশ উন্মোচিত হয়েছে।

তাঁরা এই ন্যাক্কারজনক ঘটনার সাথে জড়িত সন্ত্রাসীদের অবলিম্বে গ্রেফতার ও বিচারের দাবী জানান। সাথে সাথে তারা কিছু সংখ্যক জাতীয় দৈনিকে উক্ত বিষয়ে বিকৃত খবর পরিবেশনের তীব্র নিন্দা জানিয়েছেন।

বহুল আলোচিত জননিরাপত্তা আইন পাস

বিভিন্ন মহলের প্রতিবাদের ঝড়কে উপেক্ষা করে সরকার গত ৩০শে জানুয়ারী বহুল আলোচিত ও বিতর্কিত 'জননিরাপত্তা আইন' (বিশেষ বিধান) বিল ২০০০ সংশোধিত আকারে পাস করেছে। বিরোধী দল বিহীন সংসদে সরকারের শরীক দল জাতীয় পার্টি (মি-ম) এই বিলটি পাশের বিরোধিতা করেছে। তারা বিলটি পাস না করে জনমত যাচাই ও বাছাই কমিটিতে পাঠানোর নোটিশ উত্থাপন করে। কিন্তু সরকারী দলের সদস্যদের কণ্ঠভোটে তা নাকচ হয়ে যায়। জাতীয় পার্টির সদস্যরা বলেন, এ আইন সরকারী দলের জন্য বুমেরাং হয়ে দাঁড়াবে। তারা আরো বলেন, গণস্বার্থ বিরোধী কালো আইন আমরা কখনও সমর্থন করতে পারিনা।

গত আগষ্ট মাসের প্রথমে সরকার 'সন্ত্রাস দমন আইন' নামে আইনটি প্রণয়ন করে। পরে এর নামকরন করে 'জননিরাপত্তা আইন'। গত ২৭ জানুয়ারী স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী মুহাম্মাদ নাসিম এ বিলটি সংসদে উত্থাপন করেন। বিলটি সংসদে উত্থাপনের পর সারাদেশ জুড়ে প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়। জননিরাপত্তা আইনকে কালো আইন হিসাবে অভিহিত করে রাজনীতিবিদ, শিক্ষক, বুদ্ধিজীবী সংবাদিক মহল সোচ্চার হয়ে উঠেন। কিন্তু সরকারি দল সকল মহলের প্রতিবাদকে উপেক্ষা করে আইনটি পাস করেন। বিরোধী দল সমূহ এই আইনকে বিরোধী দল দমনের আইন হিসাবে অভিহিত করেছেন।

জননিরাপত্তা আইনে ছিনতাই, চাঁদাবাজি, দরপত্রে (টেণ্ডার) হস্তপেক্ষ, গাড়ী ভাংচুর ও সম্পদের ক্ষতিসাধন, যান চলাচলে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি, মুক্তিপণ দাবী ও আদায়, ত্রাস সৃষ্টি, মিথ্যা মামলা ও অভিযোগ দায়ের এবং অপরাধের প্ররোচনা প্রদান এই ৯টি অপরাধের বিচার করা হবে। এই অপরাধ গুলির প্রকারভেদ অনুযায়ী সর্বোচ্চ শাস্তি মৃত্যুদণ্ড। জননিরাপত্তা আইনে ছিনতাইয়ের শাস্তি সর্বোচ্চ ১০ বছর ও সর্বনিম্ন ২ বছর কারাদণ্ড, চাঁদাবাজি ও টেণ্ডারে হস্তক্ষেপের

সর্বনিম্ন ২ বছর কারাদণ্ড, চাঁদাবাজি ও টেণ্ডারে হস্তক্ষেপের শাস্তি সর্বোচ্চ যাবজ্জীবন ও সর্বনিম্ন ৩ বছর কারাদণ্ড, যানবাহন চলাচলে বাধা দেওয়া ও মুক্তিপণদাবী ও আদায়ের শাস্তি সর্বোচ্চ ১৪ বছর ও সর্বনিম্ন ৩ বছর কারাদণ্ড। এককভাবে বা দলবদ্ধভাবে কোন স্থানে অগ্নিসংযোগ, বোমাবাজি বা ভয়ভীতি প্রদর্শন করে ত্রাস সৃষ্টি করার শাস্তি সর্বোচ্চ ১০ বছর ও সর্বনিম্ন ২ বছর কারাদণ্ড। এছাড়া প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে মিথ্যা মামলা দায়ের করলে বাদী নিজেই ৭ বছর পর্যন্ত কারাদণ্ডে দণ্ডিত হবেন। এছাড়া অর্থ দণ্ডেও দণ্ডিত হবেন। কোন ব্যক্তি যদি এই আইনের অধীনে কোন অপরাধ সংঘটনে অন্য কোন ব্যক্তিকে প্ররোচনা দেয় বা সহায়তা করে, তাহ'লে অপরাধটি সংঘটনের জন্য যে শাস্তি নির্ধারিত আছে সেই একই দণ্ডে প্ররোচনাকারীও দণ্ডিত হবে।

জননিরাপত্তা আইনের অধীনে মামলাগুলি ৩১ দিনের মধ্যে তদন্ত করার বিধান রয়েছে। বিচারের জন্য কোন মামলা প্রস্তুত হওয়ার দিন থেকে ৯০ দিনের মধ্যে ট্রাইবুনাল বিচার কার্য সম্পন্ন করবে। তবে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে যদি বিচারকার্য শেষ না হয়, তাহ'লে ট্রাইবুনাল বিলম্বের কারণ বর্ণনা করে পরবর্তী ৯০ দিনের মধ্যে বিচার কাজ সমাপ্ত করবে।

গরীবে নেওয়াজ ক্লিনিক

পরিচালকঃ ডাঃ মোঃ আবু হানি (রতন)
এম,বি,বি,এস; বি, এইচ, এস, (এক্স)

এখানে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক দ্বারা চোখ কান, নাক, গলা ও হাড়জোড়া সহ সকল ধরণের অপারেশন ও চিকিৎসা করা হয়।

তালাইমারী বাজার, রাজশাহী, বাংলাদেশ।
রোগী দেখার সময়ঃ সকাল ৭টা-১টা বিকালঃ ৪টা-রাত ৯টা।

ইমাম আবশ্যক

নুরালাপুর আহলেহাদীছ জামে' মসজিদের জন্য একজন ফাযিল/কামিল পাশ ইমাম আবশ্যক দাওরায়ে হাদীছ ও হাফেযদের অগ্রাধিকার।

বেতন আলোচনা সাপেক্ষে। সাক্ষাৎকারঃ আগামী ঈদুল আযহার পূর্ব পর্যন্ত যেকোন শুক্রবার।

স্থানঃ মাধবদী আহলেহাদীছ জামে' মসজিদ, নরসিংদী।

বিদেশ

প্রেসিডেন্ট কুমারাতুঙ্গা পুনঃনির্বাচিত

শ্রীলংকার প্রেসিডেন্ট চন্দ্রিকা কুমারাতুঙ্গা পুনরায় সেদেশের প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হয়েছেন। গত ২২শে ডিসেম্ব টেলিভিশনে প্রেসিডেন্ট চন্দ্রিকা কুমারাতুঙ্গার জয়ের কথা ঘোষণা করেন। নির্বাচনে কুমারাতুঙ্গা ৫১ দশমিক ১২ শতাংশ ভোট এবং তার অন্যতম প্রতিদ্বন্দ্বী প্রধান বিরোধী দল ইউনাইটেড ন্যাশনাল পার্টির (ইউএনপি) প্রধান রনিল বিক্রমসিংহে ৪২ দশমিক ৭ শতাংশ ভোট পান বাকী ভোট পেয়েছেন অন্য ৯টি দল। সেদেশের ১ কোটি ১৭ লাখ ভোটারের মধ্যে ৭৩ শতাংশ ভোটার ভোট প্রদান করেন। এর আগে বিদ্রোহী তামিল টাইগাররা নির্বাচন ভন্ডুল করে দেয়ার হুমকি দেয়। উল্লেখ্য, এ নির্বাচনের মাত্র দু'দিন আগে গত ২১শে ডিসেম্বর শেষ নির্বাচনী সমাবেশে এক আত্মঘাতী বোমা হামলায় চন্দ্রিকা কুমারাতুঙ্গা গুরুতর আহত হন এবং ২৩ জন নিহত ও ৫০ জন আহত হয়। এ হামলার জন্য কুমারাতুঙ্গা তামিল টাইগার ও মূল প্রতিদ্বন্দ্বী নেতাকে অভিযুক্ত করেছেন। কুমারাতুঙ্গা বলেন, লিবারেশন তামিল টাইগারস অব ইলম (এলটিটিই) আমাকে হত্যা করতে চেয়েছিল, কিন্তু সৃষ্টিকর্তা আমাকে বাঁচিয়েছেন।

এশিয়ায় পাঁচশ' বছরের ঔপনিবেশিক শাসনের অবসান

দক্ষিণ চীন সাগরের ছোট একটি দ্বীপ 'ম্যাকাও'। আয়তন মাত্র সাড়ে ২১ বর্গকিলোমিটার। তবে আয়তনের তুলনায় জনসংখ্যার ঘনত্ব অনেক বেশী। এখানে প্রতি বর্গকিলোমিটারে প্রায় ১৯ হাযার লোক বাস করে। ব্যবসা-বাণিজ্যের জন্য দ্বীপটির অত্যন্ত গুরুত্ব রয়েছে। কিন্তু সেই গুরুত্বপূর্ণ দ্বীপটির মালিকানা এখন থেকে আর ইউরোপীয়দের হাতে নেই। গত ১৯ ডিসেম্বর রোববার মধ্যরাতে পর্তুগীজ প্রেসিডেন্ট স্যামপারো চীনা প্রধানমন্ত্রীর কাছে ম্যাকাও দ্বীপটির হস্তান্তরের কাজ আনুষ্ঠানিকভাবে সম্পন্ন করেন। আর এ হস্তান্তরের মধ্য দিয়েই এশিয়ায় প্রায় পাঁচশ' বছরের ঔপনিবেশের শাসন অবসান ঘটল। শেষ হয় ইউরোপের অধীন কলোনিয়ান যুগের। সেক্ষেত্রে ম্যাকাও হস্তান্তর ছিল এশিয়ার সর্বশেষ হস্তান্তর।

বন্যা ও ভূমিধ্বসে ভেনেজুয়েলায় মৃতের সংখ্যা প্রায় ২৫ হাযার

ভেনেজুয়েলায় স্মরণকালের ভয়াহব বন্যা ও ভূমিধ্বসে ২৫ হাযার লোকের মৃত্যু হয়েছে বলে ধারণা করা হচ্ছে। গত ২০ ডিসেম্বর সিভিল ডিফেন্স সংস্থা প্রধান এঞ্জেল রেঞ্জল বলেন, বিপর্যয়ের মাত্রা ও জনবসতির ঘনত্ব বিচার করে

এই পরিসংখ্যান টানা হচ্ছে। সবচেয়ে খারাপ অবস্থা কারাকাস এবং এর আশেপাশের। তিনি বলেন, কোন কোন এলাকা ধ্বংসস্তুপের ২২ ফুট নিচে চাপা পড়ে গেছে। এসব স্থানে মৃতের সঠিক হিসাব কখনই পাওয়া যাবে না। সেখানে উদ্ধার অভিযান ও ব্যাপক ত্রাণ তৎপরতা চলছে। বেসরকারি হিসাব মতে ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ দু'শ কোটি মার্কিন ডলারে পৌঁছবে।

ভারতের অর্ধেক শিশুই অপুষ্টির শিকার

ভারতের ১০ জন গর্ভবতীর মধ্যে ৮ জনই রক্ত স্বল্পতায় ভোগে। এছাড়া এখানকার নবজাতকদের এক তৃতীয়াংশ কম ওজন নিয়ে জন্মায় এবং এদের অর্ধেকেরও বেশী শিশু অপুষ্টির শিকার। এই পরিসংখ্যান আফ্রিকার সাব-সাহারার দরিদ্রতম দেশগুলোর চেয়েও অনেক অনেক বেশী।

খাদ্য সরবরাহ নিশ্চিত রাখার ক্ষেত্রে সরকারের অব্যাহত প্রচেষ্টা এবং জাতীয় পুষ্টিনীতি থাকা সত্ত্বেও প্রায় ২৫ কোটি মানুষ বা এক চতুর্থাংশ ভারতীয় এখনও পুষ্টিহীনতায় ভুগছে। বিশেষজ্ঞরা বলেন, পুষ্টিহীনতার সমস্যা একটি বড় ধরনের চ্যালেঞ্জ। এই সমস্যা সমাধানে বহুমুখী পদক্ষেপ নিতে হবে। সরকারী নানা পদক্ষেপের পাশাপাশি সমাজের মহিলা ও তাদের শিক্ষা বিস্তারের ব্যাপারে দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন আনতে হবে। এ প্রসঙ্গে নারী ও শিশু উন্নয়ন বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সচিব আশা দাস বলেন, সমস্যা হ'ল 'ভারত জাতীয় পর্যায়ে খাদ্য স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন করলেও পারিবারিক পর্যায়ে তা পারেনি'। পারিবারিক স্তরে এটি এখনও নিম্ন পর্যায়ে রয়ে গেছে।

বিশ্বব্যাপী মৃত্যুদণ্ড বিলোপ করার প্রস্তাব স্থগিত

তৃতীয় বিশ্বের অধিকাংশ দেশের চরম বিরোধিতার মুখে ইউরোপীয় ইউনিয়ন বিশ্বব্যাপী মৃত্যুদণ্ড বিলোপ করার প্রস্তাব স্থগিত রেখেছে। যেসব দেশে অপরাধ বেশী সেসব দেশ গর্হিত অপরাধের চরম শাস্তি মৃত্যুদণ্ডই হওয়া উচিত বলে মনে করে।

ইউরোপীয় ইউনিয়ন ইউরোপীয় ও ল্যাটিন আমেরিকার ৭৪টি দেশের সমর্থনে জাতিসংঘে আনুষ্ঠানিকভাবে তাদের প্রস্তাব সাময়িকভাবে প্রত্যাহার করে নেয়। কারণ, মৃত্যুদণ্ড বিলোপের বিরোধীরা এ ব্যাপারে ১৩টি বিশেষ সংশোধনী এনেছে। সিঙ্গাপুর, মিসর, চীন, ভারত, ইন্দোনেশিয়া, ইরান, মালয়েশিয়া, সঊদী আরব, জাপান, পাকিস্তান, জ্যামাইকা, বাহামা, বারবাদোস, নিগার, ক্যামেরুন ও সিয়েরা লিওনসহ আফ্রিকা, এশিয়া, ভূমধ্যসাগর ও মধ্যপ্রাচ্যের অধিকাংশ দেশের সমর্থনে প্রায় ৮৩টি দেশ এই সংশোধনী আনে। এই সংশোধনী গ্রহণ করা হ'লে মৃত্যুদণ্ড রহিতের ব্যাপারটি কিছুটা শিথিল হবে। যুক্তরাষ্ট্র তৃতীয় বিশ্বের পক্ষ নিয়ে ইউরোপীয় ইউনিয়নের প্রস্তাবের বিরোধিতা করে। যুক্তরাষ্ট্রে ১৯৯৭ সালে মৃত্যুদণ্ড প্রথা চালু হওয়ার পর থেকে ৯৫ জনের মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করা হয়। অপরাধের বিরুদ্ধে বিশ্বের সবচেয়ে কঠোর আইন প্রয়োগকারী দেশ সিঙ্গাপুরও মৃত্যুদণ্ডের পক্ষে।

ভারতে লটারি নিষিদ্ধের বিল অনুমোদন

ভারতের পার্লামেন্ট গত ৭ই ডিসেম্বর বেশ কিছু সংসদীয় বিল অনুমোদন করেছে। এর মধ্যে সকল ধরনের লটারি নিষিদ্ধ। ইন্টেলেকচুয়াল প্রোপার্টি আইন সংশোধন ও দক্ষ পরিচালনার স্বার্থে রাজ্যগুলোকে ছোট করা সংক্রান্ত বিল রয়েছে। রাজ্য ছোট করা সংক্রান্ত বিলটিতে বলা হয়েছে, ভারতের সবচেয়ে জনবহুল উত্তর প্রদেশ, সবচেয়ে দরিদ্র বিহার এবং সবচেয়ে বড় মধ্যপ্রদেশকে ভেঙ্গে আরও ৩টি নতুন প্রদেশ গঠন করা হবে।

[ইসলামে লটারী নিষিদ্ধ। বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম মুসলিম দেশ হিসাবে বাংলাদেশ সরকার নিজ দেশে লটারি নিষিদ্ধ করার ব্যাপারে পদক্ষেপ নিবেন কি? -সম্পাদক]

প্রখ্যাত সাহিত্যিক কমলাদাসের ইসলাম ধর্ম গ্রহণ

ভারতের প্রখ্যাত দ্বি-ভাষী লেখিকা ও স্বনামধন্য কবি মাধবী কুট্টি ওরফে কমলা দাস গত ২৩শে ডিসেম্বর '৯৯ হিন্দু ধর্ম ত্যাগ করে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছেন। বর্তমানে তার নাম 'সুরাইয়া'। ইসলাম ধর্ম গ্রহণের পর তিনি তার প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে বলেন, তার ২৭ বছর জীবনের অধিকাংশ সময় কলিকাতায় অতিবাহিত হয়েছে মুসলমানদের সাথে। এ জন্য মুসলমান পরিবারের সাথে তার সুসম্পর্ক গড়ে উঠে। আর এখান থেকেই তিনি ইসলাম ধর্ম গ্রহণের অনুপ্রেরণা পেয়েছেন। তিনি বলেন, একমাত্র ইসলাম ধর্মেই মহিলাদের মর্যাদা, অধিকার ও সম্মান দেওয়া হয়েছে। এ মর্যাদা অধিকার ও সম্মান হিন্দু ধর্মে নেই।

ভারতের উগ্রবাদী হিন্দুরা সব সময়ে ধর্মান্তর বিষয়ে হিংসাত্মক। হিন্দু ধর্ম থেকে অন্য ধর্মে দীক্ষিত হ'লেই তারা অপপ্রচার চালায় টাকার লোভে ধর্মান্তর হয়েছে। এছাড়া ধর্মান্তরিত ব্যক্তি যদি নিম্নবর্ণের পর্যায়ের হয়, তাহ'লে তার উপর চলে নির্যাতনের ষ্টীম রোলার ও চার দিকে নিন্দার ঝড়। কিন্তু বিদুষী লেখিকা কমলা দাস ইসলাম ধর্মের সুমহান ঐক্য, শান্তি ও সাম্যের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করায় সারা ভারতে আলোড়ন সৃষ্টি করলেও বিশ্ব হিন্দু পরিষদ ও হিন্দু সংঘ পরিবারে তীব্র কোন প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়নি। কলিকাতা থেকে প্রকাশিত আনন্দ বাজার পত্রিকা 'কমলা দাসের ধর্মান্তর গরীবের জন্য একটি প্রস্তাব'

শীর্ষক প্রকাশিত নিবন্ধে শ্রী বিক্রমন লারা লিখেছেন, যখন কোন উচ্চ শ্রেণীর হিন্দু ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে, তখন হিন্দু সংঘগুলি নিশ্চুপ থাকে। অথচ গরীব ও নিম্নবর্ণের হিন্দুরা ইসলাম ধর্মগ্রহণ করলেই চার দিকে জাত গেল জাত গেল বলে চিৎকার শুরু হয়। তিনি লিখেছেন, সনাতন হিন্দু ধর্মের অতীত গৌরব গাওয়ার চেয়ে খোদ ব্রাহ্মণ সমাজ থেকে 'কমলা দাসে'র মত বিদুষী নারীর ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হওয়ার ঘটনা হিন্দুদের জন্য লজ্জাজনক ও চরম ব্যর্থতা। আর সেজন্যই তারা তীব্র প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেনি।

হিন্দু সংঘ পরিবারের সভাপতি কুম্পনস রাজশেখরন স্বভাবসুলভ মার্জিত ও ভদ্রজনিত ভাষায় তার প্রতিক্রিয়া জানিয়ে বলেছেন, ধর্মান্তকরণ কমলা দাসের ব্যক্তিগত ব্যপার। হিন্দু ধর্ম ছাড়ার পরেও ফিরে আসার অধিকার তার আছে। ভারতের প্রখ্যাত সাহিত্য সমালোচক অধ্যাপক নরেন্দ প্রসাদ বলেন, কমলা দাসের মত সৃজনী প্রতিভার আত্মার গভীরে কি ঘটে তা আঁচ করা কঠিন। ধৈর্য সহকারে আমরা তার ধর্মান্তর-পরবর্তী লেখার জন্য অপেক্ষা করব'।

মোঃ হাবিবুর রহমান, বিসিএস (প্রশাসন) কর্তৃক রচিত বিসিএস সহ যে-কোন প্রতিযোগিতা মূলক পরীক্ষার অনন্য ও নির্ভরযোগ্য সহায়ক গ্রন্থ-

সাধারণ জ্ঞানকোষ

বাজারে বেরিয়েছে। ২১তম বিসিএস প্রিলিমিনারি টেষ্টে ৭০% কমন পড়েছে। যাচাই করে আজই এক কপি সংগ্রহ করুন।

জোনাকী হোটেল এণ্ড রেস্টুরেন্ট

আমরা সকাল, দুপুর ও রাত্রের উৎকৃষ্টমানের খাবার পরিবেশন করে থাকি। ভাত, বড় মাছ, ছোট মাছ, খাশির মাংশ, মুরগির মাংশ, বিভিন্ন প্রকারের শাক-সবজি, বিভিন্ন প্রকারের ভর্তা, বিভিন্ন প্রকারের ডাল, খাবার জন্য পরিবেশন করি এবং বিভিন্ন অনুষ্ঠানের জন্য প্যাকেট খাবারও সরবরাহ করে থাকি।

পরিচালনায়ঃ আব্দুর রহমান
পদ্মা হোটেলের নিচে, গণকপাড়া, সাহেব বাজার, রাজশাহী।

মুসলিম জাহান

লতা-গুল্মের উপর কুরআনের প্রভাব

সম্প্রতি জর্ডানে পরিচালিত এক কৃষি গবেষণায় জানা গেছে যে, লতা-গুল্মের উপরও মহাগ্রন্থ কুরআন শরীফের এক বিস্ময়কর প্রভাব রয়েছে।

গাছেরও প্রাণ আছে। আছে আনন্দ-দুঃখের অনুভূতি, শ্রবণশক্তি, এমন কি ভাল-মন্দ বিচারের ক্ষমতা। এই সত্য প্রতিষ্ঠার জন্যে জর্ডান বিশ্ববিদ্যালয়ের এক অধ্যাপক গবেষণা চালান। তিনি সমআয়তন বিশিষ্ট পাঁচটি প্লাষ্টিকের পাত্রে একই মান ও পরিমাণের মাটিতে একই মানের গমের বীজ রোপণ করেন। সমান আলো-বাতাসে সমপরিমাণ ইউরিয়া সার ও পানি সিঞ্চন করেন।

প্রথমটিতে পানি দেয়ার সময় গবেষক নিজে সেচের পানিতে কুরআনের বিভিন্ন সূরা পাঠ করে শোনান এবং একজন ছাত্রীকে সেখানে কুরআন তিলাওয়াত করে শোনানোর আদেশ দেন। দ্বিতীয়টিতে দু'জন ছাত্রীকে বিভিন্ন ধরনের গান ও সঙ্গীত বাজানোর জন্যে বলেন। তৃতীয়টির সামনে একজন ছাত্রীকে অন্য গাছের পাতা এনে ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করে তাকে বিভিন্ন ধরণের কটূক্তি করে ধমকাতে বলেন। চতুর্থটিতে আরেকজন ছাত্রী নিয়োগ করলেন, যার কাজ হ'ল গাছের পাতা ছেঁড়া, গাছে আঘাত করা, গাছে আগুনের সেক দেয়া ইত্যাদি। পঞ্চমটি সাধারণ ভাবে রেখে দেয়া হয়। কিছুদিন পর দেখা যায় যে, যেটিকে কুরআন তিলাওয়াত করে শোনানো হয়েছে সে পাত্রের গমের গাছ স্বাভাবিকের চেয়ে ৪৪% বেশী বৃদ্ধি পেয়েছে। আর যাকে সঙ্গীত শোনানো হয়েছিল সে গাছের বৃদ্ধি হয়েছে মাত্র ১৫%। যে পাত্রের সামনে অন্য গাছকে কষ্ট দেয়া হয়েছিল স্বাভাবিকের চেয়ে তার বৃদ্ধি কমে গিয়েছে ৩৫%। যে পাত্রের গাছগুলোকে মারা হয়েছিল, আগুনের সেক দেয়া হয়েছিল তার বৃদ্ধি কমে গিয়েছে ৮০%। কুরআন তিলাওয়াতের প্রভাব আরো সুস্পষ্ট হয় ফলনে এসে। কুরআন তিলাওয়াত শোনা পাত্রটির ফলন স্বাভাবিকের চেয়ে ১৪০% বেশি হয়েছে।

এর দ্বারা বোঝা যায়, গাছেরও আনন্দ-বেদনা ও বাছ-বিচারের ক্ষমতা আছে এবং কুরআনের প্রতি সৃষ্টিগত দুর্বলতা আছে। তাই, তার কাছে গানের বা সঙ্গীতের আবেদনের চেয়ে কুরআন তিলাওয়াতের আবেদন বহুগুণে বেশি। অবশ্য, এই সত্য গবেষণা করে উদ্ধার করার প্রয়োজন ছিল না। কুরআন নিজেই ঘোষণা করেছে 'জগতের এমন কোন বস্তু নেই যা আল্লাহ্‌র তাসবীহ পাঠ করেনা, কিন্তু তোমরা তাদের সে তাসবীহ বুঝতে পার না' (ইসরা ৪৪)।

পাকিস্তানের সাবেক মূখ্যমন্ত্রীকে ২১ বছরের জন্য রাজনীতিতে অযোগ্য ঘোষণা

পাকিস্তানের সামরিক সরকার রাষ্ট্রীয় খাত হ'তে অর্থ অপচয়ের অভিযোগে সেদেশের সাবেক প্রাদেশিক মূখ্যমন্ত্রী সরদার আরিফ নাকাইকে ২১ বছরের জন্য রাজনীতিতে অযোগ্য ঘোষণা করেছে। গত ১৮ ডিসেম্বর এ ঘোষণা দেওয়া হয়।

পাকিস্তানের সামরিক সরকার ব্যাংক ঋণ খেলাপী ও দুর্নীতির বিরুদ্ধে দমনমূলক অভিযানের অংশ হিসাবে গত নভেম্বরে যে ২৫ জনকে গ্রেফতার করেছিল তার মধ্যে সরদার আরিফ অন্যতম। তার বিরুদ্ধে ১৯৯৬ সালে বে-নজীর ভুট্টোর সরকারের প্রাদেশিক মূখ্যমন্ত্রী থাকাকালীন সময়ে মূখ্যমন্ত্রীর স্বেচ্ছাধীন তহবিল থেকে অর্থ অপচয়ের অভিযোগ আনা হয়েছিল। গ্রেফতারের পর তিনি ১৫ লাখ রূপীর একটি চেক প্রদান করায় তাকে মুক্তি দিয়ে উপরোক্ত আদেশ ঘোষণা করা হয়।

গত বছরে কসোভোয় সার্ব বাহিনীর হাতে ১০ হাযার মুসলমান নিহত

গত বছরে কসোভোয় সার্ব বাহিনীর জাতিগত নির্মূল অভিযানে ১০ হাযার মুসলমানকে নিহত সহ ১৫ লক্ষাধিক পরিবারকে জোরপূর্বক তাদের বাড়ীঘর থেকে বের করে দেওয়া হয়েছে। গত ৯ ডিসেম্বরে মার্কিন পররাষ্ট্র দফতরের প্রকাশিত এক রিপোর্টে একথা বলা হয়। ঐ রিপোর্টে আরো বলা হয়, নিহতদের অধিকাংশ লাশ পুড়িয়ে ফেলা হয়েছে অথবা ধ্বংস করা হয়েছে। যাতে কখনও তাদের পরিচয় জানা না যায়। তবে যথেষ্ট সাক্ষ্য প্রমাণে দেখা গেছে যে, সার্বীয় বাহিনীর হাতে প্রায় ১০ হাযার কসোভো মুসলমান নিহত হয়েছে এবং ১৫ লক্ষাধিক মুসলমান পরিবারকে তাদের বাড়ী ঘর থেকে জোরপূর্বক বের করে দেওয়া হয়েছে। ঐ রিপোর্টে আরো উল্লেখ করা হয়েছে যে, কসোভো ও সার্বীয়ায় এখনও মানবাধিকার লংঘন হচ্ছে।

সংযুক্ত আরব আমীরাতে বিশ্বের সর্বোচ্চ হোটেল নির্মাণ

গত ১ ডিসেম্বর '৯৯ দুবাইয়ে বিশ্বের সর্বোচ্চ হোটেল উদ্বোধন করা হয়েছে। হোটেলটির নাম 'বুরূজ আল-আরব হোটেল'। উচ্চতা ৩শ ২১ মিটার। এতে ২শ ১টি ডিউপ্লেক্স কক্ষ রয়েছে। প্রতিটি কক্ষে প্রতি রাতে অবস্থানের জন্য ৪ হাযার থেকে ৬৬ হাযার দিরহাম (১ হাযার ৯৫ ডলার থেকে ১৮ হাযার ডলার) পর্যন্ত ব্যয় হবে। স্থানীয় ব্যবসায়ীদের একটি গ্রুপের মালিকানাধীন এই হোটেলের এক চতুর্থাংশ কক্ষ ইতিমধ্যে ভাড়া দেয়া হয়েছে। হোটেলটিতে ৭শ ৮০ বর্গমিটারের একটি রাজকীয় বিলাসবহুল স্যুট রয়েছে। এই হোটেলের বিশেষ অতিথি হিসাবে বিমান বন্দর থেকে রাজকীয়ভাবে হেলিকপ্টারে করে হোটেলের ২৮ তলার হোলি প্যাণ্ড অবতরণ করার ব্যবস্থা রয়েছে। উপকূল থেকে ২শ ৮২ মিটার দূরে একটি কৃত্রিম দ্বীপের উপর তৈরী করা হয়েছে। গত নভেম্বর মাসে সঊদী আরবের প্রতিরক্ষামন্ত্রী প্রিন্স সুলতান সরকারীভাবে এই হোটেল উদ্বোধন করেন।

যুক্তরাষ্ট্রে ইসলাম দ্রুত প্রসার লাভ করছে

-ক্লিনটন

যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট বিল ক্লিনটন গত ৯ ডিসেম্বরে এক বার্তায় কংগ্রেসকে জানান, যুক্তরাষ্ট্রে ইসলাম ধর্ম দ্রুত প্রসার লাভ করছে। তিনি বলেন, ওয়াশিংটনের নীতি সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে, ইসলামের বিরুদ্ধে নয়। তিনি আরো বলেন, ইসলামের প্রতি আমাদের দৃষ্টিভঙ্গি গভীর শ্রদ্ধাপূর্ণ। আমরা ইসলামী আইনকে সম্মান করি।

উল্লেখ্য যে, এ বছরে যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ও ভাইস প্রেসিডেন্ট পবিত্র ঈদ-উল ফিত্‌র উপলক্ষে বাণী দিয়েছেন। যা বিশ্লেষণ করে বিশেষজ্ঞরা বলেছেন, ইসলামের ক্রমবর্ধমান জনপ্রিয়তার প্রতি এটা প্রশাসনের গুরুত্ব অনুধাবনেরই নির্দেশ করে।

মুজাহিদদের মুক্তির দাবীতে বিমান ছিনতাই

গত ২৪ ডিসেম্বরে ইণ্ডিয়ান এয়ারলাইন্সের একটি বিমান নেপালের কাঠমুন্ডু থেকে ১৭৪ জন যাত্রী নিয়ে নয়াদিল্লীতে যাবার পথে ৫ জন সশস্ত্র ছিনতাইকারী ভারতীয় কারাগারে আটক মুজাহিদদের মুক্তির দাবীতে বিমানটির নিয়ন্ত্রণ গ্রহণ করে। তারা বিমানটিকে লাহোরে অবতরণের দাবী জানায়। কিন্তু পাকিস্তানের সামরিক কর্তৃপক্ষ লাহোরে বিমান অবতরণের অনুমতি না দেওয়ায় প্রথমে বিমানটিকে ভারতের অমৃতসরে অবতরণ করানো হয়। পরে অনুমতি লাভের পর বিমানটিকে লাহোর বিমান বন্দরে অবতরণের পর সেখান হ'তে প্রয়োজনীয় জ্বালানী নিয়ে বিমানটি আরব-আমিরাতের দুবাই শহরের একটি সামরিক বিমান বন্দরে অবতরণ করে। সেখানে ২৭ জন যাত্রীকে মুক্তি দেওয়া হয় এবং ছিনতাইকারীদের অবাধ্য হওয়ায় তাদের হাতে নিহত যাত্রী রূপেন কাতিয়ালের লাশ রেখে বিমানটি কাবুলে অবতরণের জন্য রওনা দেয়। কিন্তু তালেবান সরকার বিমানটিকে কাবুলে অবতরনের অনুমতি না দেওয়ায় ছিনতাইকারীরা জোরপূর্বক বিমানটিকে তালেবান সরকার নিয়ন্ত্রিত কান্দাহার বিমান বন্দরে অবতরণ করান। কান্দাহারে অবতরণের পর ছিনতাইকারীরা বিমান ছিনতাইয়ের কথা স্বীকার করে ভারত কারাগারে হরকাতুল

মুজাহেদীনের নেতা মাওলানা মাসউদ আযহার সহ ৩৫ জন মুজাহিদের মুক্তি, সাজ্জাদ আফগানির কফিন ফেরত ও ২০ কোটি ডলারের বিনিময়ে বিমানের জিম্মিদের মুক্তি দেওয়ার কথা ভারত সরকারকে জানায়। ছিনতাইকারীরা হুঁশিয়ার করে দেয় যে, তাদের দাবী না মানলে এবং কান্দাহার ত্যাগের নির্দেশ দিলে তারা যাত্রীসহ বিমানটি বোমা মেরে উড়িয়ে দিবে ও নিজেরাও আত্মহত্যা করবে। পরে জাতিসংঘ প্রতিনিধি দল ও তালিবান সরকারের মধ্যস্থতায় ছিনতাইকারী ও ভারত সরকারের মধ্যে আলোচনার পর মাওলানা মাসউদ আযহার, মোস্তাক আহমাদ আসগর ও আহমাদ সাঈদ শেখকে মুক্তি দেওয়ার শর্তে ছিনতাইকারীরা জিম্মিদের মুক্তি দিতে স্বীকৃতি দেয়।

অতঃপর বিমান ছিনতাইয়ের ৭দিন পর গত ৩১ ডিসেম্বর উল্লেখিত কাশ্মীরি ৩ জন মুজাহিদ নেতাকে ভারত থেকে বিমানযোগে কান্দাহারে পৌছানোর পর ছিনতাইকারীরা তালিবান সরকারের হাতে তাদের অস্ত্র জমা দিলে বিমান ছিনতাই ঘটনার অবসান ঘটে। উল্লেখ্য, মাওলানা মাসউদ আযহার ১৯৯৪ইং সালে ভারত নিয়ন্ত্রিত কাশ্মীরে ২টি ইসলামপন্থী দলকে একত্রিত করার জন্য গিয়ে সেখানে গ্রেফতার হন। সে সময় তার নিকট বৈধ পাসর্পোট ছিল।

ইন্দোনেশিয়ায় মসজিদে হামলায় ॥ ২১৬ জন মুসলমান নিহত

ইন্দোনেশিয়ার উত্তর মালাক্কা দ্বীপপুঞ্জের হালমাহেরা দ্বীপে একটি মসজিদে গত ডিসেম্বরের শেষ দিকে খ্রীষ্টানরা হামলা চালিয়ে অন্ততঃ ২শ ১৬ জন মুসলমানকে হত্যা করেছে। ইন্দোনেশিয়ার পুলিশ গত ১৬ জানুয়ারী এ কথা জানিয়েছে। উত্তর মালাক্কার পুলিশের প্রধান লেফটেন্যান্ট কর্নেল দিদিক প্রিজনদোনো সে দেশের রাষ্ট্রীয় বার্তা সংস্থা আনতারাকে বলেন, এটা সত্য যে, ২শ ১৬ জন মুসলমান একটি মসজিদে নিহত হয়েছে। তিনি আরো বলেন, কয়েকজনের মৃত দেহ মসজিদের মেঝেতে পাওয়া গেছে।

পাকিস্তানে সূদকে হারাম ঘোষণা

পাকিস্তানের সুপ্রীম কোর্ট গত ২৩ ডিসেম্বর সূদকে হারাম বলে ঘোষণা করেছে। সে দেশের শীর্ষ আদালতের চার জন বিচারকের সমন্বয়ে গঠিত একটি বেঞ্চ এক রায়ে সূদকে কুরআন ও সুন্নাহ পরিপন্থী ঘোষণা করে। আদালত ২০০১ সাল থেকে সরকারকে সূদমুক্ত অর্থনীতি চালু করতে বলেছে।

মদ্যপান নিষিদ্ধ

ইন্দোনেশিয়ার দক্ষিণ কালিমানটান প্রদেশের আইন পরিষদ মদের উৎপাদন, মদ্য পান ও তা কাছে রাখা এবং বিক্রির উপর নিষেধাজ্ঞা জারী করেছে। গত ৫ জানুয়ারী ইন্দোনেশিয়ার পার্লামেন্ট এই নিষেধাজ্ঞা অনুমোদন করেছে এবং প্রাদেশিক গভর্ণরের স্বাক্ষরের পর তা কার্যকর করেছে।

তুরস্কে ভূমিকম্পের নেপথ্য কারণ

তুরস্কে স্মরণকালের ভয়াবহ ভূমিকম্পের নেপথ্য কারণ উদঘাটিত হয়েছে। তুরস্কের সামরিক জেনারেলদের কর্তৃক ইসলাম ধর্ম ও পবিত্র কুরআনকে অস্বীকার, অবমাননা এবং মুসলমানদের প্রতি নির্যাতন করায় মহান আল্লাহ্‌র গযব হিসাবে ভূমিকম্পের উৎপত্তি। জর্দানের 'শাইহান', কাতারের 'আল ওয়াত্বান', বাহরাইনের 'আন-নুখবাই' পত্রিকা এবং তুরস্কের বেশ কয়েকটি পত্রিকা তুরস্কের সাম্প্রতিক প্রলয়ংকরী ভূমিকম্প, যাতে প্রায় ৫০ হাযার মানুষ নিহত হয়েছিল। ধ্বংস্তুপে পরিণত হয়েছিল অনেক শহর ও জনপথ। ঐ ভূমিকম্পের উৎপত্তি সম্পর্কে লোমহর্ষক তথ্য প্রকাশিত হয়েছে।

পত্রিকাগুলির রিপোর্টে বলা হয়েছে, সাগরপাড়ে তুরস্কের এক বিখ্যাত নৌঘাঁটি রয়েছে। এই নৌঘাঁটিতে অবসর প্রাপ্ত জেনারেলদের সংবর্ধনা উপলক্ষে আয়োজন করা হয় জাঁকালো অনুষ্ঠান। উন্মত্ত রজনী উৎসব নামের এই অনুষ্ঠানে আমন্ত্রিত হয়ে যোগদান করে ৩০ জনের বেশি ইসরাঈলী কর্ণেল, ৩০ জনের অধিক আমেরিকান জেনারেল এবং স্বাগতিক দেশের শীর্ষ স্থানীয় জেনারেলরা। অনুষ্ঠান শুরু করা হয় মদ্যপান ও নৃত্য দিয়ে। নর্তকীরা জেনারেলদের ঘিরে নাচছে। নারী ও নেশায় উন্মাদ, অনুষ্ঠানের প্রধান আয়োজক ধর্ম নিরপেক্ষ ও ধর্মদ্রোহী জেনারেল একজন কর্ণেলকে ডেকে পবিত্র কুরআন আনার নির্দেশ দেয়। ধর্মপ্রাণ কর্ণেল পবিত্র কুরআন আনার নির্দেশ পেয়ে শিউরে উঠলেন। কিন্তু উপায় নেই। নিরুপায় হয়ে তিনি পবিত্র কুরআন আনলেন। জেনারেল আবারো নির্দেশ দিল সুরা হিযরের ৯ নং আয়াত পড়ার। কর্ণেল পড়লেন ' إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ তিনি অর্থ ও করলেন, ' আমিই (আল্লাহ) কুরআন অবতীর্ণ করেছি এবং নিশ্চয় আমি নিজেই এর সংরক্ষক'। অর্থ শুনে জেনারেল বিদ্রুপাত্মক হাসি দিয়ে বলল, আল্লাহ নাকি নাযিল করেছে এই কুরআন এবং সে নিজেই নাকি এর রক্ষক। তিনি সঙ্গে সঙ্গে পবিত্র কুরআনকে ছিড়ে টুকরো টুকরো করে ছড়িয়ে দিল মদের আসরে নৃত্যরত নগ্ন নর্তকীদের পায়ের তলায়। আর দম্ভভরে উচ্চারণ করল, কোথায় সে কুরআন নাযিলকারী আর কোথায় এর হেফাযতকারী? এই পৈশাচিক উন্মত্ত দৃশ্য দেখে ক্যাপ্টেন আল্লাহু আকবর আল্লাহু আকবর চিৎকার দিতে দিতে অনুষ্ঠান ত্যাগ করলেন। আর তখনই মহান আল্লাহ পবিত্র কুরআন অবমাননাকারীদের প্রতি নাযিল করলেন গযব। কর্ণেল নৌঘাঁটি ত্যাগ করার সাথে সাথে সমুদ্রগর্ভ বিদীর্ণ করে বেরিয়ে এল প্রচণ্ড এক অগ্নিস্তম্ভ। কমলা রঙের প্রবল আলোর বিচ্ছুরণে ধাঁধিয়ে গেল চোখ। সঙ্গে সঙ্গে গগণ বিদারী ভয়ংকর শব্দে পুরো নৌঘাঁটি প্রোথিত হয়ে গেল। বিলীন হয়ে গেল মৃত্তিকাগর্ভে। প্রচণ্ড ভূমিকম্পে ধ্বংস্তুপে পরিণত হ'ল পার্শ্ববর্তী অন্যসব এলাকা।

বিজ্ঞান ও বিস্ময়

মালিকের দৃষ্টি পড়লেই তালা খুলবে!

মালিকের দৃষ্টি পড়লেই তালা খুলে যাবে। এধরনের তালা আবিষ্কার করেছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের 'আইডেনটিফাই কোম্পানী'। মানুষের চোখের রেটিনায় রয়েছে বেশ কিছু রক্তনালী। একজনের রক্তনালীর সাথে অন্য লোকের রক্ত নালীর কোন মিল নেই। এ তথ্যকে পুঁজি করেই 'আইডেনটিফাই কোম্পানী' এক ধরনের তালা আবিষ্কার করেছে। যে তালার উপর কর্তা ব্যক্তির দৃষ্টি পড়লে তালা খুলে যাবে। চোখের রক্তনালীর ভিন্নতার কারণে যার তালা সেই খুলতে পারবে। অন্য কেউ খুলতে পারবে না। তালা ক্রয়ের সময় চোখের রক্তনালীর সাথে তালার অ্যাডজাস্ট করে নিতে হবে। এ সময় তালার স্মৃতি কোষে ঐ নির্দিষ্ট ব্যক্তির চোখের ছাপ জমা করে দেওয়া হবে।

টিভি ফোন আবিষ্কার

দক্ষিণ কোরিয়ার মামসুং ইলেকট্রোনিক্স-এর একজন কর্মচারী গত ১লা ডিসেম্বর '৯৯ সিউলে একটি টিভি ফোন প্রদর্শন করেছেন। ১.৮ ইঞ্চি রঙ্গীন তরল স্ফটিক স্ক্রীন ও রিসিভার সম্বলিত এই টিভি ফোন বিশ্বের প্রথম মোবাইল ফোন, যা একই সাথে ২শ মিনিটের ইউ এইচ এফ ও ডি এইচ এফ চ্যানেল রিসিভ করে। ফোনের জবাব দিতে ব্যবহারকারীরা যে কোন চাবিতে চাপ দিতে পারবেন এবং একই সাথে বহনযোগ্য টিভিতে উন্নতমানের পরিস্কার ছবি দেখতে পারবেন। এই টিভি ফোন আগামী বছর স্থানীয় বাজারে পাওয়া যাবে। মূল্য হবে ১২৫০ ডলার।

চোর, সন্ত্রাসী ও চাঁদাবাজ চেনার যন্ত্র!

চোর, সন্ত্রাসী ও চাঁদাবাজ চেনার জন্য 'আইরিশ পাসএস কন্ট্রোল সিস্টেম' নামের একটি যন্ত্র আবিষ্কার করা হয়েছে। জাপানের 'ওকি ইলেকট্রিক কোম্পানী' এটি আবিষ্কার করেন। যন্ত্রটি যেকোন মানুষের গতিবিধির উপর নযর রাখবে এবং মানুষটি যদি সন্দেহভাজন হয় তাহ'লে তাকে চিনে রাখবে। এটি ভিডিও ক্যামেরার মত সংশ্লিষ্ট স্থানে বসিয়ে রাখতে হবে। কোন বৃহৎ ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের ম্যানেজারও কর্মচারীরা টাকা আত্মসাৎ অথবা পণ্য চুরি করতে পারে। তাছাড়া যেকোন মুহূর্তে সন্ত্রাসী ও চাঁদাবাজরা আক্রমণ করতে পারে। তাৎক্ষণিকভাবে এদের প্রতিরোধ করা সম্ভব নয়। কিন্তু এই যন্ত্রটি সংশ্লিষ্ট স্থানটিতে থাকলে পরবর্তীতে যন্ত্রটি থেকে তথ্য ও মানুষের চেহারা দেখে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাবে। যেভাবে একজন মানুষ অন্য মানুষকে চিনতে পারে, সেই কৌশল এই যন্ত্রটিতে প্রয়োগ করা হয়েছে। যন্ত্রটির মূল্য ১০ হাযার ডলার।

অন্ধদের পথ চলার যন্ত্র

অন্ধদের পথ চলা ও দিক নির্দেশনার জন্য একটি যন্ত্র আবিষ্কার করেছে 'ইউনিভার্সিটি অব বার্মিংহাম'। এই যন্ত্রটি দৃষ্টিশক্তিহীন অনেক মানুষকে অচেনা ও অজানা পরিবেশে চলাফেরা করতে সাহায্য করবে। গ্লোবাল পজিশনিং সিস্টেম-এর স্যাটেলাইট সংযোগ চালানো যায় যন্ত্রটিতে। এতে আছে একটি পার্সোনাল কম্পিউটার, একটি শ্রবণযন্ত্র বা এয়ারফোন এবং হাতের কবজিতে থাকবে একটি ক্ষুদ্রাকৃতির কী-বোর্ড। অন্ধ মানুষটি প্রথমে এই কী-বোর্ডের মাধ্যমে তার গন্তব্যস্থান রুট সম্পর্কে তথ্য দিয়ে রাখবে কম্পিউটারে। যাত্রা শুরু করে এক মিটার এগুলেই যন্ত্রটি শুরু করবে তার কাজ। স্যাটেলাইটের মাধ্যমে কম্পিউটার জানতে পারে তার ব্যবহারকারীর অবস্থান এবং সঙ্গে সঙ্গে তার এয়ার ফোনের সিনথেসাইড স্বরযন্ত্র কানে কানে বলে দিবে। এভাবে পথের নির্দেশনা পেয়ে দৃষ্টিশক্তিহীন একজন মানুষও পথ চলতে পারবে। ছোট এই কম্পিউটারটি পিঠে বহন করতে হবে।

সবাইকে স্বাগতম

আর ঢাকা নয় রাজশাহীতেই এখন পাওয়া যাবে ঢাকার মিষ্টি

আমরা বিভিন্ন অনুষ্ঠানে উৎকৃষ্টমানের বিভিন্ন রকম মিষ্টি, দৈ অর্ডার মাফিক সরবরাহ করি।

বনফুলের মিষ্টি এ যুগের সেরা সৃষ্টি

নিউ বনফুল

অভিজাত মিষ্টি বিপণী

আল-হাসিব প্লাজা, গণকপাড়া, সাহেব বাজার, রাজশাহী
ও
শাপলা প্লাজা, ষ্টেশন রোড, রেলগেট- রাজশাহী।

এম, এস মানি চেঞ্জার

বাংলাদেশ ব্যাংক অনুমোদিত

বিদেশী মুদ্রা, ডলার, পাউণ্ড, ষ্টার্লিং, ডয়েস মার্ক, ফ্রেঞ্চ ফ্রাঙ্ক, সুইস ফ্রাঙ্ক, ইয়েন, দিনার, রিয়াল ইত্যাদি ক্রয় বিক্রয় করা হয়। ডলারের ড্রাফট সরাসরি নগদ টাকায় ক্রয় করা হয় ও পাসপোর্ট ডলার সহ এনডোর্সমেন্ট করা হয়।

এম, এস মানি চেঞ্জার
সাহেব বাজার, জিরো পয়েন্ট, রাজশাহী
(সিনথিয়া কম্পিউটারের পিছনে)
ফোনঃ ৭৭৫৯০২, ফ্যাক্সঃ ৮৮০-০৭২১-৭৭৫৯০২

জনমত কলাম

ধর্মে ভেজাল দূরীকরণে সালফে ছালেহীনের ভূমিকাই যথেষ্ট

গত ১৩ই আগষ্ট '৯৯ শুক্রবার ঢাকার বায়তুল মুকাররাম জাতীয় মসজিদে পবিত্র কা'বা শরীফের মহামান্য ইমামের ইমামতিতে আমার জুম'আর ছালাত আদায় করার সৌভাগ্য হয়েছিল। তাঁর ছালাত আদায়ের পদ্ধতি আমাদের মত (হানাফী মাযহাবের মত) কি-না তা স্বচক্ষে দেখার জন্য সেদিন আমি ২য় কাতারের ঠিক মধ্যস্থলে দাঁড়িয়েছিলাম। খুৎবা শেষে ছালাত শুরু হ'লে তিনি 'আল্লাহু আকবর' বলে বুকের উপর হাত বাঁধলেন। অতঃপর সূরা ফাতেহা পাঠ করে সশব্দে আমীন বললেন। রুকূ' থেকে উঠে তিনি কাঁধ বরাবর দুই হাত তুললেন। ১ম সিজদা শেষ করে বেশ কিছুক্ষণ বসে তিনি ২য় সিজদায় গেলেন। সিজদায় যেটুকু সময় নেওয়া হয়েছিল ঠিক ততটুকু সময় বসে সম্পূর্ণ দুই হাতের উপর ভর দিয়ে তিনি উঠে দাঁড়ালেন। আমাদের মত হাঁটুর উপর ভর দিয়ে দাঁড়ালেন না ইত্যাদি।

তাঁর এরূপ ছালাত আদায়ের ধরন আর আহলেহাদীছগণের ছালাত আদায়ের ধরন আমার কাছে একই রকম বলে প্রতিভাত হ'ল। দুঃখের বিষয় আমরা ছালাতের যে পদ্ধতি নিয়ে বড়াই করি তার কোনই সিম্‌টম্ সেদিন তাঁর ছালাতে খুঁজে পেলাম না। অতঃপর বাড়ী ফিরে এ নিয়ে মানসিক যন্ত্রণায় ভুগতে লাগলাম। আল্লাহ্‌র ঘর পবিত্র কা'বা শরীফের ইমাম তিনি। এই শব্দমালার সাবলীল অর্থ হচ্ছে তিনি সারা দুনিয়ার মসজিদের ইমামগণের প্রতিনিধি। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের মুসলমানগণ পবিত্র হজ্জ মৌসুমে তাঁর পিছনে ছালাত আদায় করে থাকে। অথচ তাঁর ছালাতের সাথে আমাদের ছালাতের কোন মিল নেই। তবে কি আমরা ভ্রান্তির মধ্যে আছি? যখন প্রচণ্ডভাবে আমার হৃদয় তন্ত্রীতে এসব প্রশ্ন আঘাত হানছিল, ঠিক তখনই আমার প্রশান্তির চির উৎস গিন্নি একটি বই আমার হাতে দিয়ে বলল, বইটি পড়!

বইটির নাম 'রসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নামাজ'* লেখক নাছিরুদ্দীন আলবানী, হাদীছ শাস্ত্রের সিনিয়র অধ্যাপক, মদীনা ইসলামী ইউনিভার্সিটি, সঊদী আরব, প্রকাশক, শতাব্দী প্রকাশনী, ঢাকা। প্রথম থেকে বইটি আমার কাছে হৃদয়গ্রাহী ও অন্তরস্পর্শী হয়ে উঠল। আর এই অন্তরস্পর্শী হওয়ার প্রধান কারণ হ'ল ছালাত আদায়ের প্রতিটি পদ্ধতি হাদীছের দলীল দিয়ে লেখা। কা'বা শরীফের মাননীয় ইমাম ছাহেবের ছালাত আদায় পদ্ধতি দর্শন ও আল্লামা নাছিরুদ্দীন আলবানীর লিখিত উপরোক্ত বইটি পাঠ করে আমার ভুল ভেঙ্গে গেল। আমি যেন সঠিক পথের সন্ধান পেলাম। তাই আজ মন থেকে সোল্লাসে গাইতে ইচ্ছা করে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) যেমন আমাদের একমাত্র আদর্শ ও অনুসরণীয়, ঠিক তেমনি তাঁর যাবতীয় কর্মকাণ্ডের কেন্দ্রবিন্দু মসজিদে নববী হৌক আমাদের ছালাত আদায়ের একমাত্র আদর্শ স্থান। এই নীতি, এই শ্লোগানই একমাত্র প্রচলিত ফির্কাবন্দীর অবসান ঘটাতে এবং বিচ্ছিন্ন অবস্থায় বসবাস রত ভাইয়ে ভাইয়ে মিলনের অপূর্ব সেতু রচনা করতে প্রধান সহায়ক হবে বলে আমি বিশ্বাস করি। মাওলানা আব্দুর রহীম তাঁর 'সুন্নাত ও বিদ'আত' গ্রন্থে যথার্থই বলেছেন, 'সালফে-ছালেহীনের অনুসরণই আমাদের জন্য যথেষ্ট'। অর্থাৎ এ পথ ছাড়া অন্য কোন চোরাগলির ছিদ্রপথে আল্লাহ্‌র প্রতিশ্রুত বেহেশত পাওয়া যাবে বলে কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। আর ত্রুটিযুক্ত ছালাত নিয়ে মৃত্যুবরণ করলে মহা বিচার দিবসে তা যদি প্রথমেই রদ্ হয়ে যায়, তবে সে পদ্ধতির ছালাত আদায় করে আমাদের কি লাভ? তাই এই কথা আজ ভালভাবে উপলব্ধি করতে পেরে আমি আর জাল ও যঈফ হাদীছের অনুসারী না থেকে প্রকৃতভাবে কুরআন ও ছহীহ সুন্নাহ্‌র অনুসারী অর্থাৎ আহলেহাদীছ বলে নিজেকে চিহ্নিত করলাম। ওয়াস্‌সালাম।

-মুহাম্মাদ হাসান আলী
বসুপাড়া বাঁশতলা, খুলনা সিটি, খুলনা।

* *বইটির মূল আরবী নাম 'ছিফাতু ছালাতিন নবী'।*

বিশ্ব ইজতেমায় আযান ও ছালাত প্রসঙ্গে

এ যাবত দেখে আসছি যে, বিশ্ব ইজতেমায় মাইকে আযান দেয়া হয় না এবং জামা'আতের ফরয ছালাতগুলোও মাইকে পড়ানো হয় না, যার ফলে ছালাতে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হয়। আর এটা হওয়ারই কথা। এত বড় জামা'আত শেষ প্রান্ত পর্যন্ত মুকাব্বেরদের আওয়াজ পৌঁছতে কয়েক মিনিট সময় লাগে। সারা মাঠের আওয়াজে মুছল্লীদের বুঝা মুশকিল হয়, কি আল্লাহু আকবার বলে, না ছামি'আল্লাহুলিমান হামিদা বলে। যার দরুন কতেক মুছল্লী দাঁড়ানো, কতেক রুকূ'তে, কতেক সেজদায় থাকে। অনেকে ছালাত ছেড়ে বোকার মত দাঁড়িয়ে বা বসে থাকে। কেউ একা একা আবার অনেককে ভিন্ন ভিন্ন জামা'আত করে ছালাত পড়তে দেখা যায়। এতক্ষণ ইমামের দেরী করা ঠিক হবে কি-না, ছালাতের তারতীব নষ্ট হয় কি-না দেখার বিষয় আছে। তাছাড়া ছালাতের খুশু খুযূ আল্লাহ্‌র ধ্যান ও খেয়াল মোটেও থাকে না, মুছল্লীগণ শুধু মুকাব্বেরদের আওয়াজ শোনার খেয়ালে থাকেন। আর সেই আওয়াযও বোঝা যায় না, চতুর্দিক থেকে শুধু একটা শোরশার আওয়াজ শোনা যায়। এতে ছালাতের উদ্দেশ্যই ব্যাহত হয়। এতগুলো সমস্যা সমাধান করা যায় মাইক ব্যবহার করলে। কাকরাইলের মুরুব্বীরা আযান ও ছালাতে কেন মাইক ব্যবহার করেন না, এই প্রশ্ন আজ অনেকেরই। এটা কি শরীয়তের কোন বিধান? ইসলামের জন্মভূমি মক্কা ও মদীনা শরীফেও আযান ও ছালাতে মাইক ব্যবহার করা হয়। আমাদের জাতীয় মসজিদ বায়তুল মুকাররম থেকে শুরু করে সকল মসজিদে আযান ও ছালাত মাইকে চলছে, তাহ'লে তবলীগের এই পদ্ধতি কেন?

-হাফেয আবদুস সাত্তার
বাহেরকুচি, সিরাজদিখান, মুন্সিগঞ্জ।

সংগঠন সংবাদ

আন্দোলন

আমীরে জামা'আতের বাগেরহাট সফর

(ক) কালদিয়া আল-মারকাযুল ইসলামী শুভ উদ্বোধনঃ গত ২২শে অক্টোবর '৯৯ রোজ শুক্রবার 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' বাগেরহাট সাংগঠনিক যেলার উদ্যোগে কালদিয়া আল-মারকাযুল ইসলামী উদ্বোধন উপলক্ষে এক বিরাট সুধী সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। সুধী সমাবেশে প্রধান অতিথির ভাষণে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর মুহতারাম আমীর ও রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবী বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব বলেন, দেশে বর্তমানে দু'ধরণের শিক্ষা ব্যবস্থা গড়ে উঠেছে- (১) ধর্মনিরপেক্ষ বা ধর্মহীন শিক্ষা ব্যবস্থা (২) ধর্মভিত্তিক শিক্ষা ব্যবস্থা। তিনি বলেন, ধর্মনিরপেক্ষ শিক্ষা ব্যবস্থা থেকে আদর্শ মানুষ গড়ে উঠেনা। বরং অধিকাংশ শিক্ষার্থী হয় আত্মকেন্দ্রিক। শিক্ষাকালীন সময়ে নৈতিকতার ট্রেনিং না থাকার কারণে Eat, Drink and merry. (পানাহার কর, স্ফূর্তি কর) হয় তাদের জীবনের একমাত্র লক্ষ্য। তিনি বলেন, আদর্শ মানুষ গড়ার ক্ষেত্রে ধর্মভিত্তিক শিক্ষা ব্যবস্থার বিকল্প নেই। ধর্মভিত্তিক শিক্ষা ব্যবস্থা জাতিকে আদর্শ নাগরিক উপহার দিতে পারে। এ প্রসঙ্গে তিনি সোনালী যুগের সোনার মানুষের কথা তুলে ধরেন। যারা ছিলেন ধর্মীয় শিক্ষায় সুশিক্ষিত, সমাজ কল্যাণে নিবেদিত প্রাণ আদর্শ মানুষ। তিনি দেশ ও জাতির কল্যাণে ধর্মনিরপেক্ষ শিক্ষাব্যবস্থা বাতিল করে 'অহি' ভিত্তিক কল্যাণকর শিক্ষা ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করার জন্য দেশের নেতৃবৃন্দকে আহবান জানিয়ে মহান আল্লাহ্‌র নামে কালদিয়া আল-মারকাযুল ইসলামীর শুভ উদ্বোধন ঘোষণা করেন।

বিশেষ অতিথি হিসাবে বক্তব্য রাখেন, 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর সিনিয়র নায়েবে আমীর শায়খ আবদুছ ছামাদ সালাফী। তিনি পরিবারের প্রধানদেরকে তাদের সন্তানদের 'অহি'-র শিক্ষায় সুশিক্ষিত করার জন্য আহবান জানান। অন্যান্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন, 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় তাবলীগ সম্পাদক মুহাম্মাদ শিহাবুদ্দীন সুন্নী, কেন্দ্রীয় দফতর সম্পাদক গোলাম মোক্তাদির (বাবু), তাওহীদ ট্রাষ্ট্র-এর কেন্দ্রীয় হিসাব পরিচালক ও আল-আরাফাহ ইসলামী ব্যাংকের সিনিয়র ভাইস প্রেসিডেন্ট জনাব এস,এ,এম, হাবীবুর রহমান প্রমুখ।

প্রকাশ থাকে যে, 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর সমাজকল্যাণ সংস্থা তাওহীদ ট্রাষ্ট (রেজিঃ)-এর সৌজন্যে বাগেরহাট শহর হ'তে উত্তরে অনধিক দুই কিলোমিটার দূরে বাগেরহাট-চিতলমারী সড়কের পশ্চিম পার্শ্বে আড়াই একর জমির উপর অত্র মারকায প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। সেখানে একটি মাদরাসা, এতিমখানা, জামে' মসজিদ ও পুকুর রয়েছে। ৩৩ জন এতিম দিয়ে এতিমখানা শুরু হ'লেও বর্তমানে সেখানে ৫০ জন এতিমের থাকা, খাওয়া, চিকিৎসা ও লেখা-পড়া শুরু হয়েছে। 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর শিক্ষা বিভাগের পরিচালনায় আহলেহাদীছ মাদরাসা বোর্ডের সিলেবাস এখানে অনুসৃত হয়।

উল্লেখ্য যে, বাগেরহাট নদী তীরবর্তী মণিগঞ্জ খেয়াঘাট হ'তে মারকায পর্যন্ত দীর্ঘ প্রায় ২ কিলোমিটার রাস্তা মারকাযের ছাত্র শিক্ষক এবং বাগেরহাট যেলা 'আন্দোলন' ও 'যুবসংঘে'র কর্মীবৃন্দ ও এলাকাবাসী ব্যানার, ফেস্টুন সমৃদ্ধ বিরাট মিছিল সহকারে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন যিন্দাবাদ' 'মুক্তির একই পথ দাওয়াত ও জিহাদ' 'সকল বিধান বাতিল কর অহি-র বিধান কায়েম কর' ইত্যাদি শ্লোগানে মুখরিত করে আমীরে জামা'আত ও তাঁর সফরসঙ্গীদেরকে মারকাযে নিয়ে আসে। অতঃপর আমীরে জামা'আত মারকায এলাকা ঘুরে ঘুরে দেখেন ও এলাকাবাসীর সাথে মতবিনিময় করেন এবং মারকাযের উত্তরোত্তর উন্নতির জন্য সকলের সহযোগিতা কামনা করেন।

মুহতারাম আমীরে জামা'আত ও তাঁর সফরসঙ্গীগণ রাজশাহী হ'তে ট্রেন যোগে খুলনায় এসে সার্কিট হাউযে রাত্রি যাপন করেন। তিনি সেখানে খুলনা যেলা 'আন্দোলন'-এর নবগঠিত কর্মপরিষদের সাথে যরূরী বৈঠকে মিলিত হন। পরদিন সকালে সাতক্ষীরা ও ঝিনাইদহ 'আন্দোলন'-এর সভাপতিদ্বয় ও তাদের সাথীগণ সার্কিট হাউযে এসে আমীরে জামা'আতের সাথে মিলিত হন ও একত্রে বাগেরহাট সফরে গমন করেন।

(খ) চিতলমারীতে কর্মী ও সুধী সমাবেশঃ কালদিয়া মারকায উদ্বোধনের পরে সেখান থেকে প্রায় ২১ কিলোমিটার দূর চিতলমারী থানা শহরে তাওহীদ ট্রাষ্ট-এর সৌজন্যে প্রতিষ্ঠিত আহলেহাদীছ জামে' মসজিদে আয়োজিত এক কর্মী ও সুধী সমাবেশে তিনি ভাষণ প্রদান করেন।

সমাবেশে প্রধান অতিথির ভাষণে মুহতারাম আমীরে জামা'আত বলেন, বর্তমান পৃথিবীতে মুসলমানগণ দুনিয়ামুখী হয়ে গেছে। জীবন চলার পথে আল্লাহ্‌র বিধানকে বাদ দিয়েছে। ফলশ্রুতিতে সারা পৃথিবীতে মুসলমানরা আজ নির্যাতিত ও লাঞ্ছিত হচ্ছে। এহেন অবস্থা থেকে মুক্তি পেতে হ'লে আমাদের সবাইকে আল্লাহ প্রদত্ত অভ্রান্ত আদর্শের দিকে ফিরে যেতে হবে। ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রীয় জীবনে সেই আদর্শ প্রতিষ্ঠার জন্য জামা'আতবদ্ধভাবে অবিরাম সংগ্রাম করতে হবে। তিনি সবাইকে 'অহি'-র বিধান প্রতিষ্ঠার জন্য এগিয়ে আসার আহবান জানান। বিশেষ অতিথি হিসাবে বক্তব্য রাখেন,

'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর সিনিয়র নায়েবে আমীর শায়খ আব্দুছ ছামাদ সালাফী ও কেন্দ্রীয় তাবলীগ সম্পাদক মাওলানা শিহাবুদ্দীন সুন্নী।

জনাব আহমাদ আলী-র সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সুধী সমাবেশে অন্যান্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন সাতক্ষীরা যেলা সভাপতি আলহাজ্জ আব্দুর রহমান (মাষ্টার), খুলনা যেলা সভাপতি ইসরাফীল হোসাইন, ঝিনাইদহ যেলা সভাপতি মাষ্টার ইয়াকুব হোসাইন প্রমুখ।

উল্লেখ্য যে, মুহতারাম আমীরে জামা'আত ও তার সফরসঙ্গীগণ চিতলমারী সরকারী ডাকবাংলো রেষ্ট হাউযে রাত্রি যাপন করেন।

(গ) পরদিন সকালে মুহতারাম আমীরে জামা'আত পূর্ব ঘোষিত প্রোগ্রাম অনুযায়ী মোল্লারহাট থানার অন্তর্গত সারুলিয়া গ্রামে তাওহীদ ট্রাষ্ট-এর সৌজন্যে নবনির্মিত আহলেহাদীছ জামে মসজিদ উদ্বোধন ও বাগেরহাট যেলার কর্মী সম্মেলনে যোগদানের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হন। পথিমধ্যে তিনি তাওহীদ ট্রাষ্ট-এর সৌজন্যে নির্মিত গারফা আমীনবাড়ী জামে মসজিদ ও নাশুখালী জামে মসজিদ পরিদর্শন করেন। নাশুখালীতে 'আন্দোলন' ও 'যুবসংঘে'র যৌথ সমাবেশে ভাষণ দেন। অতঃপর বেলা ১টায় তিনি সারুলিয়া পৌঁছে যান।

'আন্দোলন' ও 'যুবসংঘে'র কর্মী ও স্থানীয় জনগণ গগণবিদারী শ্লোগান ও মিছিল সহকারে মুহতারাম আমীরে জামা'আত ও তাঁর সফরসঙ্গীদেরকে মসজিদে নিয়ে যান। অতঃপর সেখানে যোহরের ছালাত আদায়ের পর তিনি বিরাট কর্মী ও সুধী সমাবেশে গুরুত্বপূর্ণ ভাষণ দান করেন। উক্ত সমাবেশে অন্যান্য সংগঠনের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন। মুহতারাম আমীরে জামা'আত তাঁর ভাষণে এ কথা পরিষ্কার করে তুলে ধরেন যে, 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' একটি সুস্পষ্ট লক্ষ্য নিয়ে তার যাত্রা শুরু করেছে। সে লক্ষ্য হ'ল আমাদের ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় জীবনকে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে ঢেলে সাজানো ও তার মাধ্যমে আল্লাহ্র সন্তুষ্টি অর্জন করা। তিনি বিভিন্ন উদাহরণ ও দলীলের মাধ্যমে প্রমাণ করেন যে, প্রচলিত রাজনীতি ও ধর্মীয় দল সমূহের মাধ্যমে আহলেহাদীছ আন্দোলনের উপরোক্ত লক্ষ্য অর্জিত হওয়া সম্ভব নয়। অতএব, সত্যিকার অর্থে যারা পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছ অনুযায়ী তাদের সার্বিক জীবন গড়ে তুলতে চান, তাদের পক্ষে আহলেহাদীছ আন্দোলন ব্যতীত অন্য কোন আন্দোলন বা সংগঠনে যোগদান করার কোন অবকাশ নেই। উপসংহারে তিনি সাতক্ষীরা, খুলনা ও বাগেরহাট অঞ্চলে আহলেহাদীছ আন্দোলন বিস্তারে তার মরহুম পিতা ও শিক্ষাগুরু মাওলানা আহমাদ আলীর অবদানের কথা শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করেন। মাওলানা আহমাদ আলীর ছাত্র মাওলানা মনীরুযযামান, মাওলানা রফীকুল ইসলাম, মাওলানা নযরুল ইসলাম, মাওলানা হেকমতুল্লাহ প্রমুখ অত্রাঞ্চলের প্রবীন ওলামায়ে কেরাম ও তরুণ আলেম ও সমাজ নেতাদের প্রতি আহলেহাদীছ আন্দোলনকে এগিয়ে নেওয়ার জন্য উদাত্ত আহবান জানান।

'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' বাগেরহাট যেলা সভাপতি মাওলানা আহমাদ আলীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সুধী সমাবেশে অন্যান্যদের মধ্যে ভাষণ দান করেন, 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর সিনিয়র নায়েবে আমীর শায়খ আব্দুছ ছামাদ সালাফী, কেন্দ্রীয় তাবলীগ সম্পাদক মাওলানা শিহাবুদ্দীন সুন্নী, 'আন্দোলন'-এর সাতক্ষীরা যেলা সভাপতি আলহাজ্জ আব্দুর রহমান মাষ্টার, ঝিনাইদহ যেলা সভাপতি মাষ্টার ইয়াকুব হোসাইন প্রমুখ। এলাকার পক্ষ হ'তে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে স্বাগত ভাষণ দেন বাগেরহাট যেলা 'আন্দোলন'-এর সাধারণ সম্পাদক মাওলানা এমদাদুর রহমান। অতঃপর মুহতারাম আমীরে জামা'আত ও তাঁর সফরসঙ্গীগণ রাতে খুলনা ফিরে আসেন।

দায়িত্বশীল প্রশিক্ষণ

'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর ১৯৯৯-২০০১ সেশনের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত বিভিন্ন যেলার যেলা সভাপতি, সহ-সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদকদের নিয়ে দায়িত্বশীল প্রশিক্ষণ গত ৫ই নভেম্বর শুক্রবার দারুল ইমারত নওদাপাড়া, রাজশাহীতে সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হয়।

প্রশিক্ষণে পূর্ব নির্ধারিত বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করেন 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর মুহতারাম আমীর **ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব** (বিষয়- দায়িত্বশীলের গুণাবলী), কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক রেযাউল করীম (বিষয়- গঠনতন্ত্র পর্যালোচনা ও সাংগঠনিক দিকনির্দেশনা), কেন্দ্রীয় তাবলীগ সম্পাদক মাওলানা শিহাবুদ্দীন সুন্নী (দরসে কুরআন- সূরা আছর)।

সমাপনী অনুষ্ঠানে মুহতারাম আমীরে জামা'আত দায়িত্বশীলদের উদ্দেশ্যে হেদায়াতী ভাষণে বলেন, দেশ ও জাতির এ ক্রান্তিলগ্নে আন্দোলনের যেলা দায়িত্বশীলদের সচেতন ভাবে পরকালীন স্বার্থে জাতির কল্যাণে কাজ করে যেতে হবে। একটি সুশীল সমাজ প্রতিষ্ঠার জন্য 'অহি' ভিত্তিক সমাজ প্রতিষ্ঠার বিকল্প নেই। 'অহি' ভিত্তিক সমাজই জাতিকে একটি সুশীল ও শান্তিময় সমাজ উপহার দিতে পারে। তিনি দায়িত্বশীলদের 'অহি' ভিত্তিক সমাজ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে দাওয়াত ও জিহাদের কর্মসূচী বাস্তবায়ন করার আহবান জানান।

গাবতলী এলাকা সম্মেলন

'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' গাবতলী এলাকার উদ্যোগে গত ২৫ ও ২৬শে নভেম্বর গাবতলী পাইলট উচ্চ বিদ্যালয় মাঠে ২ দিন ব্যাপী ইসলামী সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সম্মেলনে প্রধান অতিথি হিসাবে বক্তব্য রাখেন 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর মুহতারাম আমীর

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবী বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক জনাব **ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব**। বিশেষ অতিথি হিসাবে বক্তব্য রাখেন সিনিয়র নায়েবে আমীর শায়খ আবদুছ ছামাদ সালাফী, সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক রেযাউল করীম, সাংগঠনিক সম্পাদক অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম। মাননীয় প্রধান অতিথি স্বীয় বক্তব্যে বর্তমান রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও ধর্মীয় সমাজব্যবস্থাকে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে ঢেলে সাজানোর লক্ষ্যে আহলেহাদীছ আন্দোলনের দৃষ্টিভঙ্গি ব্যাখ্যা করেন এবং বলেন যে, যতদিন পর্যন্ত সমাজকে আল্লাহ প্রেরিত সর্বশেষ অহি-র বিধান অনুযায়ী পরিচালিত করা সম্ভব না হবে, ততদিন পর্যন্ত সমাজ বর্তমান দুরবস্থা হ'তে মুক্ত হ'তে পারবেনা। এ লক্ষ্যে এগিয়ে আসার জন্য তিনি সকলের প্রতি আহবান জানান। আলহাজ্ব মুহাম্মাদ শামসুযযোহার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সম্মেলনে অন্যান্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন মাওলানা মুহাম্মাদ মুসলিম (ঢাকা) মাওলানা শিহাবুদ্দীন সুন্নী (গাইবান্ধা), মাওলানা আবদুর রাযযাক বিন ইউসুফ (রাজশাহী), মাওলানা আবদুর রহীম (খুলনা), হাফেয আযীযুর রহমান (সভাপতি, যুবসংঘ), মাওলানা জাহাঙ্গীর আলম (খুলনা), অধ্যাপক আলমগীর হোসাইন (সিরাজগঞ্জ), মাওলানা আবদুছ ছামাদ (সাতক্ষীরা), মাওলানা কফীলুদ্দীন (গাজীপুর), মাওলানা আবদুল মান্নান (সাতক্ষীরা), মুহাম্মাদ শফীকুল ইসলাম (আল-হেরা শিল্পীগোষ্ঠী প্রধান) প্রমুখ।

হজ্জ প্রশিক্ষণ

'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' পরিচালিত 'আল-কাওছার হজ্জ প্রকল্প'-এর মাধ্যমে ২০০০ সালের হজ্জ যাত্রীদের উদ্দেশ্যে গত ৮ই ফেব্রুয়ারী আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, নওদাপাড়া, রাজশাহীতে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছ অনুযায়ী হজ্জ সম্পাদনের বাস্তব প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। প্রশিক্ষণ উদ্বোধন করেন 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর সিনিয়র নায়েবে আমীর ও আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফীর অধ্যক্ষ শায়খ আবদুছ ছামাদ সালাফী। অতঃপর হজ্জ-এর নিয়মাবলী ও প্রয়োজনীয় দো'আর উপর গুরুত্বপূর্ণ প্রশিক্ষণ দেন আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফীর উপাধ্যক্ষ মাওলানা সাঈদুর রহমান ও শিক্ষক মাওলানা আবদুর রাযযাক বিন ইউসুফ। প্রশিক্ষণে ১৪ জন হজ্জযাত্রী অংশগ্রহণ করেন। তারা হ'লেন বগুড়া থেকে মুহাম্মাদ মুযযাম্মিল হক, মাওলানা রামাযান আলী, আবদুল খালেক, হাফীযুর রহমান, মাওলানা মুমতাযুর রহমান, মকবুল হোসাইন, এরফান আলী খন্দকার, রাজশাহী থেকে জনাব শহীদ-উল মুলক, আবুল হাসান, ফয়েযুদ্দীন, আফসার আলী, কুষ্টিয়া থেকে ছিফাতুল্লাহ্, সাতক্ষীরা থেকে শহীদুল ইসলাম ও দিনাজপুরের আবুল কাসেম।

বাদ এশা মুহতারাম আমীরে জামা'আত **ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব** দারুল ইমারত মারকাযী জামে' মসজিদে প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণকারী হজ্জ যাত্রী ভাইদের উদ্দেশ্যে সমাপনী ভাষণ পেশ করেন। এ সময় তিনি 'আল-কাওছার হজ্জ প্রকল্পে'র বৈশিষ্ট্য তুলে ধরেন এবং হজ্জ যাত্রীদেরকে প্রশিক্ষণ অনুযায়ী হজ্জ করার ও যাবতীয় বিদ'আত থেকে বেঁচে থাকার আহ্বান জানান।

উল্লেখ্য, আল-কাউছার হজ্জ প্রকল্পের মাধ্যমে এ বছর ২৯ জন হজ্জ করতে যাচ্ছেন।

মৃত্যু সংবাদ

'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর নিবেদিতপ্রাণ কর্মী, মাসিক **আত-তাহরীক**-এর চাঁপাই নবাবগঞ্জ শহরের এজেন্ট জনাব আবুল কাসেম (৬০) গত ২১শে ডিসেম্বর ১২ই রামাযান রহনপুর থেকে আন্দোলনের মাসিক বৈঠক শেষে বাড়ী ফেরার পথে গোবরাতলা হাটে ইফতারের দু'মিনিট পূর্বে আকস্মিক ভাবে ইন্তেকাল করেন। ইন্না লিল্লা-হি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজে'উন। মৃত্যুকালে তিনি স্ত্রী, ২ ছেলে ও ২ মেয়ে রেখে যান।

মরহুম আবুল কাসেম যেমন ছিলেন সংগঠন প্রিয় তেমনি ছিলেন মুহতারাম আমীরে জামা'আতের একান্ত অনুরক্ত ও আত-তাহরীকের ভক্ত পাঠক। ঐ দিন বাড়ী থেকে বের হওয়ার সময় তিনি তাহরীকের গায়ে আমীরে জামা'আতের টেলিফোন নম্বর লিখে তার মেয়েকে বলেছিলেন, আমার কিছু হ'লে আমীর ছাহেবের নিকট টেলিফোন কর। কিন্তু দুর্ভাগ্য, তার মৃত্যুর সময় মুহতারাম আমীরে জামা'আত সংযুক্ত আরব আমীরাতে ছিলেন। দেশে ফিরে তিনি রাজশাহী বিমান বন্দরে নেমেই আবুল কাসেম ছাহেবের মৃত্যুর সংবাদ জানতে পেরে দারুনভাবে ব্যথিত হন। তিনি আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফীর ছাত্র-শিক্ষকদের নিয়ে গায়েবানা জানাযা পড়েন। অতঃপর গত ২৭শে ডিসেম্বরে চাপাই নবাবগঞ্জ শহরের চরজোত প্রতাপ পণ্ডিত পাড়ায় মরহুমের নিজ বাসভবনে যান ও তাঁর ছেলে মেয়েদের শান্তনা দেন এবং কবর যিয়ারত করেন। 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশে'-এর সিনিয়র নায়েবে আমীর শায়খ আবদুছ ছামাদ সালাফী ও মাওলানা সাঈদুর রহমান সহ আরো এ সময় তাঁর সফরসঙ্গী ছিলেন।

[আত-তাহরীক পরিবার তার একজন সদস্যকে হারিয়ে আন্তরিকভাবে মর্মাহত। আমরা তাঁর রূহের মাগফেরাত কামনা করছি এবং শোক সন্তপ্ত পরিবারের প্রতি সমবেদনা জ্ঞাপন করছি। -সম্পাদক]

যুবসংঘ

মাহে রামাযান উপলক্ষে কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দের দেশ ব্যাপী সফর

'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘে'র কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দ মাহে রামাযান উপলক্ষে গত ১৬ই ডিসেম্বর '৯৯ হ'তে ৬ই জানুয়ারী ২০০০ পর্যন্ত ৪টি গ্রুপে ৩৪টি সাংগঠনিক যেলায় সফর করেন। যেলা সমূহ হচ্ছে- নরসিংদী ১৬ই ডিসেম্বর; ঢাকা, বাগেরহাট ও দিনাজপুর ১৭ই ডিসেম্বর; জয়পুরহাট, খুলনা ও গাজীপুর; ১৮ই ডিসেম্বর; সাতক্ষীরা ও কুমিল্লা ১৯শে ডিসেম্বর; যশোর ২০শে ডিসেম্বর; মেহেরপুর ও নওগাঁ ২১শে ডিসেম্বর; কুষ্টিয়া পশ্চিম ২২শে ডিসেম্বর; ঝিনাইদহ ২৩শে ডিসেম্বর; চাঁপাই নবাবগঞ্জ ও কুষ্টিয়া পূর্ব ২৪শে ডিসেম্বর; রাজবাড়ী ২৫শে ডিসেম্বর; ময়মনসিংহ ২৬শে ডিসেম্বর; জামালপুর, রংপুর ও ফরিদপুর ২৭শে ডিসেম্বর; নীলফামারী ও টাংগাইল ২৮শে ডিসেম্বর; সিরাজগঞ্জ, পঞ্চগড়, লালমণিরহাট ও গোপালগঞ্জ ২৯শে ডিসেম্বর; ঠাকুরগাঁও, কুড়িগ্রাম ও পাবনা ৩০শে ডিসেম্বর; দিনাজপুর পশ্চিম, গাইবান্ধা পূর্ব ও নাটোর ৩১শে ডিসিম্বর; বগুড়া ১লা জানুয়ারী ২০০০; গাইবান্ধা পশ্চিম ৬ই জানুয়ারী।

যেলা সমূহে সফর করেন কেন্দ্রীয় সভাপতি হাফেয মুহাম্মাদ আযীযুর রহমান, সহ-সভাপতি হাবীবুর রহমান মীযান, সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মাদ জালালুদ্দীন, সাংগঠনিক সম্পাদক এ,এস,এম আযীযুল্লাহ, অর্থ সম্পাদক শাহীদুযযামান ফারূক, প্রশিক্ষণ সম্পাদক আবদুল গফূর, তাবলীগ সম্পাদক মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম ও কেন্দ্রীয় কাউন্সিল সদস্য মুহাম্মাদ আকবর হোসাইন।

নেতৃবৃন্দ এ সময় যুব সমাজকে শত প্রতিকূলতার মাঝেও ধৈর্য ও সহনশীলতার সাথে এবং হিকমত ও সদুপদেশের মাধ্যমে পথহারা ভাইদের নিকট পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের দাওয়াত পৌঁছে দেয়ার আহ্বান জানান।

কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদকের গাজীপুর সফর

'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘে'র কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মাদ জালালুদ্দীন গত ১৯ হ'তে ২১শে জানুয়ারী ২০০০ পর্যন্ত গাজীপুর সাংগঠনিক যেলা সফর করেন। তিনি চকপাড়া পিরুজালী ও চান্দপাড়া জামে' মসজিদে অনুষ্ঠিত কর্মী ও সুধী সমাবেশে প্রধান অতিথির ভাষণে বলেন, বর্তমানে আমাদের দেশে অসুস্থ ও নোংরা রাজনীতি চলছে। ফলে দেশে আজ চরম অশান্তি বিরাজ করছে। সমাজের এই নোংরামী ও অশান্তি দূর করতে ছাত্র ও যুবকদের 'অহি' ভিত্তিক সমাজ প্রতিষ্ঠায় এগিয়ে আসতে হবে। তিনি প্রচলিত ধ্বংসাত্মক রাজনীতি পরিহার করে 'অহি' ভিত্তিক কল্যাণকর সমাজ প্রতিষ্ঠায় যুবকদের এগিয়ে আসার আহ্বান জানান। অন্যান্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন গাজীপুর যেলার সভাপতি কাযী মাওলানা মুহাম্মাদ আমীনুল ইসলাম, সহ-সভাপতি শফীকুল ইসলাম, সাধারণ সম্পাদক আব্দুল মালেক, অর্থ সম্পাদক যাকির হোসাইন ও গাজীপুর যেলার সাবেক সভাপতি জনাব আসমত আলী প্রমুখ।

রচনা প্রতিযোগিতা '৯৯ -এর ফল প্রকাশ

'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘে'র উদ্যোগে অনুষ্ঠিত রচনা প্রতিযোগিতা '৯৯-এর ফলাফল প্রকাশিত হয়েছে।

* ১ম গ্রুপে (রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর বাল্য জীবন) প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থান অধিকার করেছে যথাক্রমে আব্দুল আলীম (যশোর), ইমামুদ্দীন (নবাবগঞ্জ) ও আব্দুল মাজেদ (গাইবান্ধা)।

* ২য় গ্রুপে (যুব সমাজের আত্মত্যাগ ব্যতীত জাতির উন্নতি সম্ভব নয়) প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থান অধিকার করেছে যথাক্রমে মুহাম্মাদ নযরুল ইসলাম (নবাবগঞ্জ), মুহাম্মাদ শরীফ (কুষ্টিয়া) ও মুহাম্মাদ ওয়ালিউল্লাহ (রাজশাহী)।

* ৩য় গ্রুপে (প্রচলিত সমাজ বনাম রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর প্রতিষ্ঠিত সমাজ) প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থান অধিকারীদের নাম যথাক্রমে মুহাম্মাদ কামরুযযামান বিন আব্দুল বারী (জামালপুর), মুহাম্মাদ রবী'উল ইসলাম (ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়) ও জেসমিন সুলতানা (জয়পুরহাট)।।

আয়েশা ক্লিনিক

এখানে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক দ্বারা সর্বপ্রকার রোগের চিকিৎসা অস্ত্রপচার ও ডেলিভারী করা হয়। এক্স-রে, ই,সি,জি আলট্রাসনগ্রাফী ও প্যাথলজীর সু-ব্যবস্থা আছে।

পরিচালকঃ নূর মহল বেগম

ঠিকানাঃ গ্রেটার রোড, কদমতলা, রাজশাহী।
ফোন ঃ ৭৭৩০৫৩ (অনুঃ)

বিশেষ প্রতিবেদন

[তাবলীগী ইজতেমা ১৯৮০ হ'তে ১৯৯৮]

১৯৭৮ সালের ৫ই ফেব্রুয়ারী নির্ভেজাল তাওহীদের ঝাণ্ডাবাহী এদেশের একক যুবসংগঠন 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' প্রতিষ্ঠার পর প্রথম জাতীয় সম্মেলন ও তাবলীগী ইজতেমা অনুষ্ঠিত হয় ঢাকায় ১৯৮০ সালের ৫ ও ৬ই এপ্রিল। অতঃপর দীর্ঘ পথ পরিক্রমার পর ১৯৯১ সালের ২৫ ও ২৬শে এপ্রিল বৃহস্পতি ও শুক্রবার রাজশাহী মহানগরীর উপকণ্ঠে নওদাপাড়ার আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফীর দক্ষিণ পার্শ্বের বিস্তীর্ণ ময়দানে ২য় জাতীয় সম্মেলন ও তাবলীগী ইজতেমা অনুষ্ঠিত হয়। এরপর থেকে প্রতি বৎসর বাংলাদেশের এই সর্বাধিক আহলেহাদীছ অধ্যুষিত যেলা রাজশাহীতে বিপুল সমারোহে তাবলীগী ইজতেমা অনুষ্ঠিত হয়ে আসছে। ফালিল্লা-হিল হাম্দ। দেশ ও বিদেশের খ্যাতনামা আহলেহাদীছ মনীষীর উপস্থিতি এবং দেশের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে গাড়ী রিজার্ভ করে কর্মীদের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ শুধু সম্মেলনস্থল নয় বরং গোটা রাজশাহী মহানগরী যেন জনসমুদ্রে পরিণত হয়। তাওহীদ ও রিসালাতের মুহুর্মুহু শ্লোগানে আকাশ বাতাস মুখরিত হয়ে উঠে। পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছ অনুযায়ী ব্যক্তি, সমাজ ও রাষ্ট্র গঠনের জোরালো দাবী উত্থাপিত হয়। আল্লাহ প্রেরিত সর্বশেষ 'অহি' ভিত্তিক জীবন পরিচালনার গভীর প্রেরণা ও ইস্পাত-কঠিন শপথ নিয়ে কর্মীরা নিজ নিজ এলাকায় প্রত্যাবর্তন করেন। এক্ষণে তাবলীগী ইজতেমা ১৯৮০ হ'তে ১৯৯৮ পর্যন্ত সংক্ষিপ্ত প্রতিবেদন নিম্নে প্রদত্ত হ'ল-

তাবলীগী ইজতেমা'৮০

আহলেহাদীছ আন্দোলনের ইতিহাসে ১৯৮০ সালের ৫ ও ৬ই এপ্রিল ছিল এক অবিস্মরণীয় দিন। ঐ দিন বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘের ঐতিহাসিক ১ম জাতীয় সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় রাজধানীতে 'ঢাকা যেলা ক্রীড়া সমিতি' মিলনায়তনে। সম্মেলন উদ্বোধন করেন 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘে'র তৎকালীন প্রধান উপদেষ্টা 'বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলেহাদীস'-এর সভাপতি জনাব ডঃ মুহাম্মাদ আবদুল বারী। সম্মেলনে দেশের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে ব্যাপকহারে যুবসংঘের নিবেদিত প্রাণ কর্মী ও সুধীবৃন্দ অংশগ্রহণ করেন। উল্লেখ্য যে, এটিই ছিল ঢাকার আহলেহাদীছ মহল্লার বাইরে আহলেহাদীছদের প্রথম প্রকাশ্য জাতীয় সম্মেলন।

পরদিন ৬ই এপ্রিল ইসলামিক ফাউণ্ডেশন মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত হয় 'তাওহীদের শিক্ষা ও আজকের সমাজ' শীর্ষক ইসলামী সেমিনার। সেমিনারে লিখিত প্রবন্ধ পাঠ করেন 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘে'র প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি জনাব মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব। প্রবন্ধটি উপস্থিত সুধী মন্ডলী কর্তৃক উচ্চ প্রশংসিত হয় এবং বিভিন্ন ভাষায় অনুবাদ করে ব্যাপকহারে বিলি করার প্রস্তাব করা হয়। বলাবাহুল্য, সম্মেলন ও সেমিনারে ব্যাপকহারে যুব ও সুধী সমাবেশ এবং পরিশেষে ঢাকার রাজপথে ট্রাক মিছিলের গগণবিদারী শ্লোগান ধ্বনি ও বায়তুল মুকাররম জাতীয় মসজিদে সম্মিলিত 'আমীন'-এর আওয়ায রাজধানীর বুকে আহলেহাদীছ আন্দোলনকে যেন নতুন প্রাণ দান করেছিল। 'আহলেহাদীছ যুবসংঘ' প্রতিষ্ঠার মাত্র দু'বছরের মধ্যে এ ছিল এক বিরাট সাফল্য।

ডঃ মুহাম্মাদ আবদুল বারী ছাহেবের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সেমিনারে প্রধান অতিথি ছিলেন তৎকালীন মাননীয় যুব উন্নয়ন মন্ত্রী খোন্দকার আবদুল হামীদ। তবে শেষ মহূর্তে তিনি অনিবার্য কারণে উপস্থিত হ'তে পারেননি। বিশেষ অতিথি ছিলেন বাংলাদেশে প্রথম সঊদী রাষ্ট্রদূত ফুয়াদ আবদুল হামীদ আল-খত্বীব ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসর এমিরেটাস ডঃ মুহাম্মাদ সিরাজুল হক। অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসর ডঃ আফতাব আহমাদ রহমানী, ডঃ মুহাম্মাদ মুজীবুর রহমান, মাওলানা মুস্তাছির, আহমাদ রহমানী, মাওলানা আবদুল্লাহ ইবনে ফযল, মাওলানা আবু তাহের বর্ধমানী, মাওলানা হাবীবুল্লাহ খান রহমানী, সায়েন্স ল্যাবরেটরীর সিনিয়র বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা ডঃ মুহাম্মাদ আবদুর রহমান, ডঃ শাহ আবদুল মজীদ, এডভোকেট আয়েনুদ্দীন ও দেশের অন্যান্য খ্যাতিমান ওলামায়ে কেরাম ও সুধীমণ্ডলী।

তাবলীগী ইজতেমা '৯১

১৯৯১ সালের ২৫ ও ২৬শে এপ্রিল রোজ বৃহস্পতি ও শুক্রবার দীর্ঘ বিরতির পর রাজশাহী মহানগরীর আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী নওদাপাড়ার দক্ষিণ পার্শ্বের খোলা ময়দানের বৃহৎ প্যাণ্ডেলে 'বালাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘে'র ২য় জাতীয় সম্মেলন ও তাবলীগী ইজতেমা অনুষ্ঠিত হয় বর্তমানে উক্ত স্থানের উপর দিয়ে রাজশাহী মহানগরী বাইপাস বড়ক ও বি,আর,টি,এ ভবণ নির্মিত হয়েছে। উক্ত সম্মেলনে দেশের বিভিন্ন প্রান্ত হ'তে আহলেহাদীছ যুবসংঘের সদস্য, উপদেষ্টা ও সুধীবৃন্দ ছাড়াও বহু শুভানুধ্যায়ী যোগদান করেন। এমনকি সাতক্ষীরা, খুলনা ও পাবনা যেলা হ'তে 'আহলেহাদীছ মহিলা সংস্থা'র বহু সদস্যা ও দায়িত্বশীল মা-বোন অংশগ্রহণ করেন। কেন্দ্রীয় উপদেষ্টা ও সুধী পরিষদের মাননীয় নায়েবে আমীর

ও আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, নওদাপাড়ার অধ্যক্ষ শায়খ আবদুছ ছামাদ সালাফীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সম্মেলনে উদ্বোধনী ভাষণ পেশ করেন 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘে'র প্রতিষ্ঠাতা ও কেন্দ্রীয় উপদেষ্টা ও সুধী পরিষদের মাননীয় আমীর রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের তৎকালীন সহকারী অধ্যাপক জনাব **মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব**। দু'দিন ব্যাপী তাবলীগী ইজতেমায় দেশের বরেণ্য ওলামায়ে কেরাম ভাষণ প্রদান করেন। ইজতেমাকে স্বাগত জানিয়ে এবং উপস্থিত হ'তে না পেরে দুঃখ প্রকাশ করে দিল্লী, কলিকাতা, নেপাল ও কুয়েতের মেহমানগণ চিঠি পাঠান, যা ইজতেমায় পড়ে শুনানো হয়।

অতঃপর ২৬শে এপ্রিল শুক্রবার বাদ আছর নওদাপাড়া হ'তে রাজশাহী যেলা প্রশাসকের বাসভবন অভিমুখে ঐতিহাসিক গণমিছিল অনুষ্ঠিত হয়। পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের ভিত্তিতে দেশের আইন ও শাসন ব্যবস্থা ঢেলে সাজানোর দাবীতে আহলেহাদীছের এ ধরনের অভূতপূর্ব গণমিছিল শুধু রাজশাহী নয়, বরং দেশের ইতিহাসে এই প্রথম। নওদাপাড়া হ'তে রাজশাহী যেলা প্রশাসক-এর বাসভবন পর্যন্ত প্রায় সাত কিলোমিটার রাস্তা 'কুরআন-হাদীছ ছাড়া অন্যকিছু, মানিনা মানব না' মুক্তির একই পথ, দাওয়াত ও জিহাদ' প্রভৃতি শ্লোগানে মুখরিত ছিল। বিভিন্ন যেলা হ'তে আগত কর্মীদের হাতে বিভিন্ন দাবী সম্বলিত ব্যানার শোভা পাচ্ছিল। মিছিল শেষে যুবসংঘের কেন্দ্রীয় সভাপতি মুহাম্মাদ আবদুর রশীদ ও সহ-সভাপতি শেখ মুহাম্মাদ রফীকুল ইসলাম মাননীয় যেলা প্রশাসকের নিকট স্মারকলিপি পৌঁছে দেন। অতঃপর ফেরার পথে পুরো মিছিল সেদিন মহানগরীর পদ্মা পাড়ের ঐতিহাসিক মাদরাসা ময়দানে মাগরিবের ছালাত আদায় করে। ছালাত শেষে মাননীয় আমীর ছাহেব কর্মীদের উদ্দেশ্যে সংক্ষিপ্ত ভাষণ দেন। এর আগে সাহেববাজার অতিক্রম করার সময় তিনি ট্রাফিক আইল্যাণ্ডের উপর দাঁড়িয়ে উপস্থিত কর্মী ও জনগণের উদ্দেশ্যে ভাষণ দান করেন।

তাবলীগী ইজতেমা '৯২

১২ ও ১৩ই ফেব্রুয়ারী '৯২ রোজ বৃহস্পতি ও শুক্রবার 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘে'র ৩য় বার্ষিক জাতীয় সম্মেলন ও তাবলীগী ইজতেমা রাজশাহীর আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী নওদাপাড়া প্রাঙ্গণে অনুষ্ঠিত হয়। দেশী ওলামায়ে কেরাম ছাড়াও এবছর করাচী দারুল হাদীছ রাহমানিয়ার মুদীর পাকিস্তানের খ্যাতনামা আলেম ও বাগ্মী শায়খ আবদুল্লাহ নাছের রহমানী সম্মেলনে যোগদান করেন। 'জিহাদের ফযীলত ও গুরুত্বে'র উপরে তাঁর ঈমানবর্ধক ভাষণ যুবসংঘের কেন্দ্রীয় কাউন্সিল সদস্য, কর্মী ও সুধীবৃন্দের মধ্যে ব্যাপক আলোড়ন সৃষ্টি করে। তিনি নিজেও এতদূর উৎসাহ বোধ করেন যে, এক পর্যায়ে তিনি বলেন যে, 'আপনারা আমাকে দাওয়াত না দিলেও আগামী বছর পুনরায় আমি আসব ইনশাআল্লাহ'। উল্লেখ্য, ইজতেমায় বক্তব্য রাখার শুরুতে সংগঠনের কেন্দ্রীয় উপদেষ্টা ও সুধী পরিষদের মুহতারাম আমীর মাননীয় মেহমানকে জিহাদের ব্যাজ পরিয়ে দেন ও তরবারি উপহার দেন।

ইজতেমা '৯২-এর অন্যতম সেরা আকর্ষণ ছিল 'জিহাদ গ্যালারী'। ষ্টীলের আধারে কাঁচ বাঁধানো এই সুদৃশ্য গ্যালারীর মধ্যে স্থান পেয়েছে গাইবান্ধা সদরের খোলাহাটি গ্রামের গাযী শেখ এফাযুদ্দীন হক্কানী (১৩৩)-এর জিহাদী স্মৃতি লাল কাপড়ের জিহাদী ব্যাজ ও কাঠের খাপ সহ তরবারি। যার গায়ে সাদা সূতা দিয়ে আরবীতে লেখা আছে 'লা ইলা-হা ইল্লাল্লা-হ, আনা মুজাহিদুন ফী সাবীলিল্লাহ'। সাথে বাংলা অনুবাদ দেওয়া আছে- 'আল্লাহ ছাড়া কোন উপাস্য নেই, আমি আল্লাহ্র রাস্তার মুজাহিদ'। তাঁর ব্যবহৃত তরবারিটির দৈর্ঘ্য সাড়ে ৩৮ ইঞ্চি। মুজাহিদের পুত্র শেখ মূসা হক্কানী ও অন্যান্য উত্তরাধিকারীগণ উক্ত জিহাদী ব্যাজ ও তরবারি 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘে'র প্রতিষ্ঠাতা ও কেন্দ্রীয় উপদেষ্টা ও সুধী পরিষদের আমীর **ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব**কে উপহার হিসাবে প্রদান করেন।

জিহাদ গ্যালারীর ২য় আকর্ষণটি ছিল- একটি জীর্ণ পুঁথি। যা একই যেলার সাঘাটা উপযেলাধীন ঝাড়াবর্ষা গ্রামের সমীরুদ্দীন, যমীরুদ্দীন ও জামা'আতুল্লাহ নামক তিন সহোদর শহীদ ভাইয়ের স্মরণে তাঁদের ভাতিজা আবদুল বারী কাযী স্বহস্তে তৈরী কালি দিয়ে পুঁথি আকারে প্রায় ১০০ পৃষ্ঠার শোকগাঁথা হিসাবে রচনা করেন। আহলেহাদীছ আন্দোলনের উপরে ডক্টরেট থিসিস করার জন্য গবেষণারত মুহতারাম আমীরে জামা'আত যুবসংঘের তৎকালীন কেন্দ্রীয় সভাপতি মুহাম্মাদ আব্দুর রশীদকে সাথে নিয়ে গাইবান্ধার গ্রামাঞ্চল ভ্রমনের এক পর্যায়ে ১৩-১০-৮৯ ইং তারিখে ঝাড়াবর্ষা গ্রামে গেলে উক্ত শোকগাঁথা লেখকের পুত্র মুহাম্মাদ আফসারুদ্দীন কাযী ও অন্যান্য উত্তরাধিকারীগণ মাননীয় আমীর ছাহেবকে সানন্দে উপহার দেন। উল্লেখ্য যে, উক্ত তিন শহীদ ভাই তাদের জীবদ্দশায় তাঁদের ৮০ বিঘা সম্পত্তির মধ্যে ৪২ বিঘা জমি ক্রমান্বয়ে বিক্রি করে জিহাদ ফাণ্ডে দান করেন এবং অবশেষে জীবনের শেষ রক্তবিন্দু দিয়ে ইসলামের ঝাণ্ডাকে উড্ডীন রাখার জন্যে শাহাদাতের অমিয় সুধা পান করে চির অমরত্ব লাভ করেন। আল্লাহ আমাদেরকেও তাদের কাতারে শামিল হওয়ার তাওফীক দিন- আমীন!

৩য় আকর্ষণ ছিল- একটি তামার বদনা। যার ওযন ১ কেজি ২০০ গ্রাম। উচ্চতা সাড়ে ৬ ইঞ্চি ও ব্যাস ২৪ ইঞ্চি। এই বদনার মালিক ছিলেন সাতক্ষীরার গাযী মাখদূম হুসাইন ওরফে মার্জ্জুম হোসেন। সাং ভালুকা চাঁদপুর, সাতক্ষীরা। মার্জ্জুম হোসেনের প্রপৌত্রী সাতক্ষীরা যেলার কলারোয়া থানাধীন আইচপাড়া গ্রামের মৃত ছানাউল্লাহ সরদারের স্ত্রী হাফীযা খাতুন (৭৫)-এর নিকট হ'তে গবেষক মুহতারাম আমীরে জামা'আত ২৩-১২-৮৯ ইং তারিখে এটি সংগ্রহ করেন।

সাতক্ষীরার এই স্বনামধন্য গাযী মার্জ্জুম হোসেনের অন্যতম প্রপৌত্র জনাব আবুল হুসাইন এর বর্ণনা মতে জিহাদ আন্দোলনে যোগদানকারী মাখদূম হুসাইন বৃটিশ সরকার কর্তৃক ব্যাপক ওয়াহ্হাবী ধরপাকড়ের সময় আহলেহাদীছ তরীকায় জুম'আর ছালাত আদায় করতে দেখে বর্তমান পাকিস্তানের শিয়ালকোটের এক জামে মসজিদে পুলিশের হাতে ধৃত হন। পরে ইংরেজের বিচারে তাঁকে ফাঁসির আদেশ দেওয়া হয়। কিন্তু তিন তিনবার ফাঁসির দড়ি অলৌকিকভাবে ছিঁড়ে যাওয়ায় ভীত হয়ে তাঁকে খালাস দেওয়া হয়। শেষ সম্বল তামার বদনাটি হাতে নিয়ে আল্লাহ্র দ্বীনের এই মুজাহিদ এক সময় সাতক্ষীরায় নিজ গ্রামে এসে উপনীত হন। পার্শ্ববর্তী গুনাকরকাটি গ্রামে তাঁর ওয়ায ও কেরামতে মুগ্ধ হয়ে উক্ত গ্রাম ও আশপাশের গ্রামসমূহের বহু লোক ইসলাম গ্রহণ করে। যারা আহলেহাদীছ হিসাবে এখনও জীবন যাপন করছেন। তবে পরবর্তীতে সাতক্ষীরা সদর থানাধীন আলীপুর গ্রামের মক্তবের শিক্ষক মৌলভী আবদুল আযীয এখানে এসে পুনরায় তাদের অনেককে বিদ'আতী ও পীর পূজারী করে তোলে। বর্তমানে সেখানে তার কবরকে ঘিরে একটি আস্তানা গড়ে উঠেছে। আস্তানার পাশেই মার্জ্জুম হোসেনের ওয়ায যে বাড়ীতে হয়েছিল, তাদের উত্তরসূরীগণ এখনও আহলেহাদীছ হিসাবেই টিকে আছেন। তাদের একটি জামে' মসজিদও রয়েছে। বর্তমানে তাওহীদ ট্রাষ্টের সৌজন্যে সেটি নতুনভাবে নির্মিত হয়েছে।

তাবলীগী ইজতেমা '৯৩

১৯৯৩ সালের ১লা ও ২রা এপ্রিল রোজ বৃহস্পতি ও শুক্রবার নওদাপাড়া মারকায সংলগ্ন ময়দানে 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘে'র ৪র্থ জাতীয় সম্মেলন ও তাবলীগী ইজতেমা অনুষ্ঠিত হয়। ইজতেমায় সভাপতিত্ব করেন 'বাংলাদেশ আহলোহদীছ যুবসংঘে'র প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি **ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব**। তেলাওয়াতে কালামের পর সভাপতির উদ্বোধনী ভাষণের মাধ্যমে সম্মেলনের মূল কার্যক্রম শুরু হয়। বিভিন্ন যেলার আন্দোলন পাগল কর্মীরা ট্রেন যোগে ও বাস রিজার্ভ করে বিপুল সমারোহে সম্মেলনে যোগদান করেন।

রাজশাহী সিটি করপোরেশনের মেয়র জনাব মিজানুর রহমান মিনু স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে সম্মেলনে যোগদান করেন। উপস্থিত জনতাকে লক্ষ্য করে তিনি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভাষণ প্রদান করেন। জনাব মেয়র বলেন, 'আমি অনেক সাংগঠনিক তৎপরতা দেখেছি তবে নিঃসন্দেহে আপনাদের এ মহান আন্দোলন নিশ্চিত সম্ভাবনাময়। ইসলামের প্রকৃত রূপ দর্শনে তাঁর হৃদয়ে নবজাগরণের সৃষ্টি হয় বলে তিনি উল্লেখ করেন।

সম্মেলনে বক্তব্য রাখেন ইঞ্জিনিয়ার শাহ মুমাম্মাদ আবদুল মতীন (বগুড়া), মাওলানা মুহাম্মাদ আবদুর রঊফ (খুলনা), অধ্যক্ষ মুহাম্মাদ আবদুছ ছামাদ (কুমিল্লা), চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বনামধন্য অধ্যাপক ডঃ মুহাম্মাদ মঈনুদ্দীন আহমাদ খাঁন, তাওহীদ ট্রাষ্ট-এর সাধারণ সম্পাদক মাওলানা মুহাম্মাদ মুসলিম, মাওলানা শামসুদ্দীন সিলেটী, মাওলানা শিহাবুদ্দীন সুন্নী (গাইবান্ধা) ও মাওলানা আবদুছ ছামাদ (সাতক্ষীরা) প্রমুখ।

দ্বিতীয় দিন ফজর পর্যন্ত ইজতেমা চলতে থাকে। উল্লেখ্য যে, এবারের ইজতেমায় পৃথক মহিলা প্যাণ্ডেলে বিভিন্ন যেলার আন্দোলন প্রিয়া মা-বোনগণ স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে যোগদান করেন। উক্ত সম্মেলনে সর্বসম্মতভাবে নিম্নলিখিত প্রস্তাব ও দাবী সমূহ বাংলাদেশ সরকার সমীপে স্মারকলিপি আকারে পেশ করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় এবং তা রাজশাহী যেলা প্রশাসকের মাধ্যমে সরকারের নিকট পেশ করা হয়।

দাবী সমূহঃ

(১) পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছ ভিত্তিক ইসলামী আইন ও শাসন চাই।

(২) কবর পূজা, পীর পূজা, ওরস ও মীলাদ প্রথা সহ বিভিন্ন প্রকারের শিরক ও বিদ'আতী প্রথাকে নিরুৎসাহিত করতে হবে এবং রেডিও, টিভি ও সরকারী প্রচার মাধ্যম সমূহে এসবের বিরুদ্ধে জোর প্রচারণা চালাতে হবে।

(৩) দেশের স্কুল, মাদরাসা, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের সিলেবাসে এবং ইসলামী ফাউণ্ডেশনে নির্দিষ্ট একটি মাযহাবের বইপত্র সিলেবাসভূক্ত ও প্রকাশ করা হচ্ছে। আমরা সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের নিকটে নিরপেক্ষভাবে কুরআন ও ছহীহ হাদীছ ভিত্তিক বিভিন্ন কিতাব সংযোজন ও প্রকাশ করার দাবী জানাচ্ছি।

(৪) ধূমপান, মাদক সেবন, যৌতুক প্রথা, নারী নির্যাতন প্রভৃতির বিরুদ্ধে সরকারী আইন কঠোরভাবে প্রয়োগের সাথে সাথে ব্যাপক গণজাগরণ ও গণপ্রতিরোধের ব্যবস্থা নিতে হবে। এ জন্য আহলেহাদীছ যুবসংঘের ন্যায় বিভিন্ন

কল্যাণমুখী যুব প্রতিষ্ঠান গুলিকে সরকারীভাবে পৃষ্ঠপোষকতা প্রদান করতে হবে।

(৫) বাংলাদেশের কওমী মাদরাসাগুলিকে সরকারী আনুকূল্য প্রদান করতে হবে।

(৬) যুব চরিত্র বিধ্বংসী অশ্লীল পত্র-পত্রিকা, চলচ্চিত্র ও সাহিত্য প্রচার কঠোরভাবে দমন করতে হবে।

তাবলীগী ইজতেমা '৯৪

২৪ ও ২৫শে মার্চ ৯৪ রোজ বৃহস্পতি ও শুক্রবার পূর্বের ন্যায় নওদাপাড়া মারকায সংলগ্ন ময়দানে ৫ম জাতীয় সম্মেলন ও তাবলীগী ইজতেমা অনুষ্ঠিত হয়। হাফেয লুৎফুর রহমানের তেলাওয়াতের পর যথারীতি মুহতারাম আমীরে জামা'আতের উদ্বোধনী ভাষণের মাধ্যমে ইজতেমার কার্যক্রম শুরু হয়। উদ্বোধনী ভাষণে মুহতারাম আমীরে জামা'আত **ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব** বলেন, 'আল্লাহ্র নিরংকুশ তাওহীদ ও প্রিয়নবী (ছাঃ)-এর খালেছ ইত্তেবা প্রতিষ্ঠাই আহলেহাদীছ আন্দোলনের মূল দাবী। তিনি বলেন, ব্যক্তি ও সমাজ জীবনে এককথায় তথা মুসলিম জীবনের সকল দিক ও বিভাগে রাসূল (ছাঃ)-এর আনুগত্যের বিকল্প নেই। এ চরম সত্যকে বাস্তবে রূপ দেওয়া আহলেহাদীছ আন্দোলনের প্রধান লক্ষ্য। তিনি বলেন, প্রত্যেকের জেনে রাখা উচিত যে, শিরক ও বিদ'আত যুক্ত ইবাদত আল্লাহ্র নিকট গ্রহণযোগ্য হবে না। তাই এ ব্যাপারে জনসাধারণকে সতর্ক করে দেওয়া ছাড়া আমাদের আর কোন উদ্দেশ্য নেই।

সম্মেলনে বিদেশী মেহমানদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন পাকিস্তানের খ্যাতনামা বিদ্বান সিন্দু জমঈয়তে আহলেহাদীছ এর সভাপতি আল্লামা বদিউদ্দীন শাহ রাশেদী, আল্লামা আবদুল্লাহ নাছের রহমানী, ইরাকের ডাঃ আবু খুবায়েব ও সূদানের শায়খ আমীন আবদুল্লাহ প্রমুখ ওলামায়ে কেরাম। ইত্তেবায়ে সুন্নাতের অপরিহার্যতার উপর আল্লামা বদিউদ্দীন শাহ রাশেদীর তথ্যবহুল আলোচনা বিদ্বান মহলে চমক সৃষ্টি করে। জিহাদের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তার উপর অত্যন্ত আকর্ষণীয় এবং জিহাদী জাযবা পূর্ণ ভাষণ প্রদান করেন শায়খ আবদুল্লাহ নাছের রহমানী ও হাফেয সাঈদ।

বাংলাদেশী আলেমদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন শায়খ আবদুছ ছামাদ সালাফী (সঊদী মাব'ঊছ), অধ্যক্ষ আবদুছ ছামাদ (কুমিল্লা), মাওলানা ছফিউল্লাহ (কুমিল্লা),মাওলানা শামসুদ্দীন (সিলেট), মাওলানা মুহাম্মাদ মুসলিম (ঢাকা), মাওলানা আবদুস সাত্তার ত্রিশালী (ময়মনসিংহ), মাওলানা শিহাবুদ্দীন সুন্নী (গাইবান্ধা), শায়খ আবদুর রশীদ (গাইবান্ধা), মাওলানা আবদুর রউফ (খুলনা), মাওলানা আবদুছ ছামাদ (সাতক্ষীরা), অধ্যাপক আলমগীর হোসাইন (সিরাজগঞ্জ), অধ্যাপক শুজাউল করীম (বগুড়া), মাওলানা মুহাম্মাদ মকবুল হোসাইন (জামালপুর), মাওলানা মুহাম্মাদ আবদুস সাত্তার (নওগাঁ) প্রমুখ।

দেশের বিভিন্ন যেলা হ'তে বাসে-ট্রেনে চড়ে অসংখ্য আন্দোলন পাগল ভাই উক্ত ইজতিমায় অংশগ্রহণ করেন। ইজতেমায় অংশগ্রহণকারী প্রতিটি সাংগঠনিক যেলার রিজার্ভ বাসে 'জাতীয় সম্মেলন ও তাবলীগী ইজতেমা '৯৪ সফল হউক', মুক্তির একই পথ দাওয়াত ও জিহাদ' ইত্যাদি শ্লোগানে সজ্জিত ব্যানার শোভা পায়। এ ছাড়া বিভিন্ন যেলা হ'তে আহলেহাদীছ মহিলা সংস্থার শত শত মহিলাও ইজতেমায় অংশগ্রহণ করেন।

তাবলীগী ইজতেমা '৯৫

প্রতিবারের ন্যায় ১৯৯৫ সালের ২৫ ও ২৬শে মার্চ রোজ শনিবার ও রবিবার নওদাপাড়া মাদ্রাসা সংলগ্ন ময়দানে অনুষ্ঠিত হয় বার্ষিক তাবলীগী ইজতেমা ও জাতীয় সম্মেলন। উক্ত সম্মেলনে দেশ বরেন্য আহলেহাদীছ উলামায়ে কেরাম পবিত্র কুরআন ও ছহীহ সুন্নাহ্র আলোকে বিভিন্ন বিষয়ে জ্ঞানগর্ভ আলোচনা পেশ করেন। 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর মুহতারাম আমীর **ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব** -এর সভাপতিত্বে উক্ত সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। কুরআন তেলাওয়াত অতঃপর মুহতারাম আমীরে জামা'আতের উদ্বোধনী ভাষণের মধ্য দিয়ে তাবলীগী ইজতেমার শুভ সূচনা হয়।

সম্মেলনে বিষয় ভিত্তিক বক্তব্য পেশ করেন অধ্যক্ষ আবদুছ ছামাদ (কুমিল্লা) বিষয়ঃ মুসলিম ঐক্যের মানদণ্ড বা শর্তাবলী; মাওলানা মুহাম্মাদ মুসলিম (ঢাকা)-শিরক; মাওলানা মুহাম্মাদ শামসুদ্দীন (সিলেট)-অহি-র বিধান বাস্তবায়নই মুক্তির একমাত্র পথ; শাহ মুহাম্মাদ আবদুল মতীন (বগুড়া)-প্রচলিত গণতন্ত্র ও ইসলাম; অধ্যাপক মুহাম্মাদ শুজাউল করীম (বগুড়া)-তাযকিয়ায়ে নাফস; আবদুর রশীদ (গাইবান্ধা)-আহলেহাদীছদের আক্বীদা; মাওলানা শিহাবুদ্দীন সুন্নী (গাইবান্ধা)-তাক্বওয়া ও তাওয়াক্কুল; মাওলানা আবদুস সাত্তার ত্রিশালী (ময়মনসিংহ) ইত্তেবায়ে সুন্নাত; অধ্যাপক আলমগীর হুসাইন (সিরাজগঞ্জ)-দাওয়াতের গুরুত্ব ও হিকমত; মাওলানা মুহাম্মাদ ছফিউল্লাহ (কুমিল্লা)-ইসলামী আন্দোলনের কর্মীদের আবশ্যিক গুণাবলী; মাওলানা জাহাঙ্গীর আলম (সাতক্ষীরা)-দুনিয়া আখেরাতের কর্ষন ক্ষেত্র; মাওলানা মুহাম্মাদ আব্দুর রউফ (খুলনা)- ইসলামে জামা'আতী জীবনের অপরিহার্যতা; মাওলানা আব্দুল্লাহ সালাফী (ভারত)- পর্দা ও যৌতুক প্রথা; মাওলানা মুহাম্মাদ আব্দুছ ছামাদ (সাতক্ষীরা)- আহলেহাদীছ আন্দোলনঃ মনীষীদের দৃষ্টিতে; মাওলানা আব্দুল খালেক সালাফী

(নওগাঁ)- ছালাতের নৈতিক ও সামাজিক গুরুত্ব; মাওলানা আব্দুর রাযযাক (গোদাগাড়ী)- বিদ'আত; মাওলানা আব্দুর রাযযাক (নওদাপাড়া মাদরাসা)-ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনে আহলেহাদীছদের অবদান; ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব (আমীরে জামা'আত)- (ক) আহলেহাদীছ কি ও কেন? (খ) প্রচলিত ইসলামী আন্দোলন ও আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ; শায়খ আব্দুছ ছামাদ সালাফী (সিনিয়র নায়েবে আমীর)-তাওহীদঃ ইসলামের বিশ্বজয়ী শক্তি; অধ্যাপক মুহাম্মাদ রেযাউল করীম (বগুড়া)- আমাদের সাংগঠনিক ক্রিয়া ও চূড়ান্ত লক্ষ্য; মুহাম্মাদ হারূণ (সিলেট) প্রচলিত যুব/ছাত্র আন্দোলন বনাম আহলেহাদীছ যুবসংঘ; শেখ মুহাম্মাদ রফীকুল ইসলাম (সাতক্ষীরা)- প্রচলিত রাজনীতি বনাম ইসলামী রাজনীতি; মাওলানা আব্দুস সোবহান (বগুড়া)- নেতৃত্বের গুণাবলী; মুহাম্মাদ সিরাজুল ইসলাম (যশোর)-বাৎসরিক দাওয়াত ও তাবলীগের পরিকল্পনা ও নির্দেশনা প্রমুখ ওলামায়ে কেরাম।

তাবলীগী ইজতেমা '৯৬

৭ ও ৮ই মার্চ ১৯৯৬ রোজ বৃহস্পতি ও শুক্রবার তাবলীগী ইজতেমা '৯৬ রাজশাহীর নওদাপাড়াস্থ মারকায় সংলগ্ন ময়দানে অনুষ্ঠিত হয়। 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর মুহতারাম আমীরে জামা'আত **ডঃ মাওলানা মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব** -এর সভাপতিত্বে বিপুল উৎসাহ ও উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে ইজতেমা শুরু ও শেষ হয়। কিন্তু রাজনৈতিক অস্থিরতার কারণে শেষের দিন জুম'আর ছালাতের পূর্বেই সমাপ্তি ঘোষণা করতে হয়। ইজতেমায় দেশী ওলামায়ে কেরাম ছাড়াও বিদেশী আলেমগণ উপস্থিত ছিলেন।

মুহতারাম আমীরে জামা'আতের উদ্বোধনী ভাষণের পরে ইজতেমায় উপস্থিত ওলামায়ে কেরামের মধ্যে ভাষণ দান করেন গাইবান্ধার মাওলানা শিহাবুদ্দীন সুন্নী, কুমিল্লার মাওলানা ছফিউল্লাহ, সাতক্ষীরার মাওলানা আব্দুছ ছামাদ, ঢাকার মাওলানা মুহাম্মাদ মুসলিম, চাঁপাইনবাবগঞ্জের মাওলানা মুহাম্মাদ আব্দুর রাযযাক, খুলনার মাওলানা মুহাম্মাদ জাহাঙ্গীর আলম ও সিরাজগঞ্জের অধ্যাপক আলমগীর হোসাইন প্রমুখ। বিদেশী মেহমানদের মধ্যে বিশেষভাবে আলোচনা করেন শায়খ আব্দুল্লাহ সালাফী (ভারত) ও সামির আল-হিমছী (সিরিয়া)।

আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ-এর বার্ষিক এই কেন্দ্রীয় তাবলীগী ইজতেমায় উপস্থিত লক্ষ জনতা কর্তৃক সমর্থিত নিম্নোক্ত প্রস্তাব সমূহ বিবেচনার জন্য দেশের সরকার, নির্বাচন কমিশন, রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ ও সাধারণ জনগণের নিকটে পেশ করা হয়।

প্রস্তাবনা সমূহঃ

১. আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ-এর কেন্দ্রীয় মসলিসে শূরা এই মর্মে সুচিন্তিত অভিমত ব্যক্ত করছে যে, বর্তমানে বাংলাদেশের সার্বিক সামাজিক অশান্তির জন্য প্রধানতঃ তিনটি বিষয় দায়ী। (ক) ধর্মহীন বস্তুবাদী শিক্ষা ব্যবস্থা। (খ) সূদ ভিত্তিক পুঁজিবাদী অর্থ ব্যবস্থা এবং (গ) দল ও প্রার্থী ভিত্তিক প্রচলিত নির্বাচন ব্যবস্থা। এই অবস্থা নিরসনের জন্য আমরা নিম্নোক্ত দাবী ও প্রস্তাবনা সমূহ বিবেচনার জন্য দেশের সরকার ও জনগণের নিকট পেশ করছি।-

(ক) সর্বত্র দল ও প্রার্থীবিহীন নেতৃত্ব নির্বাচন ব্যবস্থা চালু করা। নির্দিষ্ট মেয়াদ শেষে জাতীয় নির্বাচনের তারিখ ঘোষণা করা এবং তার জন্য জনগণকে স্বাধীনভাবে প্রার্থী শূন্য ব্যালট-এর মাধ্যমে তাদের পসন্দমত যোগ্য ব্যক্তিকে জাতীয় সংসদ-এর প্রতিনিধি নির্বাচনের অবাধ সুযোগ প্রদান করা। মনোনয়ন পত্র জমা দেওয়া ও প্রত্যাহার করার প্রচলিত প্রথা, ভোট প্রার্থীকে ভোটের জন্য প্রচারণা চালানো, দলীয় এবং অন্যান্য চাপ সৃষ্টি করা ইত্যাদি অনৈসলামী পদ্ধতি বাতিল ঘোষণা করা। সাথে সাথে নির্বাচক ও নির্বাচিতদের জন্য নির্দিষ্ট গুণাবলী নির্ধারণ করা যাতে কোন দোষযুক্ত ব্যক্তি নিজে ভোটার হ'তে না পারে বা জাতীয় পর্যায়ে কোনরূপ নেতৃত্ব দেওয়ার সুযোগ না পায়।

(খ) জনগণ বা সংসদ নয় বরং আল্লাহ্কে সার্বভৌম ক্ষমতার মালিক হিসাবে ঘোষণা করা এবং তাঁর প্রেরিত সর্বশেষ অহি পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছকে সকল বিষয়ে চূড়ান্ত সমাধান হিসাবে গ্রহণ করা।

(গ) বৈষয়িক ও কারিগরী শিক্ষার সাথে সাথে শিক্ষার সকল স্তরে প্রত্যেক নাগরিকের জন্য ধর্মীয় শিক্ষা বাধ্যতামুলক করা।

(ঘ) ইসলামী অর্থ ও বিচার ব্যবস্থা কঠোরভাবে বাস্তবায়ন করা।

তাবলীগী ইজতেমা'৯৭

বিগত ২৭ ও ২৮শে ফেব্রুয়ারী '৯৭ রোজ বৃহস্পতি ও শুক্রবার নওদাপাড়া মাদরাসার উত্তর পার্শ্বের খোলা ময়দানে বাদ আছর মুহতারাম আমীরে জামা'আত **ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব** -এর উদ্বোধনী ভাষণের মধ্য দিয়ে তাবলীগী ইজতেমা '৯৭ -এর মূল কার্যক্রম শুরু হয়। উদ্বোধনী ভাষণে তিনি বলেন, আহলেহাদীছ আন্দোলনের একটি অন্তর্নিহিত দাওয়াত আছে, যে দাওয়াতের অবচেতন জিজ্ঞাসা সকলেই বুঝতে পারেনা।

একটি গভীর স্রোতস্বিনীর নীচ দিয়ে যেমন স্রোতের একটা গতি থাকে, যা উপর থেকে বুঝা যায় না, উত্তাল সাগরে যেমন জোয়ার ভাটা টের পাওয়া খুব মুশকিল হয়, ঠিক তেমনিকরে আহলেহাদীছ আন্দোলনের আবেদন জনগণের অন্তরের গভীরতম প্রদেশে এমনই সুনিশ্চিত ভাবে গ্রথিত এবং প্রোথিত যা বাহির থেকে বুঝা খুবই মুশকিল। সম্মেলনে দরসে কুরআন পেশ করেন 'আহলেহাদীছ আন্দোলন' -এর সিনিয়র নায়েবে আমীর শায়খ আবদুছ ছামাদ সালাফী।

অতঃপর পূর্ব নির্ধারিত বিষয়বস্তু সমূহের উপরে সারগর্ভ বক্তব্য সমূহ পেশ করেন জনাব মাওলানা মুহাম্মাদ মুসলিম (ঢাকা), অধ্যক্ষ মুহাম্মাদ আব্দুছ ছামাদ (কুমিল্লা), মাওলানা জাহাঙ্গীর আলম (বাগেরহাট), মাওলানা মুহাম্মাদ শিহাবুদ্দীন সুন্নী (গাইবান্ধা), অধ্যাপক মুহাম্মাদ আলমগীর হুসাইন (সিরাজগঞ্জ), মাওলানা মুহাম্মাদ আব্দুছ ছামাদ (সাতক্ষীরা), আব্দুর রহীম (বাগেরহাট), আব্দুস সাত্তার (নওগা), আব্দুস সাত্তার ত্রিশালী (ময়মনসিংহ), আব্দুর রশীদ (গাইবান্ধা), মাওলানা ছফিউল্লাহ (কুমিল্লা), আব্দুর রাযযাক (চাঁপাই নবাবগঞ্জ), ইঞ্জিনিয়ার আব্দুল মতীন (বগুড়া) প্রমুখ ওলামায়ে কেরাম বক্তব্য পেশ করেন।

বিদেশী মেহমানদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন শায়খ আবদুল ওয়াহ্হাব খিলজী (ভারত), আবু আবদুর রহমান (লিবিয়া), আবদুল্লাহ মাদানী (নেপাল), আবদুল মন'ইম (সঊদী আরব), আবদুল মতীন সালাফী (ভারত) ও আবদুল্লাহ সালাফী (ভারত) প্রমুখ।

আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ-এর উদ্যোগে আয়োজিত জাতীয় সম্মেলন ও তাবলীগী ইজতেমা '৯৭-য়ে প্রদত্ত বক্তৃতা সমূহের সার সংক্ষিপ্ত প্রতিবেদনঃ

মুহতারাম আমীরে জামা'আত
(উদ্বোধনী ভাষণ)

'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর উদ্যোগে আয়োজিত ২ দিন ব্যাপী 'তাবলীগী ইজতেমা '৯৭ উদ্বোধন কালে মুহতারাম আমীরে জামা'আত ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব বলেন, আহলেহাদীছ আন্দোলনের একটি অন্তর্নিহিত দাওয়াত আছে, যে দাওয়াতের অবচেতন জিজ্ঞাসা সকলেই বুঝতে পারেনা। একটি গভীরতম স্রোতস্মিনীর যেমন নীচ দিয়ে স্রোতের একটা গতি থাকে, যা উপর থেকে বুঝা যায় না, উত্তাল সাগরে যেমন জোয়ার-ভাটা টের পাওয়া খুব মুশকিল হয়, ঠিক তেমনি করে আহলেহাদীছ আন্দোলনের আবেদন জনগণের অন্তরের গভীরতম প্রদেশে এমনই সুনিশ্চিতভাবে গ্রথিত এবং প্রোথিত যা বাহির থেকে বুঝা খুবই মুশকিল।

আর সেই অবচেতন হৃদয়তন্ত্রীতে যখনই মানুষ ধাক্কা পায় তখনই তার বাহিরের সমস্ত লোভ-লালসাকে দূরীভূত করে দুনিয়ার সমস্ত আকর্ষণকে দূর করে দিয়ে পাগলের মত সে ছুটে আসে। কারণ প্রতিটি মানুষের অবচেতন মনে সৃষ্টিকর্তার প্রতি একটি দারুণ আগ্রহ আছে যেটাকে দূর করার কোন ক্ষমতা পৃথিবীর কোন শক্তির নেই। আর সেখানে গিয়ে আহলেহাদীছ আন্দোলন কথা বলেছে। আহলেহাদীছ আন্দোলনের যে স্লোগান, আহলেহাদীছ আন্দোলনের যে বক্তব্য শুধু বাংলাদেশ নয়, পৃথিবীর কোন দেশেই এই বক্তব্য কোন আন্দোলন, কোন সংগঠন বা কোন দল দেয় নাই।

দুনিয়ার সমস্ত মানুষ যখন নিজের জ্ঞানকে সবার ঊর্ধ্বে বলে বিশ্বাস করে নিয়েছে, নিজের বা নিজের দলের পরামর্শ বা নিজের দলের সিদ্ধান্তকে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ মনে করছে, পৃথিবীর সমস্ত মানুষ যখন আধুনিক গণতন্ত্রের স্রোতধারায় ভেসে চলছে এবং পার্লামেন্টের অধিকাংশের রায়-এর প্রতি শ্রদ্ধাশীল হ'য়ে নিজেদের সমস্ত রায়কে জলাঞ্জলী দিতে দ্বিধাগ্রস্থ হচ্ছে না, পৃথিবীর সমস্ত মানুষ যখন প্রচলিত প্রথার পিছে ছুটছে, কি ধর্মীয় ক্ষেত্রে, কি রাজনৈতিক ক্ষেত্রে, কি অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে, কি সামাজিক নিয়ম-কানুনে, তখন আহলেহাদীছ আন্দোলন দৃপ্ত কণ্ঠে জনগণের কাছে বলে দিচ্ছে, হে পাগল পারা মানুষ! তোমরা যেদিকে ছুটে চলেছ ওদিকে মুক্তির পথ নেই। মুক্তির পথ যদি থেকেই থাকে তাহ'লে সেটা আছে তোমার নিজেরই কাছে, তোমার ঘরের তাকে পড়ে আছে যে জিনিসটি অবহেলিতভাবে, তোমার ঘরের ঐ যে শো-কেসের উপরে রক্ষিত আছে যেটা সুন্দর একটি দৃশ্যমান বস্তু হিসাবে, সেই জিনিসের মধ্যে তুমি সব কিছু খুঁজে পাবে।

ভারতের এক কালের স্বাধীনতা আন্দোলনের অগ্নিপুরুষ বলে খ্যাত মাওলানা মুহাম্মাদ আলী যখন ভারতের পক্ষ থেকে বৃটিশ গভর্ণমেন্টের সঙ্গে আলোচনার জন্য গিয়েছিলেন তখন তিনি সেখানে গোল টেবিল বৈঠকের ফাঁকে কোন এক সন্ধ্যায় লণ্ডনের একটি লাইব্রেরীতে গিয়েছিলেন। লাইব্রেরীতে ঢুকে হঠাৎ করে তাঁর নযর পড়ল সমস্ত তাকের উপরের তাকে এক খানা বই সংরক্ষিত আছে, যার আশেপাশে আর কোন বই নাই।

তাঁর নযর কেড়ে নিল এ দৃশ্যটি। তিনি লাইব্রেরীয়ানকে লক্ষ্য করে বলেছিলেন, হে লাইব্রেরীয়ান ভাই! আপনার এখানে বই পড়ার জন্য এসেছি। হাযার হাযার বইয়ের বিরাট সংগ্রহ এখানে দেখছি। কিন্তু আমি ঐ এক খানা বই চাই, যে বইটির স্থান আপনি সবার উপরে দিয়েছেন।

লাইব্রেরীয়ান জিজ্ঞেস করলেন, ভাই ওটা কোথায়? তিনি বললেন, ঐ দেখেন সবার উপরে, ঐ সারিতে আর কোন বই নেই। ঐ বইটা কি? সুন্দর মখমলের কাপড়ে মোড়ানো এত যত্ন করে উপরে রেখে দেওয়া হয়েছে। ঐ সুরক্ষিত বই খানাই আমাকে দিতে হবে। আমি ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের নেতা মুহাম্মাদ আলী, আপনার লাইব্রেরীতে পড়ার জন্য এসেছি। তাঁর পরিচিতি স্পষ্ট হওয়ার পরে অবশেষে বাধ্য হ'লেন লাইব্রেরীয়ান, ঐ বই খানা পড়ার জন্য দিতে। বাধ্য হয়ে লাইব্রেরীয়ান অত্যন্ত সম্মানের সঙ্গে, শ্রদ্ধার সঙ্গে, অত্যন্ত বিনীতভাবে কিতাব খানা হাতে নিয়ে সশ্রদ্ধ চিত্তে যখন মুহাম্মাদ আলীর হাতে দিচ্ছেন, তখন মুহাম্মাদ আলী আশ্চর্য হয়ে বলেন, সত্যি এটাতো তাঁর ঘরেরই কিতাব। আর কিছুই নয় আল-কুরআনুল হাকীম।

তিনি বললেন, ভাই আপনিতো খৃষ্টান। সে বলল, হ্যাঁ। আপনি খৃষ্টান হয়ে মুসলমানদের ধর্মগ্রন্থকে সবার উপরে স্থান দিয়েছেন নিজের ইঞ্জিল গ্রন্থকে স্থান না দিয়ে, এর কারণ কি? লাইব্রেরীয়ান সেদিন ছোট্ট কথায় জওয়াব দিয়েছিল, যে কথাটি আজো আমাদের মত অসংখ্য মানুষের মুখ দিয়ে বের হচ্ছে বিভিন্ন সভা সম্মেলনে, সেমিনারে। তিনি বলেছিলেন, Oh Mohammad Ali! this is the fountain head of all sciences.

অর্থাৎ 'যে কুরআন আপনাকে দেখালাম এই কুরআন হ'ল সমস্ত বিজ্ঞানের উৎসাধারা'। এই লাইব্রেরীর হাযার হাযার কিতাব তৈরী হয়েছে এ কুরআনকে গবেষণা করেই। অতএব তার স্থানতো সবার উপরে হবেই (সুবহা-নাল্লাহ)!

ইসলামের যারা শত্রু তারাও ইসলামকে শ্রদ্ধা করে, কুরআনের যারা শত্রু তারাও কুরআনকে সবার উপরে রাখে। দুর্ভাগ্য, আমরা যারা কুরআনের অনুসারী, কুরআন ও হাদীছের ধারক ও বাহক বলে দাবী করি। আমরা কুরআন-হাদীছকে যথার্থ মর্যাদা দিতে পারিনি। আমরা সেখানে গিয়েও দলাদলি করেছি, অসংখ্য মাযহাব ও তরীকায় বিভক্ত হয়েছি। রাজনীতি করতে গিয়েও ভাইয়ের বুকে চাকু মেরেছি। অর্থনীতি করতে গিয়েও নিজের ভাই গরীব, শোষিত, বঞ্চিত, নির্যাতিত, সর্বহারা হওয়া সত্ত্বেও তার দিকে কখনও একটু মহববতের দৃষ্টিতে তাকিয়ে দেখিনি। দুর্ভাগ্য আমাদের রাজনীতির' আমাদের অর্থনীতির ও আমাদের ধর্মীয় সমাজ ব্যবস্থার। সবদিক দিয়ে আমরা আইয়ামে জাহেলিয়াতকেও ছাড়িয়ে গেছি। এমন দিন নেই যে, এ দেশের মা-বোনেরা নির্যাতিতা হচ্ছেন না। এমন একটি ঘন্টা, মিনিট বা মুহূর্তও খুঁজে পাবেন না যেখানে এদেশের মানুষ স্বাধীন গণতান্ত্রিক দেশে বাস করা সত্ত্বেও যুলুম-নির্যাতন, সন্ত্রাস-চাঁদাবাজি ও নিজের গুলির শিকার হচ্ছে না।

বর্তমানের এই আধুনিক জাহেলী সমাজ পরিবর্তনের দৃঢ় অঙ্গীকার নিয়েই 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' অগ্রযাত্রা শুরু করেছে। সরকার পরিবর্তন আমাদের কাছে মূখ্য বিষয় নয়। সমাজ পরিবর্তনই আমাদের কাছে মূখ্য বিষয়। সরকার সমাজের একটি অংশ মাত্র। তাই সমাজ পরিবর্তন হ'লে সরকার পরিবর্তন হ'তে বাধ্য।

অনেকে আধুনিক যুগের দোহাই দিয়ে ইসলামী আন্দোলনে প্রকৃত ধারা পাল্টিয়ে দিয়েছেন এবং তারা বলতে চান সরকার পরিবর্তনের মাধ্যমেই সমাজ পরিবর্তন হবে। আমরা তার উল্টো বলি যে, 'সমাজ পরিবর্তনের মাধ্যমেই সরকার পরিবর্তন হওয়া সম্ভব। যদি বাংলাদেশের এই সুন্দর সবুজ মাটি টুকুতে অধিকাংশ অধিবাসী মুসলমান না হ'তেন তাহ'লে আজকে স্বাধীন দেশ হিসাবে কস্মিনকালেও আপনারা বাংলাদেশকে পেতেন কি-না সন্দেহ।

এদেশের মানুষ আদর্শিক দিক দিয়ে তাদের বাপ-দাদার ধর্মকে পরিবর্তন করে ইসলামকে গ্রহণ করেছিল বলেই বাংলার পূর্বাংশের এই মাটিটি আজকে স্বাধীন বাংলাদেশ হিসাবে পৃথিবীর বুকে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়েছে। জাতিসংঘের বৈঠকে বাংলাদেশের প্রেসিডেন্ট বা প্রধানমন্ত্রী ১৭৭টি দেশের পাশে গিয়ে সমান মর্যাদায় বক্তব্য রাখার সুযোগ পাচ্ছেন।

কিন্তু বঙ্গদেশের অন্য একটি অংশ যাকে পশ্চিম বাংলা বলা হয়। তাদের প্রধানমন্ত্রী করার সুযোগ নেই। মূখ্যমন্ত্রী করার সুযোগ আছে। মূখ্যমন্ত্রীর ক্ষমতা নেই সেদেশের প্রধানমন্ত্রীকে ডিঙিয়ে জাতিসংঘের বৈঠকে গিয়ে বক্তব্য রাখার। এই সম্মান এবং এই মর্যাদা পূর্ববাংলা তথা বাংলাদেশের মানুষের ভাগ্যে জুটেছে শুধুমাত্র তাদের ধর্মীয় আদর্শের কারণে। যদি এদেশের মানুষ তাদের ধর্মীয় আদর্শকে জলাঞ্জলী দেয়, যদি এদেশের মানুষ আজকে ইসলামকে প্রত্যাখ্যান করে, তাহ'লে পূর্ব বাংলা আর পশ্চিম বাংলার মধ্যে পৃথকীকরণের কোন আদর্শিক কারণ আর অবশিষ্ট থাকবেনা। সেজন্য ইসলাম হ'ল বাংলাদেশের স্বাধীনতার মূল রক্ষাকবচ। আর সেই ইসলামের মূল বিষয়টি নিহিত আছে কুরআন এবং ছহীহ হাদীছ-এর মধ্যে। আর এখানেই নিহিত রয়েছে আহলেহাদীছ আন্দোলনের মূল প্রেরণা।

দুনিয়ার সমস্ত মানুষ যখন নিজ নিজ থিওরী, ইজম, মতবাদ তরীক্বা ও মাযহাব নিয়ে ব্যস্ত, আমরা তখন সবকিছু বাদ দিয়ে সবদিক থেকে মুখ ফিরিয়ে আল্লাহ প্রেরিত সেই পবিত্রতম অহি-র দিকে ফিরে যাওয়ার আকুল আহ্বান জানাচ্ছি। আমরা বলি, আসুন! সব দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের বিধানকে আঁকড়ে ধরি।

অতঃপর মুহতারাম আমীরে জামা'আত ইজতেমায় আগত লোকদেরকে শৃংখলা বিষয়ক বিভিন্ন উপদেশ দিয়ে এবং ইজতেমা বাস্তবায়ন কমিটির সকল সদস্য, স্বেচ্ছা সেবক এবং উপস্থিত জনগণকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানিয়ে আল্লাহ্র নামে তাবলীগী ইজতেমার শুভ উদ্বোধন ঘোষণা করেন।

সিনিয়র নায়েবে আমীর

(দরসে কুরআন)

'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর সিনিয়র নায়েবে আমীর শায়খ আবদুছ ছামাদ সালাফী হামদ ও ছানার পর সূরা 'ছফ'-এর ৪নং আয়াতের উপরে দরস পেশ করেন। আয়াতের শানে নুযূল সম্পর্কে তিনি বলেন, ছাহাবীগণ একদা পরামর্শ করছিলেন যে, আল্লাহ্র নিকট প্রিয় আমল কোন্‌টি তা জানতে পারলে আমরা সেই অনুযায়ী আমল করতাম। পরামর্শ বৈঠকে তারা সিদ্ধান্ত নিলেন, এ বিষয়ে জানার জন্য তারা রাসূল (ছাঃ)-এর কাছে যাবেন। কিন্তু কে যাবেন তা ঠিক করতে পারলেন না। রাসূল (ছাঃ) -এর নিকট যেতে কারো সাহস হ'ল না। তখন আল্লাহ পাক এ সূরা নাযিল করেন। অতঃপর পরামর্শ সভার সকলকে ডেকে মহানবী (ছাঃ) সূরাটি শুনিয়ে দেন।

তিনি বলেন, আল্লাহপাক এরশাদ করেন, 'আল্লাহ্র নিকট প্রিয় তারা যারা আল্লাহ্র দ্বীনকে প্রতিষ্ঠা করার জন্য একতাবদ্ধ হয়ে লড়াই করে' (ছফ ৪)। জিহাদ করতে হবে আল্লাহ্র সন্তুষ্টির জন্য ও তার নৈকট্য লাভের জন্য। আল্লাহ বলেন, 'তোমরা কি ভেবে নিয়েছ যে, তোমরা জান্নাতে প্রবেশ করবে, অথচ আল্লাহপাক জানবেন না কে তোমাদের মধ্যে প্রকৃত মুজাহিদ, আর কে প্রকৃত ধৈযশীল' (আলে ইমরান ১৪২)।

তিনি বলেন, আল্লাহ্র দ্বীনের প্রচার-প্রসার করার জন্য জান-মাল-শ্রম সবকিছু দিয়ে আত্মত্যাগের মহিমায় উজ্জীবিত হয়ে আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে। আহলেহাদীছ আন্দোলনকে শক্তিশালী করার যথাসাধ্য চেষ্টা করতে হবে। আন্দোলন জিহাদের একটি অংশ। দুনিয়াতে আল্লাহ্র দ্বীন প্রতিষ্ঠার জন্য এসেছি। তাই এ দায়িত্ব পালন করার জন্য এবং রাসূলের রেখে যাওয়া আমানত রক্ষা করার জন্য আমাদের সর্বাত্মক আত্মত্যাগের প্রতিজ্ঞা নিয়ে এ সম্মেলন থেকে বিদায় নিতে হবে। সমবেত জন মন্ডলীকে উদ্দেশ্য করে এ আহবান জানিয়ে তিনি তাঁর সংক্ষিপ্ত দরস সমাপ্ত করেন।

শায়খ আব্দুল ওয়াহ্হাব খিলজী (ভারত)

মাসনূন খুৎবার পর দিল্লী থেকে আগত মারকাযী জমঈয়তে আহলেহাদীছ হিন্দ-এর সাধারণ সম্পাদক মাওলানা আবদুল ওয়াহ্হাব খিলজী বলেন, আমি অপেনাদের মাঝে আসতে পেরে, আহলেহাদীছ আন্দোলনের নেতাদের সংস্পর্শ পেয়ে এবং এই তাবলীগী ইজতেমায় অংশগ্রহণ করতে পেরে অত্যন্ত আনন্দিত ও গর্বিত হয়েছি। আমি ভারতের দু'কোটিরও অধিক আহলেহাদীছ ভাইদের সালাম পৌঁছে দেয়ার জন্য অল-ইণ্ডিয়ার পক্ষ থেকে সেক্রেটারী জেনারেল হিসাবে এখানে এসেছি। যাতে এই আন্দোলনের সাথে আমাদের বন্ধন আরও শক্তিশালী ও দৃঢ় হয়। ভাই ছাহেবান! আপনারা অবগত আছেন যে, আহলেহাদীছের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হচ্ছে 'নির্ভেজাল তাওহীদের প্রচার ও প্রতিষ্ঠা এবং জীবনের সর্বক্ষেত্রে কিতাব ও সুন্নাতের যথাযথ অনুসরণের মাধ্যমে আল্লাহ্র সন্তুষ্টি অর্জন করা' এবং আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে ছিরাতুলমুস্তাক্বীম-এর দিকে পরিচালিত করা।

বেরাদারানে ইসলাম! আপনারা নিশ্চয়ই জ্ঞাত আছেন যে, আমাদের শেষনবী মুহাম্মাদ (ছাঃ) প্রেরিত হয়েছিলেন 'তাওহীদ'-কে সমাজের বুকে প্রতিষ্ঠা করার জন্য। বহু নির্যাতন-নিপীড়ন সহ্য করে তিনি তাওহীদকে প্রতিষ্ঠা করে গেছেন। এই মহান শিক্ষা ও জ্ঞান লাভ করেছিলেন হযরত নূহ (আঃ), হযরত ইব্রাহীম (আঃ) এবং হযরত মূসা (আঃ) সহ অন্যান্য নবী ও রাসূলগণ। অতঃপর এই মৌলিক শিক্ষার বাণী ও জ্ঞান নিয়েই আমাদের আখেরী নবী হযরত মুহাম্মাদ (ছাঃ) তাঁর উম্মতের মাঝে আবির্ভূত হন। এ প্রসঙ্গে পবিত্র কালামে আল্লাহ পাক এরশাদ করেন, 'আপনার পূর্ববর্তী সকল রাসূলকেই আমি এ আদেশ দিয়ে প্রেরণ করেছি যে, আমি ব্যতীত কোন (হক) উপাস্য নেই। সুতরাং তোমরা একমাত্র আমার-ই ইবাদত কর' (আম্বিয়া ২৫)।

আপনারা জানেন যে, ভারতবর্ষে মূর্তিপূজা ছাড়া আর কিছুই ছিল না। কতিপয় বুযুর্গানে দ্বীন এদেশে এসে মানুষকে প্রকৃত তাওহীদের শিক্ষা দিয়েছেন এবং এ উপমহাদেশে তাওহীদের প্রচার ও প্রসার ঘটিয়েছেন।

কিন্তু দুঃখজনক হ'লেও সত্য যে, যাঁরা বিভিন্ন নির্যাতন-নিপীড়ন সহ্য করে এদেশে তাওহীদ প্রচার করেছেন তাদেরকে এখন মা'বূদ বানিয়ে পূজা করা হচ্ছে। খাজা মঈনুদ্দীন চিশতী (রহঃ), বায়েযীদ বোস্তামী (রহঃ), শাহজালাল (রহঃ), শাহ্ মখদূম (রহঃ), শাহ সুলতান বলখী (রহঃ) প্রমুখ অসংখ্য বুযুর্গানে দ্বীন-এর মাযারে আজ সিজদা করা হচ্ছে, প্রার্থনা করা হচ্ছে। এমনিভাবে তারা শিরক করে তাদের ঈমানকে বিনষ্ট করছে। মুসলমানদের এ অবস্থা দেখে হিন্দুরা তাদেরকে ভর্ৎসনার স্বরে বলছে, 'আমরা মূর্তি বানিয়ে পূজা করছি আর তোমরা মরা মানুষের

পূজা করছ। অতএব তোমাদের আমাদের মাঝে কোন পার্থক্য নেই'।

পরিতাপের বিষয় যে, এ ধরনের জঘন্য কাজ দেখে বিধর্মীরা মুসলমানদেরকে ঘৃণার চোখে দেখছে। অথচ নামধারী মুসলমানদের মনে এখনও এ সম্পর্কে ঘৃণার উদ্রেক হচ্ছে না। হিন্দুরা দেবতাকে সামনে রেখে পূজা করে। আর মুসলমানরা মাটির নীচে ঢেকে রেখে পূজা করে। তাই তাদের মাঝে ও আমাদের মাঝে কোন পার্থক্য দেখছি না।

তিনি উপস্থিত জনমণ্ডলীর নিকট আকুল আবেদন জানান যে, আপনারা সকলে আহলেহাদীছ আন্দোলনের সাথে এক কাতারে শামিল হয়ে এই আন্দোলনকে আরও জোরদার এবং শক্তিশালী করুন। পরিশেষে তিনি আল্লাহ্র দরবারে দো'আ করেন যে, 'হে আল্লাহ! এই আন্দোলনের নেতৃবৃন্দ এবং সকল আহলেহাদীছ ভাইয়ের প্রচেষ্টাকে তুমি কবুল করে নাও এবং এই আন্দোলনকে ক্বিয়ামত পর্যন্ত অটুট রাখ। -আমীন!!

আবু আব্দুর রহমান (লিবিয়া)

মাসনূন খুৎবার পর তিনি বলেন, আমি সর্বপ্রথম 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' -এর নেতৃবৃন্দকে আন্তরিক অভিনন্দন জানাই। তাদের এই সুন্দর ব্যবস্থাপনা দেখে আমি যার পর নেই খুশি হয়েছি। তিনি বলেন, আল্লাহ তা'আলা যুগে যুগে তাওহীদের বাণী সহ নবী ও রাসূল প্রেরণ করেছেন। আমাদের নবী (ছাঃ)ও ২৩টি বছর রেসালাতের দায়িত্ব নিয়ে তাওহীদ প্রতিষ্ঠা করে গেছেন। আল্লাহ তা'আলাকে এক মেনে কিভাবে ইবাদত করতে হবে এজন্য প্রতিটি মুসলমানের তাওহীদের জ্ঞান অর্জন করা উচিত। কারণ, তাওহীদের জ্ঞান হচ্ছে সর্বোত্তম জ্ঞান, যার মাধ্যমে আল্লাহ্কে জানা ও মানা এবং একনিষ্ঠ ভাবে তাঁরই ইবাদত করা যায়। আল্লাহ বলেন, 'আমার ইবাদত করার জন্যই আমি জিন ও মানব জাতিকে সৃষ্টি করেছি' (যারিয়াত ৫৬)। সুতরাং প্রত্যেক মুসলমানের উচিৎ তাওহীদের জ্ঞান অর্জন করা। আল্লাহ আমাদের সৃষ্টি করেছেন, রিযিক দান করেছেন, জীবন দান করেছেন। মক্কার কাফেরগণও এই বিশ্বাস করত যে, আল্লাহ আসমান-যমীনের স্রষ্টা। কিন্তু তারা 'অসীলা' মানত। তাদের ধারণা ছিল যে, এই সমস্ত মা'বূদ (মূর্তি) তাদেরকে আল্লাহ্র নিকটবর্তী করে দিবে। আল্লাহ্কে কেবল স্বীকার করায় তাদের কোন কাজে আসেনি। কারণ তারা আল্লাহ্কে এক মেনে তাঁর ইবাদত করেনি।

তিনি বলেন, ইবাদতের মূল কথা হ'ল আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টি লাভের চেষ্টায় নিয়োজিত থাকা। আর তিনি তখনই সন্তুষ্ট হবেন যখন তার বান্দা প্রতিনিয়ত তাঁর নির্দেশ অনুযায়ী কাজ করবে এবং যে কাজ করতে নিষেধ করেছেন, তা থেকে বিরত থাকবে।

তিনি বলেন, ইবাদতের ক্ষেত্রে আমাদেরকে শিরক হ'তে বেঁচে থাকতে হবে। কেননা আল্লাহপাক শিরক ছাড়া যেকোন গোনাহ ইচ্ছা করলে ক্ষমা করে দিতে পারেন। শিরকের ভয়াবহতা থেকে সমাজকে রক্ষা করা আমাদের সকলের ঈমানী দায়িত্ব। বর্তমান যুগের মুসলমানগণ মক্কার তৎকালীন মুশরিকদের চেয়েও জঘন্য শিরকে লিপ্ত আছে। অনেক মানুষ কবরে গিয়ে মৃত ব্যক্তির নিকট প্রার্থনা করছে, সিজদা করছে। এর চেয়ে জঘন্য শিরক আর কি হতে পারে? আল্লাহ যেন আমাদের সকলকে শিরক থেকে হেফাযত করেন এবং তাওহীদের যথাযথ জ্ঞান অর্জন করার তাওফীক দান করেন। পরিশেষে আহলেহাদীছ আন্দোলনের নেতা ও কর্মীদের এই মহতী খিদমতকে আল্লাহ যেন কবুল করেন এবং তাদের এই দাওয়াতী কার্যক্রম ঘরে ঘরে পৌঁছে দেওয়ার তাওফীক দেন, সেই দো'আ করেন।

শায়খ আবদুল্লাহ মাদানী (নেপাল)

হাম্দ ও ছানার পর তিনি সমবেত শ্রোতামন্ডলীকে উদ্দেশ্য করে বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর সাথে আমাদের ভালবাসা কিরূপ হওয়া উচিত এ প্রসংগে রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'তোমাদের মধ্যে কেউ পূর্ণ মুমিন হ'তে পারবে না যতক্ষণ না আমি তার নিকটে প্রিয়তর হব তার পিতা-মাতা, সন্তান-সন্ততি ও দুনিয়ার সকল মানুষের চেয়ে' (বুখারী, মুসলিম)।

বেরাদারানে মিল্লাত! ভালবাসা শুধু 'যাত'-এর সাথে যথেষ্ট নয়। যদি তাই হ'ত তাহ'লে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর চাচা আবু ত্বালেব রাসূল (ছাঃ)-কে খুব ভালবাসতেন। কিন্তু তিনি তাঁর দাওয়াতে সাড়া দেননি। ফলে মুসলমান হয়ে মৃত্যুবরণ করা তার ভাগ্যে জোটেনি। রাসূল (ছাঃ)-কে ভালবাসার সাথে সাথে তাঁর পূর্ণ অনুসরণ-অনুকরণ করতে হবে। তা না হ'লে কেউ সত্যিকারের মুসলমান হবার দাবী করতে পারবে না। এ প্রসঙ্গে রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'আমার উম্মতের সকল মানুষ জান্নাতে প্রবেশ করবে, কিন্তু যে অসম্মত হবে সে ব্যতীত। জিজ্ঞেস করা হ'ল, হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)! কে জান্নাতে যেতে অসম্মত? তিনি বললেন, যে আমার অনুসরণ করবে সে আমার সাথে জান্নাতে প্রবেশ করবে। আর যে আমার অবাধ্যতা করবে সে জান্নাতে যেতে অসম্মত' *(বুখারী ফৎহ সহ হা/৭২৮০ 'কিতাব ও সন্নাহ্কে আঁকড়ে ধরা' অধ্যায়; মিশকাত হা/১৪৩)*। অন্যত্র মহানবী (ছাঃ) বলেন,

من اطاع محمدا فقد اطاع الله و من عصى محمدا فقد عصى الله ، محمد فَرَقٌ بين الناس

'যে ব্যক্তি মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর অনুসরণ করল, সে আল্লাহ্রই অনুসরণ করল। আর যে ব্যক্তি মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর অবাধ্যতা করল সে আল্লাহ্র-ই অবাধ্যতা করল। মুহাম্মাদ (ছাঃ) হচ্ছেন মানুষের মধ্যে (মুমিন ও কাফিরের মধ্যে) পার্থক্যকারী *(বুখারী 'কিতাব ও সুন্নাহ্কে আকড়ে ধরা' অধ্যায় হা/৭২৮১; মিশকাত হা/১৪৪)*। বুঝা গেল যে, মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর সাথে ভালবাসার অর্থ হ'ল তাঁর অনুসরণ ও অনুকরণ করা। কিন্তু দুঃখের বিষয় বর্তমানে কিছু লোককে দেখা যায়, যারা আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)-এর অনুসরণ করা তো দূরের কথা বরং রাসূলের মহব্বতের নামে দরগা ও খানকায় সাহায্য করা এমনকি সিজদা করার মত শিরকী কাজ করছে। কিন্তু জেনে রাখুন! আহলেহাদীছগণ কোন দরগাহ ও মাযারে সিজদা করেন না। আহলেহাদীছগণই প্রকৃত মুওয়াহ্হিদ বা তাওহীদবাদী। শিরক ও বিদ'আতের বিরুদ্ধে তারা আপোষহীন।

অতএব আপনাদের নিকট বিনীত অনুরোধ, আপনারা আহলেহাদীছ আন্দোলনের সাথে একাত্মতা ঘোষণা করে নিজের সার্বিক জীবন পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের ছাঁচে গড়ে তুলুন। দেখবেন, একদিন এই আন্দোলন-ই পৃথিবীর বুকে সত্যিকারের আন্দোলন হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হবে। আল্লাহ্র দরবারে এই প্রার্থনা- তিনি যেন এই আন্দোলনকে সাফল্য দান করেন এবং সকলকে এই আন্দোলনের সাথে এক হয়ে কাজ করার তাওফীক দান করেন-আমীন!!

আবদুল মুন'ইম (সঊদী আরব)

হাম্দ ও ছানার পর সম্মেলন সম্পর্কে তিনি বলেন, আজকের এ সম্মেলন মহান রাব্বুল আলামীনের বাণীকে সমগ্র পৃথিবীতে ব্যাপকভাবে প্রচার ও প্রসারের জন্যই আহূত হয়েছে। এর উদ্দেশ্য হচ্ছে আল্লাহ্র কালাম মহানবী (ছাঃ)-এর হাদীছকে আমরা আমাদের ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক, রাষ্ট্রীয় এমনকি জীবনের প্রতিটি দিক ও বিভাগে বাস্তবায়ন করতে চেষ্টা করব। অনেক মানুষ জানে না যে, কিভাবে তারা দ্বীন প্রতিষ্ঠার কাজে এগিয়ে আসবে এবং মানুষকে আল্লাহ্র পথে কিভাবে আহবান জানাবে। তাই তাদেরকে সুস্পষ্ট ধারনা দেওয়ার জন্যই আজকের এই ব্যাপক আয়োজন। তিনি বলেন, 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' কর্তৃক আয়োজিত আজকের এই ইজতেমার অন্যতম প্রধান লক্ষ্য হচ্ছে পৃথিবীর সমস্ত মানুষকে একমাত্র আল্লাহ্র ইবাদতের দিকে আহবান করা, মানুষকে ছিরাতুল মুস্তাক্বীম তথা আল্লাহ প্রেরিত সরল-সঠিক পথের সন্ধান দেয়া।

তিনি বলেন, আমাদের তরীক্বা হচ্ছে রাসূল (ছাঃ)-এর রেখে যাওয়া তরীক্বা। আমাদের তরীক্বা হচ্ছে ছাহাবা ও সালাফে ছালেহীনের রেখে যাওয়া তরীক্বা। এই তরীক্বার উপরে আমাদের কায়েম থাকতে হবে। তবে এর জন্য সর্বাগ্রে আমাদের আক্বীদাকে পরিশুদ্ধ করে নিতে হবে।

তিনি বলেন, আমাদেরকে রাসূল (ছাঃ)-এর অনুসরণ-অনুকরণ করতে হবে। জীবনের প্রতিটি দিক ও বিভাগে রাসূল (ছাঃ)-এর আদর্শকে মডেল হিসাবে গ্রহণ করতে হবে। রাসূল (ছাঃ)-এর জীবনাদর্শকে কথায়, কাজে ও আন্তরিকভাবে স্বীকৃতি প্রদান করে তা নিজের জীবনে বাস্তবায়ন করতে হবে এবং সেই দিকে মানুষকেও আহবান করতে হবে। আল্লাহ বলেন,

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِىْ رَسُوْلِ اللهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ

'নিশ্চয় রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর চরিত্রের মধ্যেই তোমাদের জন্য উত্তম নমুনা রয়েছে' (আহযাব ২১)।

একথা স্মর্তব্য যে, দাঈ-র গুণাবলীর মধ্যে অন্যতম গুণ হ'ল কথা ও কাজে মিল থাকা। কেননা আল্লাহ বলেছেন

لِمَ تَقُوْلُوْنَ مَا لاَ تَفْعَلُوْنَ

'তোমরা যা করনা, তা বল কেন'? (ছফ ২)

তিনি বলেন, দাঈকে সংযমী ও ধৈর্যশীল হ'তে হবে। তাদেরকে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছ অনুযায়ী নিজের সার্বিক জীবন গঠন করতে হবে এবং তারপর সে দিকে মানুষকে আহ্বান করতে হবে।

মাওলানা আব্দুল মতীন সালাফী (ভারত)

হাম্দ ও ছানার পর ভারতের খ্যাতনামা আলেম মাওলানা আব্দুল মতীন সালাফী সুদীর্ঘ ৭ বছর ৫ মাস ২৬ দিন পর বাংলাদেশে এসে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর এ তাবলীগী ইজতেমায় অংশগ্রহণ করতে পেরে মহান আল্লাহ্র দরবারে আন্তরিক শুকরিয়া জ্ঞাপন করেন এবং আমীরে জামা'আত **ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব** সহ যাঁরা তাকে আসার এ সুযোগ করে দিয়েছেন তাঁদেরকে গভীর কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জানান। সাথে সাথে 'তাওহীদ ট্রাস্ট'-এর দ্বীনী কার্যক্রমে সন্তুষ্টি জ্ঞাপন করতঃ উহা ক্বিয়ামত অবধি টিকে থাকার জন্য মহান আল্লাহ্র দরবারে প্রার্থনা জানান।

অতঃপর 'ছিরাতে মুস্তাক্বীম'-এর উপর বক্তব্য রাখতে গিয়ে তিনি বলেন, Islam is a complete code of life. অর্থাৎ 'ইসলাম একটি পরিপূর্ণ জীবনাদর্শ। এতে কম-বেশী করার

কোন অবকাশ নেই। মহান আল্লাহ বলেন, 'আজকের দিনে আমি তোমাদের দ্বীনকে পরিপূর্ণ করলাম ও তোমাদের উপরে আমার নে'মতকে সম্পূর্ণ করলাম এবং ইসলামকে তোমাদের জন্য দ্বীন হিসাবে মনোনীত করলাম' (মায়েদা ৩)।

তিনি বলেন, পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের মধ্যেই নিহিত আছে 'ছিরাতে মুস্তাক্বীম'। রাসূল (ছাঃ)-এর পবিত্র জীবনাদর্শই আমাদের জন্য অনুকরণীয়। মহান আল্লাহ পবিত্র কুরআনে উম্মতে মুহাম্মাদীকে সেই নির্দেশ দিয়ে বলেন, 'নিশ্চয়ই তোমাদের জন্য সর্বোত্তম আদর্শ নিহিত আছে, রাসূলের মধ্যে। তাদের জন্য যারা আল্লাহ্কে ও আখেরাতকে কামনা করে এবং আল্লাহ্কে বেশী বেশী স্মরণ করে' (আহযাব ২১)। রাসূল (ছাঃ) আমাদেরকে সেই 'ছিরাতে মুস্তাক্বীম' দিয়ে গেছেন। তিনি ও তাঁর ছাহাবীগণ 'ছিরাতে মুস্তাক্বীম' -এর উপর কায়েম ছিলেন। তিনি আমাদেরকে তাঁর এই অমোঘ বাণী শুনিয়ে গেছেন যে, 'হযরত ছাওবান (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'আমার উম্মতের মধ্যে ক্বিয়ামত পর্যন্ত সর্বদা একটি দল হক-এর উপরে বিজয়ী থাকবে, পরিত্যাগকারীরা তাদের কোন ক্ষতি করতে পারবে না' *(মুসলিম 'ইমারত' অধ্যায় হা/১৯২০)*।

তিনি বলেন, যেভাবে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) ও তাঁর ছাহাবীগণ ইসলামকে এ ধরাধামে প্রতিষ্ঠিত করে গেছেন আমাদেরকেও সেই পথ ও পদ্ধতি মোতাবেক দ্বীন কায়েমে এগিয়ে আসতে হবে। আর যারা এভাবে দ্বীন কায়েম করবে তারাই হবে মুক্তিপ্রাপ্ত দল।

এই মুক্তিপ্রাপ্ত দল কে বা কারা? এ সম্পর্কে ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল বলেন, إن لم يكونوا أهل الحديث فلا أدرى من هم؟ 'তারা যদি আহলেহাদীছ না হন, তবে আমি জানিনা তারা কারা? *(শারফু আছহাবিল হাদীছ, পৃঃ ২৭)*।

হাদীছ বলতে কুরআন ও হাদীছ উভয়ই বুঝায়। সুতরাং যারা তাদের জীবনের সার্বিক ক্ষেত্রে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছ অনুযায়ী চলবে তারাই আহলেহাদীছ।

পরিশেষে তিনি উপস্থিত ভ্রাতৃমণ্ডলীকে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' ও 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' যে মহান লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য নিয়ে বাংলার যমীনে কাজ করে যাচ্ছে, সে লক্ষ্যে পৌঁছতে তাদেরকে পূর্ণ সহযোগিতা করার উদাত্ত আহ্বান জানিয়ে তাঁর বক্তব্য শেষ করেন।

মাওলানা আবদুল্লাহ সালাফী (ভারত)

হাম্দ ও ছানার পর 'ধূমপান, মাদকতা, বিজ্ঞান ও ইসলাম' বিষয়ে বক্তব্য রাখতে গিয়ে তিনি বলেন, বর্তমানে ধূমপান খাদ্যে পরিণত হয়েছে। অথচ আল্লাহপাক পবিত্র কুরআনে পবিত্র রিযিক ভক্ষণ করার আদেশ দিয়েছেন। আল্লাহ বলেন, 'হে ঈমানদারগণ! তোমরা পবিত্র বস্তু ভক্ষণ কর, যেগুলো আমি তোমাদেরকে রুযী হিসাবে দান করেছি এবং শুকরিয়া আদায় কর আল্লাহ্র, যদি তোমরা তাঁরই ইবাদত কর' (বাক্বারাহ ১৭২)।

অতঃপর তিনি ধূমপানের ইতিহাস আলোচনা করতে গিয়ে বলেন, ১৩৪২ সালে যখন কলম্বাস কিউবা উপদ্বীপ আবিষ্কার করেন, তখন তার দু'জন প্রতিনিধিকে সেখানকার অবস্থা জানার জন্য পাঠান। প্রতিনিধিদ্বয় কিউবা উপদ্বীপ পর্যবেক্ষণ করতঃ ফিরে এসে কলম্বাসকে জানায় যে, সেখানকার মানুষ আগুন জ্বেলে এমন একটা জিনিষ আহার করছে যা থেকে ধোঁয়া নির্গত হয়। এর এক শতাব্দী পরে ফ্রাংক ও ফার্ণাণ্ডেজ প্রথম এটাকে স্পেনে নিয়ে আসে। ১৫৬০ সালে ফ্রান্সের রাষ্ট্রদূত জেম নেকুড ফ্রান্সে এবং ১৫৬৫ সালে স্যার ওয়াল্টার র‍্যালে ইংল্যাণ্ডে এর বিস্তার ঘটান। ১৬১৫ সালে জন কিমস জেমস প্রথমে ভারতে আলু ও তামাক এ দু'টো জিনিষ নিয়ে আসেন। সেই থেকে সমগ্র ভারতীয় উপমহাদেশে এটা বিস্তার লাভ করে। যা বর্তমানে মারাত্মক রূপ ধারণ করেছে।

তিনি বলেন, বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে তামাকে তিনটি উপাদান আছে। যথাঃ (১) কার্বন মনোক্সাইড (২) নিকোটিন (৩) ভেলোফাইরিন। এর মধ্যে নিকোটিন সবচেয়ে মারাত্মক ক্ষতিকারক ও দূরারোগ্য ক্যান্সার সৃষ্টিকারক।

জার্মানীর এক পত্রিকা 'সেভিকাল' জানায়, আমেরিকার মেরিল্যাণ্ডে অবস্থিত বিভিন্ন বিজ্ঞানীদের সংস্থা সেখানকার এক পত্রিকায় লিখেছে, পৃথিবীতে যত মৃত্যু ঘটছে, তার শতকরা ৬৮ ভাগ ধূমপানের কারণে। বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থা (WHO)-এর ১৯৭৫ সালের রিপোর্ট থেকে জানা যায়, প্রতিবছর গড়ে শুধুমাত্র ধূমপানের কারণে ৫৯ লক্ষ লোকের মৃত্যু ঘটছে। সুতরাং যেসব জিনিষে এ ধরনের মারাত্মক ক্ষতি রয়েছে, তা ইসলাম কিভাবে জায়েয করতে পারে?

তিনি বলেন, মহান আল্লাহ রাসূল (ছাঃ)-এর একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্যের কথা উল্লেখ করে পবিত্র কুরআনে বলেন, 'এবং তিনি পবিত্র বস্তুকে হালাল ও অপবিত্র বস্তুকে তাদের উপর হারাম করবেন' (আ'রাফ ১৫৯)।

পবিত্র জিনিষ হচ্ছে তাই, যা সুস্বাদু, রুচিকর ও স্বাস্থ্যকর। আর যা দূর্গন্ধ ও যাতে লাভের লেশ মাত্র নেই তাই অপবিত্র জিনিষ। ধূমপান নিষিদ্ধ হওয়ার আরেকটি ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ হচ্ছে প্রতিবেশীকে কষ্ট দেয়া। অথচ হাদীছে প্রতিবেশীকে কষ্ট দেয়া থেকে নিষেধ করা হয়েছে।

তিনি বলেন, আমরা দো'আ করা নিয়ে মারামারি করছি। অথচ দো'আ কবুলের তিনটি শর্ত রয়েছে যথাঃ (১) সত্যবাদী হ'তে হবে, (২) হালাল আহার ভক্ষণ করতে হবে (৩) দো'আ কবুলের দৃঢ় বিশ্বাস নিয়ে দো'আ করতে হবে। আমরা কি একবারও ভেবে দেখেছি, হারাম জিনিষ খেয়ে দো'আ করলে কিভাবে দো'আ কবুল হ'তে পারে?

পরিশেষে তিনি সবাইকে ধূমপান ও মাদকতার ন্যায় জীবন বিনাশী ধ্বংসাত্মক বস্তু থেকে বেঁচে থাকার ও হালাল খাবার ভক্ষণ করতঃ আল্লাহ্র ইবাদত করার আহ্বান জানিয়ে তাঁর বক্তব্য শেষ করেন।

মাওলানা ছফিউল্লাহ (কুমিল্লা)

হামদ ও ছানার পর 'দাওয়াতের গুরুত্ব ও পদ্ধতি' বিষয়ে বক্তব্য রাখতে গিয়ে তিনি বলেন, দাওয়াতের আভিধানিক অর্থ আহবান করা। ইসলামী পরিভাষায় আল্লাহ্র নৈকট্য লাভের উদ্দেশ্যে তাওহীদ ও রিসালাত এবং আল্লাহ্র যাবতীয় হুকুম-আহকামের দিকে বিশ্ব মানবতাকে আহবান জানানো। এই দাওয়াত সমস্ত আম্বিয়ায়ে কেরামের প্রথম ও প্রধান দায়িত্ব ছিল। আল্লাহ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে লক্ষ্য করে বলেন,

اُدْعُ اِلَى رَبِّكَ وَ لاَ تَكُوْنَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ

'হে নবী! আপনি মানুষকে আপনার রব-এর দিকে। আপনি মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত হবেন না' (ক্বাছাছ ৮৭)।

অন্যত্র আল্লাহ বলেন-

قُلْ هذه سَبِيْلِىْ أَدْعُوْا اِلَى اللّهِ عَلَى بَصِيْرَةٍ أَنَا وَ مَنِ اتَّبَعَنِىْ-

'হে নবী! আপনি বলে দিন এটাই আমার পথ, আমি এবং আমার অনুসারীরা ডাকি আল্লাহ্র দিকে জাগ্রত জ্ঞান সহকারে' (ইউসুফ ১০৮)।

এ আয়াতের মাধ্যমে আল্লাহ দুনিয়ার মানুষকে জানিয়ে দিলেন যে, নবীর মিশন যেমন আল্লাহ্র দিকে মানুষকে আহবান করা, তেমনি তাঁর অনুসারীদেরও প্রধান দায়িত্ব ও কর্তব্য আল্লাহ্র দিকে দাওয়াত দেয়া এবং সেটা হবে জাগ্রত জ্ঞান সহকারে অর্থাৎ সুস্পষ্ট দলীল সহকারে। অতএব যারা রাসূলের উম্মত বলে নিজেদেরকে দাবী করবে তাদেরকে অবশ্যই দাওয়াতের পবিত্র দায়িত্ব পালন করতে হবে। আল্লাহ্র দিকে মানুষকে আহ্বান না করে নিজেদেরকে নবীর উম্মত বলে পরিচয় দেওয়া এবং নিজেদেরকে 'আহলেহাদীছ' বলে দাবী করা ঠিক হবে না।

সর্বপ্রথম 'অহি' প্রাপ্ত হয়ে রাসূল (ছাঃ) যখন ভীত-সন্ত্রস্ত ও ভারাক্রান্ত হয়ে চাদরাবৃত ছিলেন, আল্লাহ তখন তাঁকে ডেকে দাওয়াতের দায়িত্ব দিয়ে বলেন, يَاأَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ قُمْ فَأَنْذِرْ 'হে চাদরাবৃত উঠুন! সতর্ক করুন' (মুদ্দাছছির ১-২)।

তিনি বলেন, দাওয়াতের স্তর তিনটি। ফরযে আয়েন, ফরযে কিফায়াহ ও মুবাহ। যখন পৃথিবীতে হক পরাভূত হবে, বাতিল বিজয়ী থাকবে তখন আল্লাহ্র দিকে দাওয়াত দেয়া প্রত্যেকের জন্য 'ফরযে আয়েন'। বাংলাদেশ সহ পৃথিবীর কোথাও আজ হক বিজয়ী নেই। বরং হক পরাভূত এবং বাতিল মাথা তুলে সদর্পে দন্ডায়মান রয়েছে। এমতাবস্থায় পৃথিবীর সব জায়গায় বিশেষ করে বাংলাদেশে দাওয়াতের কাজ করা 'ফরযে আয়েন'। দুর্ভাগ্য, এ দেশে আজ বিভিন্ন মাযহাবী ইসলাম প্রতিষ্ঠিত। জীবনের প্রত্যেকটি দিক ও বিভাগে আল্লাহ প্রদত্ত ও রাসূল (ছাঃ) প্রদর্শিত শাশ্বত ইসলামী বিধান নেই। দ্বীনের নামে বিভিন্ন মাযহাবী আইন চালু আছে। ইসলামী শিক্ষার নামে মাযহাবী শিক্ষা প্রচলিত। বৈষয়িক শিক্ষার নামে বিভিন্ন মানব রচিত মতবাদ প্রচলিত। যারা জাহেলিয়াতকে প্রতিষ্ঠিত করতে চায়, যারা মানুষের মাঝে জাহেলিয়াতের বীজ ঢুকাতে চায়, যারা মানুষকে মানুষের দাসে পরিণত করতে চায়, তাদের শিক্ষা ব্যবস্থা, তাদের আদর্শ এদেশে প্রচলিত। এদেশের মানুষের ব্যক্তিগত, সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক জীবনে প্রকৃত ইসলাম নেই। ইসলাম যেন আজ দো'আ ও মোনাজাতের মধ্যে সীমাবদ্ধ হয়ে পড়েছে।

তিনি বলেন, দাওয়াতের দ্বিতীয় স্তর হ'ল- 'ফরযে কিফায়াহ'। ফরযে কিফায়া হ'ল এমন কাজ যা সমাজের কিছু সংখ্যক মানুষ করলে তা পালন হয়ে যায়। আর কেউ যদি তা পালন না করে তাহ'লে প্রত্যেক মুসলমান দায়ী হবে। দেশে যদি হক বিজয়ী থাকে, ইসলাম প্রতিষ্ঠিত থাকে এবং দাওয়াতের জন্য একদল লোক নিয়োজিত থাকে তখন দাওয়াত দেওয়া ফরযে কিফায়াহ। এমতাবস্থায় যদি কিছু লোক দাওয়াত দেয়, তাহ'লে সবার পক্ষ থেকে তা আদায় হয়ে যাবে।

দাওয়াতের তৃতীয় স্তর হ'ল 'মুবাহ'। যখন পৃথিবীর সর্বত্র ইসলাম বিজয়ী বা প্রতিষ্ঠিত থাকবে এবং দাওয়াত দেওয়ার জন্য রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে লোক নির্দিষ্ট থাকবে। এমতাবস্থায় দাওয়াত মুবাহ হবে। মুবাহ হ'ল যা করলে নেকী আছে, না করলে গোনাহ নেই।

দাওয়াতের পদ্ধতি সম্পর্কে তিনি বলেন, এখলাছের সাথে দাওয়াত দিতে হবে। নিয়ত পরিশুদ্ধ না হ'লে ছওয়াব পাওয়া যাবে না। দুনিয়াবী সকল স্বার্থ জলাঞ্জলি দিয়ে সকল মোহকে পরিত্যাগ করে একমাত্র আল্লাহকে রাযী ও খুশী করার জন্য দাওয়াত দিতে হবে। অতঃপর দাওয়াতের অন্যতম পদ্ধতি হ'ল জাগ্রত জ্ঞান তথা দলীল প্রমাণ সহ মানুষকে হক-এর দিকে দাওয়াত দেওয়া।

দাওয়াতের পদ্ধতি সম্পর্কে বলতে গিয়ে তিনি আরো বলেন, প্রত্যেক জাতির নিকট তাদের বোধগম্য ভাষায় দাওয়াত দিতে হবে। নম্র ভাষায় দাওয়াত দিতে হবে। কর্কশ ভাষা পরিত্যাগ করতে হবে। দাওয়াত দানের ফলে মানুষ ইসলাম থেকে দূরে সরে যাবে এ হ'তে পারে না। আল্লাহ কর্কশ ভাষা প্রয়োগ ও রূঢ় ব্যবহারের মাধ্যমে দাওয়াত দিতে বলেননি। আল্লাহ মূসা ও হারূণ (আঃ)-কে পাঠিয়ে ছিলেন ফেরাউনকে দাওয়াত দেওয়ার জন্য। আল্লাহ তখন বলেছিলেন, فَقُوْلاَ لَهُ قَوْلاً لَيِّنًا 'তোমরা তার সাথে নম্র ভাষায় কথা বলবে' (ত্বাহা ৪৪)। পরিশেষে তিনি সমবেত জনতাকে দাওয়াত ও জিহাদের পথ বেছে নেওয়ার আহবান জানিয়ে তার বক্তব্য শেষ করেন।

মাওলানা জাহাঙ্গীর আলম (খুলনা)

হাম্দ ও ছানার পর পূর্ব নির্ধারিত বিষয় 'ক্বিয়ামত' সম্পর্কে আলোচনার প্রারম্ভেই তিনি বলেন, ইসলামী শরীয়তের মধ্যে ক্বিয়ামত অত্যন্ত স্পর্শকাতর, মর্মস্পর্শী ও মর্মান্তিক বিষয়। এই ক্বিয়ামতের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করানোর জন্যই এ পৃথিবীতে অসংখ্য নবী ও রাসূলের আগমন ঘটেছিল। নবী-রাসূলগণ তাওহীদ ও রিসালাতের দাওয়াত দানের সাথে সাথে মানুষকে ক্বিয়ামতের ভয়াবহতা সম্পর্কে সতর্ক করেছেন। কোন মানুষ যদি ইসলামের সমুদয় বিষয়ের প্রতি ঈমান আনে এবং যথারীতি আমলও করে, আর ক্বিয়ামত সম্পর্কে যদি তার সংশয় থাকে তাহ'লে সে মুমিন হ'তে পারেনা। প্রত্যেক জিনিসের আবির্ভাবের সাথে সাথে তার তিরোভাব আছে। উত্থান যেখানে আছে, পতন সেখানে থাকবে, সৃষ্টি যেখানে আছে, ধ্বংস সেখানে থাকবেই। অতএব এ পৃথিবী যেহেতু সৃষ্টি হয়েছে, সুতরাং এর ধ্বংস একদিন হবেই। আল্লাহ বলেন,

كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ وَّ يَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلاَلِ وَالْإِكْرَامِ

'ভূপৃষ্ঠের সবকিছুই ধ্বংসশীল। একমাত্র আপনার মহিমাময় ও মহানুভব পালনকর্তার চেহারা ব্যতীত' (রাহমান ২৬-২৭)।

অথচ বর্তমানে বাংলাদেশের অনেক মুসলমান পাশ্চাত্য দর্শন ও জাহেলী সংস্কৃতির কবলে পড়ে ক্বিয়ামতকে অস্বীকার করছে। তসলীমা নাসরীন, আহমাদ শরীফ, কবির চৌধুরী, আলাউদ্দীন ও দাউদ হায়দাররা আল্লাহ্র কুরআনকে ভুল বুঝেছে। এদের অবস্থা হয়েছে তিন কানার হাতী দেখার মত। চুন খেয়ে মুখ পুড়িয়েছে এখন দই দেখে ভয় পাচ্ছে। এসব নাস্তিকদের মাথায় কুরআন অনুধাবন করার মত মেধা নেই বলেই তারা এর অপব্যাখ্যা করেছে।

তিনি ক্বিয়ামতের ভয়াবহতা সম্পর্কে বলেন, রাসূলে করীম (ছাঃ) এরশাদ করেন যে, 'ক্বিয়ামতের দিন এত ভয়াবহ হবে যে, নারী-পুরুষ বস্ত্রহীন অবস্থায় উঠবে, একই ময়দানে তারা অবস্থান করবে কিন্তু আমলনামা কোন হাতে আসবে এবং নেকীর পাল্লা ভারী হবে, না বদীর পাল্লা ভারী হবে এ চিন্তায় মানুষ এতই বিভোর থাকবে যে, কারো প্রতি কারো তাকানোর ফুরছত থাকবে না। কোন মানুষ কোন মানুষের উপকারে আসবেনা। অতঃপর নবী (ছাঃ) ফাতেমা ও আয়েশা (রাঃ)-কে ডেকে বলেন, আমার কাছে তোমাদের যা দাবী আছে, দুনিয়াতে তোমরা নিয়ে নাও, ক্বিয়ামতের দিন আমি তোমাদের পিতা বা স্বামী হিসাবে কোন উপকার করতে পারব না।

يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيْهِ ، وَ أُمِّهِ وَ أَبِيْهِ ، وَ صَاحِبَتِهِ وَ بَنِيْهِ ، لِكُلِّ إِمْرِئٍ مِنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُّغْنِيْهِ –

'সেদিন পলায়ন করবে মানুষ তার ভ্রাতার কাছ থেকে, তার মাতা, পিতা, স্ত্রী ও সন্তানদের কাছ থেকে। সেদিন প্রত্যেকেরই এক চিন্তা থাকবে, যা তাকে ব্যতিব্যস্ত করে রাখবে' (আবাসা ৩৪-৩৭)।

ক্বিয়ামতের ভয়াবহতার কথা চিন্তা করে সেদিনের মুক্তির জন্য সকলকে আল্লাহ্র অহি-র পথে ফিরে আসার আহবান জানিয়ে তাঁর বক্তব্যের সমাপ্তি ঘটান।

আবদুর রাযযাক বিন ইউসুফ

(চাঁপাই নবাবগঞ্জ)

হাম্দ ও ছানার পর নির্ধারিত বিষয় 'আত্মশুদ্ধি' সম্পর্কে বক্তব্য রাখতে গিয়ে তিনি বলেন, আল্লাহ রাব্বুল আলামীন মানুষকে পাপ-পংকিলতা, হিংসা-বিদ্বেষ, কুটিলতা, পরশ্রীকাতরতা প্রভৃতি দোষ-ত্রুটি হতে মুক্ত করে খাঁটি মুমিন মুসলমান হওয়ার জন্যই মহানবী (ছাঃ)-কে এ ধরাধামে পাঠিয়েছিলেন। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ বলেন,

هُوَ الَّذِىْ بَعَثَ فِى الْأُمِّيِّيْنَ رَسُوْلاً مِّنْهُمْ يَتْلُوْا عَلَيْهِمْ آيَتِهِ وَ يُزَكِّيْهِمْ وَ يُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ

'আল্লাহ সেই সত্তা যিনি নিরক্ষর নিকট তাদের মধ্য হতে এক জনকে রাসূল করে পাঠিয়েছেন। যিনি তাদের নিকট আল্লাহ্র কিতাব পাঠ করেন, তাদেরকে পবিত্র করেন এবং কিতাব ও হেকমত শিক্ষা দেন' (জুম'আ ২)। আল্লাহ মহানবী (ছাঃ)-কে যেমন মানুষকে পরিশুদ্ধ করার জন্য প্রেরণ করেছিলেন তেমনি হযরত মূসা (আঃ)-কেও যালেম, পাপাচারী ও প্রভুত্বের দাবীদার ফেরাউনকে পরিশুদ্ধ করার জন্য পাঠিয়েছিলেন। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ বলেন, فَقُلْ هَلْ

لَكَ إِلَى أَنْ تَزَكَّى وَ أَهْدِيَكَ إِلَى رَبِّكَ فَتَخْشَى –
'আপনি বলুন! তোমার পরিশুদ্ধ হওয়ার আগ্রহ আছে কি? আমি তোমাকে আমার প্রতিপালকের পথে পরিচালিত করব কি? যাতে তুমি তাকে ভয় করতে পার' (নাযি'আহ ১৮-১৯)।

এ কথা অতীব সত্য যে, আত্মার পরিশুদ্ধি আল্লাহ্‌র সাহায্য ছাড়া হয় না। আত্মশুদ্ধি অর্জনের জন্য তাই আল্লাহ্‌র সাহায্য প্রার্থনা করতে হবে। সাথে সাথে নিজেদেরকেও সর্বদা সচেষ্ট থাকতে হবে। অন্তরের যাবতীয় কুটিলতাকে দূরীভূত করার চেষ্টা করতে হবে। কিন্তু যারা এর ব্যতিক্রম করে অর্থাৎ বাহ্যিক দিক দিয়ে ভাল হওয়ার চেষ্টা করলেও অন্তরে তাদের কু-বুদ্ধি, কু-মতলব জট বেঁধে থাকে আল্লাহ তাদের পরিশুদ্ধ করেন না। আল্লাহ বলেন,

إِنَّ الَّذِيْنَ يَكْتُمُوْنَ مَا أَنْزَلَ اللهُ مِنَ الْكِتَابِ وَ يَشْتَرُوْنَ بِهِ ثَمَنًا قَلِيْلاً أُولَئِكَ مَا يَأْكُلُوْنَ فِيْ بُطُوْنِهِمْ إِلاَّ النَّارَ وَلاَ يُكَلِّمُهُمُ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلاَ يُزَكِّيْهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيْمٌ–

'যারা আল্লাহ্‌র নাযিলকৃত বিষয়কে গোপন করে এবং উহাকে স্বল্প মূল্যে বিক্রয় করে, তারা তাদের পেটে আগুন বৈ অন্য কিছুই ভক্ষণ করে না। তাদের সাথে ক্বিয়ামতের দিন আল্লাহ কথা বলবেন না। দুনিয়াতেও তাদের পরিশুদ্ধ রবেন না। আর পরকালে তাদের জন্য রয়েছে কঠিন শাস্তি" (বাক্বারাহ ১৭৪)। তিনি বলেন, যে আত্মশুদ্ধি অর্জন করবে, ইহকালে সে সম্মানিত হবে এবং পরকালেও মুক্তি পাবে। আল্লাহ এ সম্পর্কে বলেন, قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَ قَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا 'সফলকাম হবে সেই যে নিজেকে পূত-পবিত্র করে নেয়। আর ব্যর্থ মনোরথ হবে সে, যে নিজেকে কলুষিত করবে' (শামস ৯-১০)।

পরিশেষে তিনি উপস্থিত শ্রোতামন্ডলীকে আল্লাহ্‌র ইবাদতের মাধ্যমে আত্মশুদ্ধি অর্জনে সচেষ্ট হওয়ার আহবান জানান এবং সকলকে ইজতেমায় প্রদত্ত দেশ ও বিদেশের বিভিন্ন মনীষীর কুরআন ও ছহীহ হাদীছ ভিত্তিক বক্তব্য নিজেদের সার্বিক জীবনে বাস্তবায়নের আহ্বান জানিয়ে তাঁর বক্তৃতা শেষ করেন।

মাওলানা শিহাবুদ্দীন সুন্নী (গাইবান্ধা)

(দরসে কুরআন)

মক্কায় অবতীর্ণ সূরা 'আছর' এর উপরে তিনি সংক্ষিপ্ত দরস পেশ করেন।

এ সূরায় আল্লাহপাক এরশাদ করেন, 'যুগ বা কালের শপথ, নিশ্চয়ই মানুষ ক্ষতির মধ্যে নিমজ্জিত। কিন্তু যারা ঈমান আনে, সৎ কাজ করে, মানুষকে সৎ পথের উপদেশ দেয় এবং যারা মানুষকে ধৈর্যের উপদেশ দেয় তারা ব্যতীত'।

অতঃপর সূরার ব্যাখ্যায় তিনি বলেন যে, আলোচ্য সূরায় আল্লাহপাক বলেছেন, জাতি-ধর্ম-বর্ণ-গোত্র নির্বিশেষে সকল মানুষই ক্ষতির মধ্যে নিমজ্জিত। কিন্তু যারা ঈমান আনে, সৎ কর্ম সম্পাদন করে, হক এর দাওয়াত দেয় এবং ধৈর্যধারণ করে তারা ব্যতীত। আন্তরিক বিশ্বাস, মৌখিক স্বীকৃতি ও কর্মে বাস্তবায়ন এ তিনের সমষ্টির নাম ঈমান। একটি বাদ দিয়ে কেউ পূর্ণ মুমিন হ'তে পারেনা। মৌখিক স্বীকৃতি ও কর্মে বাস্তবায়ন করে অন্তরে বিশ্বাস না করাটা মুনাফেকী। আন্তরিক বিশ্বাস, মৌখিক স্বীকৃতির পরে ও তদনুযায়ী কাজ না করা ফাসেকী।

ঈমানের সাথে আমল ওৎপ্রোতভাবে জড়িত। মাথার সাথে দেহের যেমন সম্পর্ক, ঈমানের সাথে আমলের তদরূপ সম্পর্ক। দেহকে বাদ দিয়ে যেমন মাথাকে কল্পনা করা যায় না, তেমনি আমল ব্যতিরেকে ঈমানকে কল্পনা করা যায়না। সুতরাং ঈমান আনার পর আমলের গুরুত্ব অপরিসীম। ছালাত, ছিয়াম, হজ্জ, যাকাত যেমন আমল, হক -এর প্রতি দাওয়াত দেয়াও তেমনি আমল। এ জন্য আল্লাহ্‌র দিকে, সত্যের দিকে মানুষকে দাওয়াত দিতে হবে। ঈমান, আমল ও দাওয়াত এসব কাজ করার জন্য ধৈর্য ধারণ করতে হবে।

সূরায় বর্ণিত চারটি গুণকে দু'টি ভাগে ভাগ করা যায় ব্যক্তিগত ও সামাজিক। ঈমান ও আমল হ'ল ব্যক্তিগত গুণাবলী। আর হক -এর প্রতি দাওয়াত এবং সে ক্ষেত্রে ধৈর্য ধারণ, এ দু'টি হ'ল সামাজিক গুণাবলী। ব্যক্তিগত গুণাবলী অর্জনে প্রতিবন্ধকতা থাকেনা। সামাজিক কর্ম দু'টি পালন করতে গেলে বিভিন্ন প্রতিবন্ধকতার শিকার হ'তে হয়। সেক্ষেত্রে ধৈর্য ধারণ আবশ্যক।

তিনি বলেন, সূরা আছর-এর তাফসীর অনুযায়ী পৃথিবীতে চার শ্রেণীর লোক পরিলক্ষিত হয়। (১) একদল হক বুঝে কিন্তু হক মোতাবেক চলে না। (২) একদল হক বুঝে হক অনুযায়ী নিজে চলে কিন্তু অন্যকে হক-এর প্রতি দাওয়াত দেয়না। (৩) আর একদল হক বুঝে, হক অনুযায়ী চলে, হক-এর দাওয়াতও দেয়, কিন্তু হক এর জন্য ত্যাগ স্বীকার করে না, হক প্রতিষ্ঠার জন্য ধৈর্য ধারণ করে না। (৪) একদল হক বুঝে, সে অনুযায়ী চলে, হক-এর দিকে আহবান করে এবং হক প্রতিষ্ঠার জন্য সংগ্রাম করে। এরাই সফলকাম ও মুক্তিপ্রাপ্ত। তিনি সকলকে সফলকামদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে দাওয়াতী মিশন অব্যাহত রাখার আহবান জানিয়ে সংক্ষিপ্ত দরস শেষ করেন।

মাওলানা আব্দুছ ছামাদ (সাতক্ষীরা)

হাম্‌দ ও ছানার পর 'আহলেহাদীছ আন্দোলনঃ মনীষীদের দৃষ্টিতে' বিষয়ে তিনি অত্যন্ত তথ্যবহুল বক্তব্য পেশ করেন। তিনি বলেন, আল্লামা খত্বীব বাগদাদী তাঁর 'তারীখে বাগদাদ' গ্রন্থে লিখেছেন, সুফিয়ান বিন উয়ায়না আহলেহাদীছদের দার্শনিক ছিলেন এবং তৎকালিন যুগে

তিনি ছিলেন অপ্রতিদ্বন্দ্বী মুহাদ্দিছ। হিজরী ২য় শতকের এই স্বনামধন্য বিদ্বান বলেন, আমাকে ইমাম আবু হানীফা আহলেহাদীছ বানিয়েছেন।

৭ম শতাব্দির বিদ্বান মুজাদ্দেদে আযম ও কামিল শায়খুল ইসলাম ইমাম ইবনে তাইমিয়া স্বীয় 'মিনহাজুস সুন্নাহ' গ্রন্থে বলেন, 'রাসূল (ছাঃ)-এর সুন্নাত হাদীছ সংগ্রহ, সংকলন ও সংরক্ষণ এবং হাদীছের বিরুদ্ধবাদীদের প্রতি বুকের তাজা খুন প্রবাহিত করার ব্যাপারে সুন্নাতের প্রতি অধিক আগ্রহান্বিত, সুন্নাত পুনরুজ্জীবিতকারী আহলেহাদীছ ছাড়া দুনিয়াতে আর দ্বিতীয় কোন দল নেই। অন্যান্য ধর্মের মধ্যে ইসলামের যে মর্যাদা, মুসলমানদের মধ্যে আহলেহাদীছদের সেই মর্যাদা'।

৫ম শতাব্দীর মুজাদ্দেদ স্পেনের গৌরব আল্লামা ইবনে হযম বলেন, 'যাদের সামান্যতম জ্ঞান আছে তাঁরা অবগত আছেন যে, আহলেহাদীছরা যে সর্বোচ্চ শ্রেষ্ঠত্বের আসনে সমাসীন তার কারণ আহলেহাদীছদের সকল রেওয়ায়াত সমূহ ছহীহ হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত। তারা নিজেদের পক্ষ থেকে কোন কথা বলেন না। তাদের ইমাম সমস্ত দোষ ত্রুটি ও পাপ থেকে মুক্ত স্বয়ং মুহাম্মাদ (ছাঃ)। আহলেহাদীছগণ তাঁর নিকট থেকেই দ্বীনের যাবতীয় খুঁটিনাটি বিষয় গ্রহণ করে থাকেন'।

ভারত গুরু শাহ ওয়ালিউল্লাহ মুহাদ্দেছ দেহলভী তাঁর 'হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগা'র মধ্যে আহলেহাদীছের পাঁচটি গুণ উল্লেখ করেছেন। তার মধ্যে প্রথম ও প্রধান হ'ল দুনিয়ার মানুষ কোন সমস্যার সমাধানের জন্য ইমামের রায় অনুসন্ধান করে, কিন্তু আহলেহাদীছগণ সকল সমস্যার সমাধানে রেওয়ায়াত (হাদীছের বর্ণনা) অনুসন্ধান করেন'। তিনি আরো বলেন, আহলেহাদীছরা সকল সমস্যায় পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের সমাধান তালাশ করে থাকেন। এটাই হ'ল আহলেহাদীছ আন্দোলনের অন্যতম সেরা বৈশিষ্ট্য।

প্রফেসর এ, কে, এম, ইয়াকুব আলী (রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়)

হাম্দ ও ছানার পর তিনি তাঁর সংক্ষিপ্ত বক্তব্যে বলেন, পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের উপর আমাদের আমল করতে হবে। কেননা রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'আমি তোমাদের নিকট দু'টি জিনিষ রেখে গেলাম। যতদিন তোমরা এ দু'টিকে আকড়ে ধরে থাকবে ততদিন বিভ্রান্ত হবে না। একটি হ'ল আল্লাহ্র কিতাব আর অন্যটি তাঁর নবীর সুন্নাত' (মুওয়াত্ত্বা)।

তিনি বলেন, তাওহীদ প্রতিষ্ঠা করার জন্য মহানবী এসেছিলেন। অথচ মানুষ আজ তাঁর শিক্ষা ভুলে গিয়ে তাওহীদকে পরিত্যাগ করে বিভিন্নভাবে শিরকে লিপ্ত হচ্ছে। তাই এ শিরক হ'তে আমাদের বাঁচতে হবে এবং মানুষকেও বাঁচাতে হবে। আর এ কাজের যুবকদেরকে সর্বাগ্রে এগিয়ে আসতে হবে।

পরিশেষে তিনি আহলেহাদীছ আন্দোলন যেন সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে এবং সব মানুষ যেন তাওহীদের অনুসারী হ'তে পারি এ কামনা করে তাঁর বক্তব্য শেষ করেন।

বিশেষ সম্মাননাঃ 'আহলেহাদীছ আন্দোলনঃ উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ; দক্ষিণ এশিয়ার প্রেক্ষিত সহ' শীর্ষক অনন্যসাধারণ ডক্টরেট থিসিসের গর্বিত সুপারভাইজার প্রফেসর এ, কে, এম, ইয়াকুব আলীকে ইজতেমা কমিটির পক্ষ হ'তে প্রকাশ্য সম্মেলনে বিশেষ সম্মাননা প্রদান করা হয়। শিরোয়ানী, টুপী, লাঠি ও এক সেট বই সম্মাননা হিসাবে প্রদান করেন 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর পক্ষ হ'তে সিনিয়র নায়েবে আমীর শায়খ আবদুছ ছামাদ সালাফী, পাকিস্তানের পক্ষ হ'তে শায়খ আবদুল্লাহ নাছের রহমানী, ভারতের পক্ষ হ'তে আবদুল মতীন সালাফী ও আবদুল ওয়াহ্হাব খিলজী এবং নেপালের পক্ষ হ'তে আবদুল্লাহ মাদানী। এই সম্মাননা প্রকারান্তরে সার্ক জামা'আতে আহলেহাদীছের পক্ষ হ'তে প্রদত্ত হ'ল। ইজতেমায় উপস্থিত লক্ষাধিক জনতা এই বিশেষ সম্মাননা ও সংবর্ধনা অনুষ্ঠান প্রত্যক্ষ করেন।

[তাবলীগী ইজতেমা '৯৮ -এর বিস্তারিত প্রতিবেদন মাসিক আত-তাহরীক মার্চ '৯৮ সংখ্যা দ্রষ্টব্য]

সেবা নার্সিং হোম

সরকার অনুমোদিত

বেসরকারী হাসপাতাল

কাদিরগঞ্জ, গ্রেটার রোড (কদমতলা), রাজশাহী।
ফোনঃ ক্লিনিক- ৭৭৬২৪৪, বাসাঃ ৭৭৩১১০/৩৭,
চেম্বারঃ ৭৭৩১১০/২৫

প্রশ্নোত্তর

-দারুল ইফতা
হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ।

প্রশ্ন (১/৯১)ঃ আমরা শুনেছি যে, খাদ্যদ্রব্যের মধ্য হ'তে ফিৎরা আদায় করতে হয়। কিন্তু দেশে প্রচলিত টাকা-পয়সা দিয়ে ফিৎরা আদায় পদ্ধতি কি শরীয়ত সম্মত?

-মতীউর রহমান
ইসলামকাঠি
তালা, সাতক্ষীরা।

উত্তরঃ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর যামানায় বাজারে মুদ্রা প্রচলিত থাকা সত্ত্বেও তিনি খাদ্যবস্তু দ্বারা ফিৎরা আদায় করেছেন। আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) বলেন, আমরা ফিৎরা প্রদান করতাম এক ছা' (আড়াই কেজি) খেজুর অথবা যব দ্বারা, পনির দ্বারা কিংবা কিশমিশ দ্বারা। অন্য বর্ণনায় এসেছে, খাদ্য দ্বারা (*বুখারী ১ম খণ্ড ২০৪ পৃঃ*)। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) স্বীয় উম্মতের ক্রীতদাস ও স্বাধীন, পুরুষ ও নারী, ছোট ও বড় সকলের উপর মাথা পিছু এক ছা' খেজুর, যব ইত্যাদি (অন্য বর্ণনায় খাদ্যবস্তু) ফিৎরার যাকাত হিসাবে ফরয করেছেন এবং তা ঈদগাহের উদ্দেশ্যে বের হওয়ার পূর্বেই আমাদেরকে আদায়ের নির্দেশ দান করেছেন (*বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/১৮১৫-১৬*)।

সুতরাং খাদ্যশস্য দ্বারা ছাদাক্বাতুল ফিৎর আদায় করাই সুন্নাত। টাকা-পয়সা দ্বারা ফিৎরা প্রদান করা সুন্নাত নয়। কারণ, রাসূল (ছাঃ) ও তাঁর ছাহাবীগণের যুগে মুদ্রা প্রচলিত থাকা সত্ত্বেও টাকা-পয়সা দিয়ে ফিৎরা দিয়েছেন বলে কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। তাছাড়া খাদ্য ও খাদ্যের মূল্য কখনো এক বস্তু নয়।

প্রশ্ন (২/৯২)ঃ 'শাওয়াল মাসের ৬টি ছিয়াম পালন করলে সারা বছরের ছিয়াম পালন করা হয়' -এর তাৎপর্য বুঝিয়ে দেওয়ার অনুরোধ রইল।

-নাঈমা
গাহোরকুট
মুরাদনগর, কুমিল্লা।

উত্তরঃ শাওয়াল মাসের ৬টি ছিয়াম পালনের ফযীলত সম্পর্কিত হাদীছটি নিম্নরূপ-

আবু আইয়ূব আনছারী (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'যে ব্যক্তি রামাযানের ছিয়াম পালন করতঃ শাওয়াল মাসের ৬টি ছিয়াম পালন করল, সে যেন সারা বছর ছিয়াম পালন করল' (*মুসলিম, মিশকাত হা/২০৪৭*)।

আল্লাহ তা'আলা এরশাদ করেন, 'যে ব্যক্তি একটি ভাল কাজ করল সে তার বিনিময়ে দশটি নেকী পেল' (আন'আম ১৬০)। ছিয়াম পালন করা নিঃসন্দেহে ভাল কাজ। সুতরাং রামাযানের ৩০টি ছিয়ামকে ১০ দিয়ে গুণ করলে (৩০×১০) =৩০০ দিন হয়। আর শাওয়াল মাসের ৬টি ছিয়ামকে ১০ দিয়ে গুণ করলে (৬×১০) =৬০ দিন হয়। মোট ৩৬০ দিন হয়। আর আরবী গণনা হিসাবে ৩৬০ দিনে এক বছর। সুতরাং রামাযানের ৩০টি ছিয়াম পালন করে যে ব্যক্তি শাওয়ালের ৬টি ছিয়াম পালন করল, সে যেন সারা বছর ছিয়াম পালন করল। এখানে উদ্দেশ্য ছওয়াব বর্ণনা করা (*ইবনুল ক্বাইয়িম, যাদুল মা'আদ ২য় খণ্ড ৮১, ৮২ পৃঃ*)।

প্রশ্ন (৩/৯৩)ঃ বর্তমান যুগে যে ব্রাশ দ্বারা দাঁত মাজা হয় এটাকি জায়েয? নবী করীম (ছাঃ) কি দিয়ে দাঁত মাজতেন? অনেকেই বলেন, রামাযান মাসে রস জাতীয় গাছের ডাল এবং পেষ্ট দ্বারা দাঁত মাজা ঠিক নয়।

-আমীনুল ইসলাম
কমরগ্রাম, বানিয়াপাড়া
জয়পুরহাট।

উত্তরঃ মিসওয়াক করা একটি গুরুত্বপূর্ণ সুন্নাত। মুখকে দুর্গন্ধ থেকে মুক্ত রাখার জন্য এবং রোগ জীবানু থেকে বাঁচানোর জন্য সর্বদা দাঁত পরিস্কার রাখা অত্যন্ত যরূরী। যেকোন পবিত্র বস্তু দ্বারা দাঁত পরিস্কার করা যায়। আয়েশা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, মিসওয়াক হচ্ছে মুখ পরিস্কারকারী এবং আল্লাহ্র সন্তুষ্টি লাভের উপায়' (*আহমাদ, নাসাঈ, মিশকাত হা/৩৮১ হাদীছ ছহীহ*)। রস জাতীয় কাঁচা বা শুকনা যে কোন ডাল অথবা যেকোন পবিত্র বস্তুর মাধ্যমে ছিয়াম অবস্থায় সকাল-বিকাল যেকোন সময় মিসওয়াক করা যায় (*বুখারী, তারজুমাতুল বাব ২৫৮ পৃঃ; নায়লুল আওত্বার 'মিসওয়াক' অধ্যায়*)। বাজারে যেসব পেষ্ট বিক্রি হয়, তার মধ্যে দাঁতের জন্য ক্ষতিকর অনেক উপাদান রয়েছে বলে জানা যায়। বাস্তবে তাই হ'লে এগুলি থেকে বিরত থাকাই উচিত। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) লম্বা ডাল দিয়ে মিসওয়াক করতেন (ঐ)।

প্রশ্ন (৪/৯৪)ঃ জনৈক ব্যক্তি স্বপ্নে প্রাপ্ত ঔষধের নামে স্বল্প মূল্যের বিনিময়ে যেকোন রোগ নিরাময় হবে বলে ঔষধ দেয়। এইভাবে ঔষধ দেওয়া ও রুগী হিসাবে তার ঔষধ খাওয়া জায়েয হবে কি? ঈদের মাঠে ইমাম ছাহেবকে কি তিন থাক বিশিষ্ট মিম্বরে দাঁড়িয়ে খুৎবা দিতে হবে? সঠিক উত্তর দানে বাধিত করবেন।

-মুহাম্মাদ আবদুল লতীফ
রাজপুর, কলারোয়া
সাতক্ষীরা।

উত্তরঃ বুখারী শরীফে বর্ণিত আছে আল্লাহ তা'আলা রোগ নাযিল করেছেন এবং তার ঔষধও নাযিল করেছেন। মুসলিম শরীফের এক বর্ণনায় এসেছে প্রত্যেক রোগের ঔষধ আছে। রোগ অনুযায়ী ঔষধ পড়লেই আল্লাহ হুকুমে আরোগ্য হয়ে যায় (*মিশকাত, 'ঝাড় ফুঁক ও চিকিৎসা অধ্যায়)*। এক্ষণে স্বপ্ন যোগে ঔষধ পাওয়া ও স্বল্পমূল্যে তা দেওয়া বিক্রেতার কৌশল মাত্র। যা স্পষ্ট ধোকাবাজি। গ্রাহক বৃদ্ধির জন্য এসব বলা হয়ে থাকে। কুরআন ও ছহীহ হাদীছে এরূপভাবে স্বপ্নে ঔষধ পাওয়ার কোন নযীর নেই। রাসূলে করীম (ছাঃ) ছাহাবায়ে কেরাম, তাবেঈনে এযাম ও দ্বীনের ইমামগণ এরূপ কোন বর্ণনা দেন নাই। অনেক সময় এগুলি পীরদের কেরামতি যাহিরের জন্য করা হয়। এ সব জানতে পারলে তাদের ঔষধ ক্রয় করাই জায়েয নয়। কারণ, এতে বিদ'আতীদের সাহায্য করা হয়।

ঈদের মাঠে মিম্বরে দাঁড়িয়ে খুৎবা দেওয়ার কোন প্রমাণ নেই। রাসূল (ছাঃ) মিম্বর ছাড়াই মাটির উপরে দাঁড়িয়ে ঈদায়েনের খুৎবা দিতেন। তাই ইমাম বুখারী (রহঃ) অধ্যায় বিন্যাস করেছেন 'বিনা মিম্বরে ঈদের মাঠে যাওয়ার' বিবরণ। সেখানে আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) থেকে একটি দীর্ঘ হাদীছ বর্ণনা করেছেন (*বুখারী 'কিতাবুল ঈদায়েন' হাদীছ নং ৯৫৬ ফাৎহুল বারী ২য় খণ্ড, ৪৪৮/৪৯ পৃঃ)*।

প্রশ্ন (৫/৯৫)ঃ অন্ধ ব্যক্তির ইমামতি জায়েয হবে কি? ছহীহ হাদীছ ভিত্তিক জওয়াব দানে বাধিত করবেন।

-নূর হুসাইন
সাহেব বাজার, রাজশাহী।

উত্তরঃ অন্ধ ব্যক্তি ইমামতি করতে পারেন। হযরত আনাস (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) অন্ধ ছাহাবী আবদুল্লাহ ইবনে উম্মে মাকতূম (রাঃ)-কে ইমাম বানিয়েছিলেন। তিনি লোকেদের ইমামতি করেছেন *(আবুদাউদ হা/৬০৯; মিশকাত হা/১১২১ হাদীছ ছহীহ)*।

উল্লেখ্য যে, সঊদী আরবের প্রাক্তন গ্রাণ্ড মুফতী বুখারী শরীফের হাফেয ও ভাষ্যকার শায়খ আবদুল আযীয বিন আবদুল্লাহ বিন বায (রহঃ) অন্ধ ছিলেন। তিনি রিয়াযে 'দারুল ইফতা'র মসজিদে ইমামতি করতেন। বর্তমান প্রধান মুফতী আবদুল আযীয বিন আব্দুল্লাহ আলে শায়খও অন্ধ। তিনি বহুবার আরাফার 'মসজিদে নামেরা'য় হজ্জ-এর খুৎবা দিয়েছেন এবং যোহর ও আছর ছালাতের ইমামতি করেছেন। তাছাড়া রিয়াযে অবস্থিত 'মসজিদে দিরাহ'তেও তিনি নির্দিষ্টভাবে ইমামতি করেন।

প্রশ্ন (৬/৯৬)ঃ আমরা জানি যে, যোহরের ফরয ছালাতের পর দু'রাক'আত সুন্নাত পড়তে হয়। কিন্তু অনেককে চার রাক'আত পড়তে দেখা যায়। কোন্‌টি সঠিক জানিয়ে বাধিত করবেন।

-আবদুল মুমিন
ঝিকরগাছা, যশোর।

উত্তরঃ যোহরের ফরয ছালাতের পর দু'রাক'আত ও চার রাক'আত সুন্নাত উভয়ই জায়েয। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, যে ব্যক্তি দিন-রাতে বার রাক'আত (সুন্নাত) ছালাত আদায় করবে জান্নাতে তার জন্য একটি ঘর নির্মাণ করা হবে। যোহরের পূর্বে চার ও পরে দু'রাক'আত...*(তিরমিযী ২/২৭৪; মিশকাত হা/১১৫৯ সনদ ছহীহ)*।

অন্যত্র রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'যে ব্যক্তি যোহরের পূর্বে ও পরে চার রাক'আত করে ছালাত আদায় করবে, আল্লাহ তার জন্য জাহান্নাম হারাম করে দিবেন' *(আহমাদ, তিরমিযী ২/২৯২, ৪২৭ পৃঃ সনদ ছহীহ, মিশকাত হা/১১৬৭)*।

প্রশ্ন (৭/৯৭)ঃ 'আত-তাহরীক' শব্দের অর্থ কি? বিস্তারিত জানিয়ে বাধিত করবেন।

-মুহাম্মাদ আবুল কাসেম
বাজেধনেশ্বর, আত্রাই, নওগাঁ।

উত্তরঃ 'তাহরীক' (تحريك) অর্থ আন্দোলন। 'আত-তাহরীক' অর্থ বিশেষ আন্দোলন। ইংরেজীতে যাকে বলা যাবে THE MOVEMENT অথবা THAT VERY MOVEMENT. অতএব 'আত-তাহরীক' বিশেষ একটি আন্দোলনের লক্ষ্যে আত্মপ্রকাশ করেছে। সে আন্দোলন পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছ ভিত্তিক জীবন গড়ার আন্দোলন। সে আন্দোলন আল্লাহ প্রেরিত সর্বশেষ অহি ভিত্তিক সমাজ গড়ার আন্দোলন। সে আন্দোলন বিশ্ব মানবতার প্রকৃত মুক্তি আন্দোলন। যে মানুষ নিজের জ্ঞানকে অহি-র জ্ঞানের সামনে বিনা দ্বিধায় সমর্পণ করে দিবে, যে মানুষ পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের নির্দেশকে সানন্দে মাথা পেতে মেনে নিবে, দুনিয়ার চাইতে আখেরাতকে সর্বক্ষেত্রে অগ্রাধিকার দিবে 'আত-তাহরীক' ইনশাআল্লাহ তাদেরই মুখপত্র।

প্রশ্ন (৮/৯৮)ঃ অসুস্থ হ'লে সূরা নাস ও ফালাক্ব পড়ে ঝাড়-ফুঁক করা যাবে কি? ছহীহ হাদীছের আলোকে উত্তর দানে বাধিত করবেন।

-আবদুল জাব্বার
নাড়ুয়ামালা, গাবতলী, বগুড়া।

উত্তরঃ অসুস্থ ব্যক্তিকে বা নিজে অসুস্থ হ'লে উল্লেখিত

সূরাদ্বয় পড়ে ঝাড়-ফুঁক করা যাবে।

হযরত আয়েশা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, 'নবী করীম (ছাঃ) যখন অসুস্থ হ'তেন তখন মু'আব্বাযাতাইন (সূরা নাস ও ফালাক্ব) পড়ে স্বীয় হস্তদ্বয়ে ফুঁক দিয়ে শরীরে বুলিয়ে দিতেন। তিনি যে অসুখে ইন্তিকাল করেছিলেন আমিও উক্ত সূরাদ্বয় দ্বারা ফুঁ দিয়ে আল্লাহ্র রাসূলের হাত দিয়ে বুলিয়ে দিতাম (*বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/১৫৩২*)। মুসলিম শরীফের বর্ণনায় রয়েছে, আয়েশা (রাঃ) বলেন, পরিবারের কেউ অসুস্থ হ'লে নবী করীম (ছাঃ) মু'আব্বাযাতাইন পড়ে ফুঁক দিতেন।

প্রশ্ন (৯/৯৯)ঃ বাংলাদেশে আহলেহাদীছ ও হানাফী ভাইদের এশা-র ছালাতের সময়ের বেশ পার্থক্য দেখা যায়। আহলেহাদীছ মসজিদে এশা-র ছালাত দেরী করে পড়া হয়। আর হানাফী মসজিদে তাড়াতাড়ি পড়া হয়। কোন্‌টি সঠিক? কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে জানতে চাই।

-হুমায়ূন কবীর
ডুগডুগী হাট
ঘোড়াঘাট, দিনাজপুর।

উত্তরঃ ছালাতুল এশা-র সময় আরম্ভ হয় পশ্চিম আকাশের লাল আভা শেষ হওয়ার পর থেকে (অর্থাৎ মাগরিবের প্রায় দেড় ঘন্টা পর)। আর শেষ সময় হ'ল মধ্যরাত পর্যন্ত (*মুসলিম, মিশকাত হা/৫৮১*)।

এক্ষণে যদি কেউ সময় হওয়ার সাথে সাথে ছালাত আদায় করেন তাহ'লে তার ছালাত আদায় হয়ে যাবে। তবে আহলেহাদীছগণের দেরী করে আদায় করার কারণ হ'ল- আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) ছালাতুল এশা দেরী করে আদায়ের জন্য উৎসাহ প্রদান করেছেন। তিনি বলেন, 'আমার উম্মতের উপর যদি আমি কঠিন মনে না করতাম তাহ'লে তাদেরকে রাতের এক তৃতীয়াংশ অথবা অর্ধেক রাত পর্যন্ত এশা-র ছালাত বিলম্ব করে পড়ার নির্দেশ দিতাম (*আহমাদ, তিরমিযী, ইবনু মাজাহ, মিশকাত হা/৬১১ সনদ ছহীহ*)।

উক্ত হাদীছটির দিকে লক্ষ্য করে আহলেহাদীছগণ কিছুটা দেরী করে এশা-র ছালাত আদায় করে থাকেন।

প্রশ্ন (১০/১০০)ঃ জনৈক ইমামকে খুৎবা দিতে শুনেছি যে, 'সপ্তাহের প্রতি বৃহস্পতিবার বাদ আছর সকল মৃত মানুষের 'রূহ' দুনিয়াতে ফিরে আসে এবং নিজ নিজ ওয়ারিছগণের নিকট হ'তে ছাদাক্বা, দান-খয়রাত ইত্যাদির ছওয়াব নিয়ে শুক্রবার জুম'আর ছালাতের পর পুনরায় নিজ নিজ কবরে ফিরে যায়'। কথাটির সত্যতা জানিয়ে বাধিত করবেন।

-ইয়াকুব আলী (প্রধান দপ্তরী)
শিবদেবচর দ্বিমুখী উচ্চ বিদ্যালয়
পোঃ পাওটানা হাট
পীরগাছা, রংপুর।

উত্তরঃ উপরোল্লেখিত কথাটি সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন। কুরআন-হাদীছের সাথে এ বক্তব্যের কোন সম্পর্ক নেই। উক্ত বক্তব্যের উপর বিশ্বাস পোষণ করা গুরুতর অন্যায়।

আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'তারা কি প্রত্যক্ষ করেনা যে, তাদের পূর্বে আমি কত সম্প্রদায়কে ধ্বংস করেছি, যারা তাদের মধ্যে আর ফিরে আসেনি' (ইয়াসীন ৩১)। এ আয়াত স্পষ্ট প্রমাণ করে যে, রূহ ফিরে আসে না। সুতরাং এ ধরনের বিশ্বাস পোষণ করা কুরআন-হাদীছের সরাসরি বিরোধিতার শামিল।

প্রশ্ন (১১/১০১)ঃ আমাদের মসজিদে তাশাহহুদ পড়ার সময় আঙ্গুল দ্বারা সর্বদা ইশারা করা নিয়ে বিতর্কের সৃষ্টি হচ্ছে। কেউ এটিকে নতুন একটি বিদ'আত বলছেন। হাদীছে থাকলে দয়া করে হাদীছটি অনুবাদ করে আত-তাহরীকে প্রকাশ করে বাধিত করবেন।

-আহমাদ আলী
দাউদপুর রোড
নবাবগঞ্জ, দিনাজপুর।

উত্তরঃ তাশাহহুদের সময় আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) শাহাদত অঙ্গুলি দ্বারা তাশাহহুদের শুরু থেকে সালাম ফিরানো পর্যন্ত ইশারা করতেন। এটিই সুন্নাতী তরীকা। আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) বলেন যে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) যখন তাশাহহুদের বৈঠকে বসতেন, তখন বাম হাত বাম হাঁটুর উপরে এবং ডান হাত ডান হাঁটুর উপরে রাখতেন। এ সময় ডান হাতটি ৫৩-এর ন্যায় মুষ্টিবদ্ধ করতেন ও শাহাদাত অঙ্গুলি দ্বারা ইশারা করতেন'। এভাবে তিনি ইশারার মাধ্যমে দো'আ করতে থাকতেন। এই সময় বাম হাতের আঙ্গুলগুলো স্বাভাবিকভাবে ছড়ানো থাকত' (*মুসলিম, মিশকাত হা/৯০৬-৭, 'তাশাহহুদ' অনুচ্ছেদ*)। ওয়ায়েল বিন হুজর (রাঃ) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে আঙ্গুল নাড়াতে ও দো'আ পাঠ করতে দেখেছি' (*আবুদাউদ, দারেমী, নাসাঈ, মিশকাত হা/৯১১ সনদ ছহীহ*)। অবশ্য এমন দ্রুত আঙ্গুল উঠানামা করা উচিত নয়, যাতে পাশের মুছল্লীর মনোযোগ আকৃষ্ট হয়। অতঃপর লা-ইলাহা বলে আঙ্গুল উঠানো ও ইল্লাল্লাহ বলে নামানোর প্রচলিত নিয়মটি ভিত্তিহীন (*আলবানী, ছিফাতু ছালাতিন নবী, পৃঃ ১৪০*)।

প্রশ্ন (১২/১০২)ঃ একটি পোষ্টারে কা'বা শরীফের ছবি এবং তৎসঙ্গে কিছু মুছল্লীর ছবি রয়েছে। এরূপ পোষ্টার মসজিদে টাঙ্গিয়ে ছালাত আদায় করা জায়েয হবে কি?

-রশীদুল ইসলাম
বিনাই মোল্লাপাড়া
পোঃ কানাইহাট
ক্ষেতলাল, জয়পুরহাট।

উত্তরঃ যে পোষ্টারে কোন প্রাণীর ছবি থাকবে সে পোষ্টার মসজিদে টাঙ্গিয়ে ছালাত আদায় করা জায়েয হবে না *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৪৪৯৮ 'ছবি' অনুচ্ছেদ)*। এমনকি নকশাওয়ালা পর্দা বা পোষ্টার সরিয়ে ছালাত আদায় করা উচিত। যেমন আনাস (রাঃ) বলেন, আয়েশা (রাঃ)-এর একটি নকশা করা পর্দার কাপড় ছিল, যা দ্বারা তিনি ঘরের একদিকে পর্দা করেছিলেন। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আয়েশাকে বললেন, তোমার এ চাদর সরিয়ে নাও। এর ছবি আমার ছালাতের মধ্যে ভেসে উঠছে' *(বুখারী, মিশকাত ৭২ পৃঃ হা/৭৫৮ 'সতর' অনুচ্ছেদ)*। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন যে, ঐ ঘরে ফেরেশতা প্রবেশ করে না যে ঘরে (প্রাণীর) ছবি থাকে' *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৪৪৯২ 'ছবি' অনুচ্ছেদ)*।

প্রশ্ন (১৩/১০৩)ঃ আমার ১০ বিঘা জমি আছে। কিন্তু আমি ১০ হাযার টাকা ঋণী আছি। এমতাবস্থায় জমির উৎপাদিত ধানের ওশর না দিয়ে ঋণ পরিশোধ করা যাবে কি-না?

-নূরুল ইসলাম
খোলাবাড়িয়া দাখিল মাদরাসা
পোঃ খোলাবাড়িয়া
থানা+যেলাঃ নাটোর।

উত্তরঃ জমির শস্য নির্ধারিত পরিমাণে পৌঁছলে তার ওশর বের করা ফরয (আন'আম ১৪১)। ইবনে ওমর (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'যে শস্য আকাশের পানি ও বন্যার পানির মাধ্যমে উৎপন্ন হবে তাতে ১০ ভাগের এক ভাগ এবং যে শস্য সেচের মাধ্যমে হয়, তাতে বিশ ভাগের এক ভাগ (নিছফে ওশর) যাকাত হিসাবে দিতে হবে *(মুসলিম, মিশকাত ১৫৯ পৃঃ)*।

প্রকাশ থাকে যে, সূরা তওবাহ ৬০ আয়াতে ঋণগ্রস্ত ব্যক্তিকে যাকাত প্রদানের যে নির্দেশ দেয়া হয়েছে, সে ঋণগ্রস্ত ব্যক্তি এমন হবে, যার কোন সম্পদ নেই *(তাফসীর ইবনে কাছীর ২/৩৮০)*। কাজেই নিছাব পরিমাণ সম্পদের মালিক অথচ ঋণগ্রস্ত এমন ব্যক্তিকে যাকাত বা ওশর বের করতে হবে না এ ধারণা ঠিক নয়।

প্রশ্ন (১৪/১০৪)ঃ আমার আম্মা অশিক্ষিতা। বয়স ৪০ এর উপরে। ছালাতের সব সূরা ও দো'আ তার জানা নেই। শত চেষ্টার পরও মুখস্থ হয় না। এক্ষণে তার জানা অল্প সূরা ও দো'আর মাধ্যমে ছালাত হবে কি?

-রবী'উল ইসলাম
গ্রাম+পোঃ হলিদাগাছী
চারঘাট, রাজশাহী।

উত্তরঃ প্রত্যেক মুছল্লীকে ছালাতের জন্য প্রয়োজনীয় সূরা ও দো'আ মুখস্থ করা যরূরী। তবে কোন মুছল্লী সক্ষম না হ'লে যে কোন সূরা বা দো'আ পড়ে ছালাত আদায় করতে পারে। আব্দুল্লাহ ইবনে আবী আওফা (রাঃ) বলেন, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নিকট এসে বলল, আমি কুরআন থেকে কিছু পড়তে সক্ষম নই। অতএব আমাকে এমন কিছু শিখিয়ে দিন যা আমার জন্য যথেষ্ট হবে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, তুমি বল-

سُبْحَانَ اللهِ وَالْحَمْدُ للهِ وَلاَ إِلهَ إِلاَّ اللهُ وَاللهُ أَكْبَرُ وَلاَحَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إِلاَّ بِاللهِ -

উচ্চারণঃ *সুবহা-নাল্লা-হি ওয়ালহামদু লিল্লা-হি ওয়া লা ইলা-হা ইল্লাল্লা-হু ওয়াল্লা-হু আকবার। ওয়া লা হাওলা ওয়া লা কুউওয়াতা ইল্লা বিল্লা-হ।*

লোকটি বললঃ হে রাসূল! এগুলি তো আল্লাহ্র জন্য হ'ল। এতে আমার জন্য কি আছে? রাসূল (ছাঃ) বললেনঃ তুমি পড়বে, اَللَّهُمَّ ارْحَمْنِىْ وَعَافِنِىْ وَاهْدِنِىْ وَارْزُقْنِىْ *'আল্লা-হুম্মার হামনী ওয়া 'আ-ফিনী ওয়াহ্দেনী ওয়ারযুক্বনী'*।

অর্থঃ 'হে আল্লাহ আপনি আমাকে অনুগ্রহ করুন, আমাকে আরোগ্য করুন, আমাকে সুপথ প্রদর্শন করুন ও আমাকে রূযী দান করুন' *(আবুদাঊদ, সনদ হাসান, মিশকাত হা/৮৫৮ 'ছালাতে ক্বিরাআত' অনুচ্ছেদ)*।

অত্র হাদীছ প্রমাণ করে যে, কুরআনের কিছু অংশ পাঠ করাই ছালাতের জন্য যথেষ্ট।

প্রশ্ন (১৫/১০৫)ঃ মুসলমান ছেলেদের খাৎনা করতে হয় কেন? মেয়েদের এর বিপরীতে কি করতে হবে? উত্তর দানে বাধিত করবেন।

-বেদেনা খাতুন
গ্রামঃ বাখড়া মোলামগাড়ী
কালাই, জয়পুরহাট।

উত্তরঃ মুসলিম ছেলেদের খাৎনা করা সুন্নাত। যা হযরত ইবরাহীম (আঃ) থেকে চলে আসছে। আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, ইবরাহীম

(আঃ) ৮০ বৎসর বয়সে খাৎনা করেছিলেন (*বুখারী, মুসলিম, নায়ল ১ম খণ্ড 'খাৎনা' অধ্যায় ১১১ পৃঃ*)।

পুরুষের খাৎনার বিপরীতে মেয়েদের কিছুই করতে হবে না। উল্লেখ্য যে, 'মেয়েদের খাৎনা করা তাদের জন্য সম্মানের বিষয়' বলে আহমাদ ও বায়হাক্বীতে শাদ্দাদ বিন আউস (রাঃ) হ'তে যে মরফূ রেওয়ায়াতটি এসেছে, তার সকল সূত্রই যঈফ। ইবনু আব্দিল বার্র বলেন, খাৎনা কেবল পুরুষের জন্যই এবং এ ব্যাপারে মুসলিম উম্মাহ্র ঐক্যমত প্রতিষ্ঠিত রয়েছে' (*আওনুল মা'বূদ ১৪/১৮৫, ১৯০; আবুদাঊদ 'খাৎনা' অধ্যায় হা/৫২৪৯-এর ব্যাখ্যা*)। মুসলমান ছেলেদের খাৎনা এজন্য করতে হয় যে, প্রথমতঃ এটি অন্যদের থেকে পার্থক্যকারী একটি গুরুত্বপূর্ণ সুন্নাত। দ্বিতীয়তঃ চিকিৎসা বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে পুরুষের জন্য এর উপকারিতা ও কল্যাণকারিতা সুদূর প্রসারী। পক্ষান্তরে মেয়েদের জন্য খাৎনা না করার মধ্যে পুরুষ ও নারী উভয়ের জন্য কল্যাণ রয়েছে এবং রাসূল (ছাঃ) এটা করতে নিষেধ করেছেন (*আবুদাঊদ হা/৫২৪৯*)।

প্রশ্ন (১৬/১০৬)ঃ শহীদদের স্মরণে 'শহীদ মিনার' নির্মাণ করা যাবে কি?

-শাহিনুর
নন্দলালপুর, কুমারখালী
কুষ্টিয়া।

উত্তরঃ শহীদদের স্মরণে মিনার বা সৌধ নির্মাণ শরীয়ত সম্মত নয়। এটি খৃষ্টানদের অনুকরণ মাত্র। ইয়াহুদ-নাছারাগণ তাদের কোন সৎ লোক মৃত্যুবরণ করলে মৃত ব্যক্তির সম্মানার্থে এবং তাদেরকে স্মরণ করার জন্য তার কবরের উপরে সিজদার স্থান নির্মাণ করত। সেখানে তাদের মূর্তি নির্মাণ করা হ'ত। আতা ইবনে ইয়াসার (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'হে আল্লাহ! তুমি আমার কবরকে ইবাদতের স্থান কর না। আল্লাহ ঐ সম্প্রদায়ের উপরে ক্রোধান্বিত হয়েছেন যারা তাদের নবীদের কবরকে সিজদার স্থানে পরিণত করেছে। -*মুওয়াত্ত্বা, মিশকাত হা/৭৫০ হাদীছ ছহীহ*। জুনদুব বিন আবদুল্লাহ (রাঃ) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে বলতে শুনেছি যে, সাবধান! তোমাদের পূর্বের লোকেরা তাদের নবী ও সৎ লোকদের কবরকে সিজদার স্থান হিসাবে গণ্য করত। সাবধান! তোমরা কবরকে সিজদার স্থান করোনা। আমি তোমাদের এরূপ করা থেকে নিষেধ করছি' (*মুসলিম, মিশকাত হা/৭১৩ 'ছালাতের স্থান' অনুচ্ছেদ*)। অতএব মৃত ব্যক্তির সম্মান ও স্মৃতির জন্য শহীদ মিনার বা অন্য কিছু নির্মাণ করা নিষিদ্ধ, যা 'শিরকে আকবার' বা বড় শিরক হিসাবে গণ্য।

প্রশ্ন (১৭/১০৭)ঃ হাঁস-মুরগী বা যে কোন হালাল পশু যবেহ করার নির্দিষ্ট কোন দো'আ আছে কি?

-আব্দুল জাব্বার
ঠিকানা বিহীন

উত্তরঃ হাঁস-মুরগী বা যেকোন হালাল পশু যবেহ করার দো'আ হচ্ছে- بِسْمِ اللهِ وَاللهُ أَكْبَرُ অথবা শুধু بِسْمِ اللهِ । আনাস (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এক ঈদে ধূসর বর্ণের শিংওয়ালা দুম্বা কুরবানী করলেন। (যবেহ করার সময়) তিনি বললেন, 'বিসমিল্লা-হি ওয়াল্লা-হু আকবার' (*বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/১৩৬৯*)। জুনদুব ইবনে আব্দুল্লাহ (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) কুরবানীর ছালাত আদায় করলেন এবং বললেন, যে ছালাত আদায়ের পূর্বে কুরবানী করেছে সে যেন আর একটি কুরবানী করে। আর যে কুরবানী করেনি, সে যেন 'বিসমিল্লা-হ' বলে কুরবানী করে (*বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/১৩৮৯*)।

প্রশ্ন (১৮/১০৮)ঃ ইসলামে নারী নেতৃত্ব বৈধ কি-না? জনাব আসাদুয্যামান রচিত 'স্বাধীনতা সংগ্রামের পটভূমি' বইয়ের ৮৩ পৃষ্ঠায় অনেক আলেমের উদ্ধৃতি দিয়ে নারী নেতৃত্বকে বৈধ করা হয়েছে। বিষয়টি জানিয়ে বাধিত করবেন।

-ইদরীস আলী
উজান খলসী
দুর্গাপুর, রাজশাহী।

উত্তরঃ ইসলামে নারী নেতৃত্ব বৈধ নয়। আল্লাহ বলেন, 'পুরুষ জাতি নারী জাতির উপরে কর্তৃত্বশীল' (নিসা ৩৪)। আবু বাকরাহ (রাঃ) বলেন, যখন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) অবগত হ'লেন যে, ইরানের জনগণ কিসরার কন্যাকে তাদের নেত্রী নির্বাচিত করেছে। তখন তিনি বললেনঃ ঐ জাতি কখনও সফলকাম হ'তে পারে না, যারা নারীকে তাদের নেত্রী নির্বাচিত করে (*বুখারী, মিশকাত ৩২১ পৃঃ 'শাসন ও বিচার' অধ্যায় হা/৩৬৯৩*)।

প্রশ্ন (১৯/১০৯)ঃ আমাদের ছাগলের একটি বাচ্চা হয়েছিল। কিন্তু বাচ্চাটি তার মায়ের দুধ পায়নি। এমনকি অন্য কোন ছাগল বা গরুর দুধ না পাওয়ায় অবশেষে আমার নিজের বুকের দুধ থেকে কিছু দুধ বাচ্চাটিকে খাওয়াই। এ ঘটনা আমার স্বামী জানতে পেরে আমাকে গালমন্দ করেন এবং বলেন যে, এ ছাগলের গোস্ত মানুষের জন্য হারাম। আমি জানতে চাই এরূপ কাজ জায়েয কি? এবং এই ছাগলের গোস্ত খাওয়া জায়েয হবে কি?

-জিনিয়া আফরোয

প্রযত্নেঃ মীযানুর রহমান
ফুলবাড়িয়া হাট,
কাথুলী, মেহেরপুর।

উত্তরঃ মানুষের দুধ পশুর খাদ্য নয়। আল্লাহ তা'আলা বিভিন্ন ভাবে পশুর খাদ্যের ব্যবস্থা রেখেছেন। তবে যদি বিশেষ প্রয়োজনে মানুষের দুধ পশুকে পান করানো হয়, তবে উক্ত পশুর গোস্ত মানুষের জন্য হারাম হবে না। কারণ, হালাল-হারাম মেনে চলার হুকুম শুধুমাত্র মানুষের উপর অবধারিত করা হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা শুধুমাত্র মানুষকে উদ্দেশ্য করে বলেছেন, 'রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তোমাদের যা দিয়েছেন তা গ্রহণ কর আর যা নিষেধ করেন তা হ'তে বিরত থাক' (হাশর ৭)। পশুকে এরূপ কোন আদেশ করা হয়নি। কাজেই কোন মহিলা যদি কোন পশুকে তার নিজ বুকের দুধ পান করান, তাহ'লে ঐ পশুর গোস্ত মানুষের জন্য হারাম হবে না।

প্রশ্ন (২০/১১০)ঃ ফজরের ছালাতের সময় যখন ইমাম ছাহেব জামা'আত আরম্ভ করেন, তখন আমাদের হানাফী ভাইগণ সুন্নাত পড়তে থাকেন। তাদেরকে ছালাত ছেড়ে দেওয়ার কথা বলা হ'লে তারা দলীল চান। তাই আপনাদের শরণাপন্ন হ'লাম। দলীল প্রদান করে বাধিত করবেন।

-আতীকুর রহমান
সাহিত্য পাঠাগার সম্পাদক
বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ
কুমিল্লা সাংগঠনিক যেলা।

উত্তরঃ ফরয ছালাতের জন্য ইক্বামত দেওয়ার পরে অন্য কোন ছালাত নেই। আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'যখন ফরয ছালাতের জন্য ইক্বামত দেওয়া হয়, তখন ফরয ব্যতীত অন্য কোন ছালাত নেই' (*মুসলিম, মিশকাত ৯৬ পৃঃ হা/১০৫৮ 'জামা'আত ও উহার ফযীলত' অনুচ্ছেদ)*। অতএব ফজরের জামা'আত চলাকালে সুন্নাত পড়া যাবে না। বরং সুন্নাত শুরু করে থাকলে তা ছেড়ে দিয়ে জামা'আতে শামিল হ'তে হবে।

প্রশ্ন (২১/১১১)ঃ স্ত্রী তার স্বামীর নাম ধরে ডাকতে পারবে কি? কুরআন ও হাদীছের আলোকে জানতে চাই।

-অধ্যাপক আবুল কাসেম
গ্রাম+পোঃ বাটরা
কলারোয়া, সাতক্ষীরা।

উত্তরঃ স্ত্রী তার স্বামীর নাম ধরে ডাকতে পারবে। যা একাধিক ছহীহ হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত। আয়েশা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আমাকে বললেন, আয়েশা! যখন তুমি আমার উপর সন্তুষ্ট থাক তখন আমি বুঝতে পারি এবং তোমার অসন্তুষ্ট থাকাও আমি অনুভব করতে পারি। আমি বললাম, আপনি কেমন করে বুঝতে পারেন? রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, তুমি যখন আমার উপর খুশী থাক তখন বল, মুহাম্মাদের রব-এর কসম। আর যখন অসন্তুষ্ট থাক তখন বল, ইবরাহীমের রব-এর কসম। আয়েশা (রাঃ) বললেন, জি হ্যাঁ। আল্লাহ্র কসম হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)! ক্রোধ ব্যতীত আমি কখনই আপনার নাম ছাড়ি না' (*বুখারী, মুসলিম, মিশকাত ২৮০)*।

একদা ইবরাহীম (আঃ)-এর স্ত্রী হাজেরা পিছন হ'তে বার বার ইবরাহীম (আঃ)-এর নাম ধরে ডেকেছিলেন (*বুখারী ১ম খণ্ড ৪৭৪ পৃঃ)*।

প্রশ্ন (২২/১১২)ঃ আমরা এক ছা' করে চাউল ফিৎরা প্রদান করে থাকি। এর দলীল জানতে চাই।

-আবদুল জাব্বার
ঝাপাঘাটা, কলারোয়া
সাতক্ষীরা।

উত্তরঃ হাদীছে ফিৎরা প্রদানের ব্যাপারে বিভিন্ন শস্যের নাম উল্লেখ রয়েছে। এতদ্ব্যতীত আমভাবে 'ত্বা'আম' এর কথা এসেছে। যার অর্থ হচ্ছে খাদ্য। যা দ্বারা পৃথিবীর সকল খাদ্যশস্যকে বুঝানো হয়েছে। চাউলের কথা সরাসরি উল্লেখ না থাকলেও চাউল ত্বা'আমের অন্তর্ভুক্ত। আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) বলেন, আমরা এক ছা' করে ত্বা'আম প্রদান করতাম অথবা জব, খেজুর, পনির ও কিশমিশ থেকে এক ছা' করে প্রদান করতাম' (*বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/১৮১৬)*। অতএব এদেশের প্রধান খাদ্য হিসাবে চাউল দ্বারা ফিৎরা প্রদান করাই শরীয়ত সম্মত।

প্রশ্ন (২৩/১১৩)ঃ চার রাক'আত অথবা তিন রাক'আত বিশিষ্ট ছালাতে ভুল করে চার-এর স্থলে তিন এবং তিন-এর স্থলে চার রাক'আত পড়ে সালাম ফিরালে কি করণীয় রয়েছে?

-আবদুল হান্নান
কৃষ্ণপুর
পোঃ ধোপাঘাটা
মোহনপুর, রাজশাহী।

উত্তরঃ রাক'আত কম হ'লে সালামের পর বাকী রাক'আত আদায় করতঃ সহো সিজদা করে পুনরায় সালাম ফিরাবে। আর রাক'আত বেশী হ'লে দু'টি সহো সিজদা করবে। আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'যখন তোমাদের কারো ছালাতের

মধ্যে সন্দেহ হয় এবং তিন কি চার তা ঠিক করতে না পারে তখন সে যেন সন্দেহ পরিত্যাগ করে এবং নিশ্চিতভাবে রাক'আত নির্ধারণ করে নেয়। অতঃপর সালাম ফিরানোর পূর্বে দু'টি সিজদা করে। যদি সে বাস্তবে পাঁচ রাক'আত পড়ে থাকে তাহ'লে এ দুই সিজদা তার ছালাতকে জোড়ে পরিণত করবে। আর যদি সে চার রাক'আত পড়ে থাকে তাহ'লে এ দুই সিজদা শয়তানের ধিক্কার স্বরূপ হবে *(মুসলিম, মিশকাত হা/১০১৫)*। আবদুল্লাহ ইবনে মাসঊদ (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) একবার যোহরের ছালাত পাঁচ রাক'আত পড়লেন। তাঁকে জিজ্ঞেস করা হ'ল- যোহরের ছালাত কি এক রাক'আত বৃদ্ধি করা হয়েছে? তিনি বললেন, এ আবার কি? ছাহাবীগণ বললেন, আপনি যে পাঁচ রাক'আত ছালাত আদায় করলেন। একথা শুনে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) সালামের পর দু'টি সিজদা করলেন। অপর বর্ণনায় আছে তিনি বলেন, আমিও তোমাদের ন্যায় একজন মানুষ। আমিও ভুলে থাকি যেমন তোমরা ভুলে থাক। সুতরাং আমি যখন কিছু ভুলে যাই তোমরা তখন স্মরণ করিয়ে দিয়ো। অতঃপর তিনি বললেন, তোমাদের কারো ছালাতের মধ্যে সন্দেহ হ'লে সে যেন সত্যে উপনীত হওয়ার চেষ্টা করে এবং চেষ্টার উপর ভিত্তি করে বাকী ছালাত সমাপ্ত করে। অতঃপর সালাম ফিরায় ও দু'টি সহো সিজদা করে *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/১০১৬)*।

প্রশ্ন (২৪/১১৪)ঃ আমাদের একটা সমিতি আছে। তা থেকে টাকা লীজ (ইজারা) দেওয়া হয়। দু'হাযার টাকায় তিন হাযার দু'শত টাকা নেওয়া হয়। সপ্তাহে ৫০ টাকা করে কিস্তিতে টাকা পরিশোধ করতে হয়। এতে ৩২০০ টাকা আদায় হ'তে ৬৪ সপ্তাহ লাগে। এভাবে টাকা লীজ দেওয়া বৈধ কি-না? জানালে উপকৃত হব।

-খাঁন সিরাজুল ইসলাম নূর
লেবুদিয়া
তেরখাদা, খুলনা।

উত্তরঃ টাকা লীজ দিয়ে যেভাবেই হউক বেশী টাকা আদায় করা সম্পূর্ণ অবৈধ। ইহা স্পষ্ট সূদ। যা কবীরা গোনাহ *(বাক্বারাহ ২৭৫; মুসলিম, মিশকাত হা/২৮০৯)*। ওমর ফারূক (রাঃ) হ'তে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, স্বর্ণের বিনিময়ে স্বর্ণ, রৌপ্যের বিনিময়ে রৌপ্য (মুদ্রা হউক বা অলংকার) সমতুল্য ব্যাতিরেকে কমবেশী গ্রহণ করা সূদ। গমের বিনিময়ে গম, যবের বিনিময়ে যব, খেজুরের বিনিময়ে খেজুর সমতুল্য ব্যতিরেকে (কমবেশী) গ্রহণ করা সূদ *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/২৮১২ 'রিবা' অধ্যায়)*। যেহেতু টাকা আমাদের দেশে রৌপ্যমুদ্রার স্থলে ব্যবহৃত হয়, সেহেতু উহা কম বেশী গ্রহণ করায় স্পষ্ট সূদ হবে।

উল্লেখ্য যে, কোন বস্তু ক্রয় করে দিয়ে (উভয়ের সন্তুষ্টির ভিত্তিতে) কিছু অধিক মূল্য গ্রহণ করা শরীয়তে বৈধ *(মুসলিম, মিশকাত হা/২৮০৮)*। সূদ বর্জনের জন্য আল্লাহ পাক কঠোর নির্দেশ দান করেছেন। যারা এ আদেশ অমান্য করে তাদেরকে আল্লাহ ও তার রাসূল (ছাঃ)-এর সঙ্গে যুদ্ধের ঘোষণা দিতে বলা হয়েছে (বাক্বারাহ ২৭৯)।

প্রশ্ন (২৫/১১৫)ঃ কাউকে যদি খাৎনা না করা হয়, আর সে যদি এ অবস্থায় ধর্ম প্রচারের কাজ চালায়, তাহ'লে তাকে মুসলমান বলা যাবে কি-না? ১৮০০ বছর পূর্বে এ খাৎনা প্রথার প্রচলন ছিল কি? থাকলে কোন নবীর আমলে ছিল।

-মুহাম্মাদ ইয়াসীন আলী খান
যুগ্ম আহবায়ক, বাংলাদেশ কারিগরী ছাত্র পরিষদ
ও প্রাক্তন সাধারণ সম্পাদক, ছাত্র সংসদ
দিনাজপুর পলিটেকনিক ইনষ্টিটিউট।

উত্তরঃ কাউকে খাৎনা না করা হ'লেও যদি সে যথা নিয়মে ইসলাম গ্রহণ করতঃ এর প্রচার কার্য চালায়, তবে তাকে মুসলমান বলা যাবে। অবশ্য তার জন্য খাৎনা করা সুন্নাত। ইবরাহীম (আঃ) সর্বপ্রথম ৮০ বৎসর বয়সে এই সুন্নাত পালন করেছিলেন *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত ৫০৬ পৃঃ হা/৫৭০৩ 'সৃষ্টির সূচনা' অনুচ্ছেদ)*।

প্রশ্ন (২৬/১১৬)ঃ বিষাক্ত সাপকে আঘাত করার পর মারতে না পারলে কিছু করণীয় আছে কি?

-মুহাম্মাদ যয়নুল আবদীন
বুড়িচং, কুমিল্লা।

উত্তরঃ বিষাক্ত সাপ মারার চেষ্টা করে ব্যাহত হওয়া কোন দোষণীয় নয়। আল্লাহ কাউকেই সাধ্যাতিরিক্ত দায়িত্ব প্রদান করেন না (বাক্বারাহ ২৩৩, ২৮৬)। আবদুল্লাহ ইবনে মাসঊদ (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, সর্ব প্রকার সাপকেই তোমরা মেরে ফেল। যে ব্যক্তি উহার আক্রমণকে ও পুনরাক্রমনকে ভয় করে ওদেরকে ছেড়ে দেয়, সে আমার অন্তর্ভুক্ত নয়' *(আবুদাঊদ, নাসাঈ, মিশকাত, 'শিকার' অধ্যায় ২৬২ পৃঃ; ছহীহ আবুদাঊদ হা/৪৩৭০-৭২)*। এই হাদীছ হ'তে বুঝা যায় সাপকে আঘাত করার পর মারতে না পারলে পুনরায় আক্রমণের ভয় করা উচিত নয়। তবে সাবধান থাকা কর্তব্য।

প্রশ্ন (২৭/১১৭)ঃ যঈফ হাদীছের সংজ্ঞা কি? মাসিক আত-তাহরীক আগষ্ট '৯৯ সংখ্যার প্রশ্নোত্তরে ১/১৭৬ নং প্রশ্নের উত্তরে ফজরের ছালাতের পর সূরা হাশরের শেষ তিন আয়াত পড়ার হাদীছ যঈফ বলা হয়েছে। অথচ একজন প্রভাবশালী আলেম তাঁর 'ছহীহ নামাজ ও মাসনূন দোয়া' শিক্ষা বইয়ে

লিখেছেন উক্ত তিনটি আয়াত পাঠে অনেক সওয়াব রয়েছে (তিরমিযী, মিশকাত ১৮৮ পৃঃ)। কোন্‌টি সঠিক জবাব দানে বাধিত করবেন।

-মুহাম্মাদ আমীনুল হক
ষ্টেশনপাড়া, রহনপুর
চাঁপাই নবাবগঞ্জ।

উত্তরঃ মাসিক আত-তাহরীক আগষ্ট '৯৯ সংখ্যার প্রশ্নোত্তর কলামে ফজরের ছালাতের পর সূরা হাশরের শেষ তিন আয়াত পাঠ বিষয়ে যা বর্ণিত হয়েছে, তা সঠিক। 'ছহীহ নামাজ ও মানসূন দোয়া শিক্ষা' বইয়ে সম্ভবতঃ সনদ বা সূত্রের তাহকীক বা যাচাই ছাড়াই লেখা হয়েছে। হাদীছটি যঈফ। দেখুনঃ আলবানী, যঈফুল জামে' হা/৫৭৪৪।

যঈফ হাদীছের সংজ্ঞাঃ ঐ হাদীছকে 'যঈফ' হাদীছ বলা হয়, যে হাদীছের রাবী বা বর্ণনাকারীর মধ্যে 'ছহীহ' ও 'হাসান' হাদীছের গুণাবলী পাওয়া যায় না' *(আল-বা'এছুল হাছীছ ৫৩ পৃষ্ঠা)*। মিশকাতের মুক্বাদ্দামায় বর্ণিত হয়েছে যে, যঈফ ঐ হাদীছকে বলা হয়, যে হাদীছের মধ্যে 'ছহীহ' ও 'হাসান' হাদীছের শর্তাবলী পূর্ণভাবে বা আংশিকভাবে পাওয়া যায় না এবং যার বর্ণনাকারী একাকীত্ব, অপরিচিতি বা অন্য কোন দোষে নিন্দিত হয়'।

প্রশ্ন (২৮/১১৮)ঃ জনৈক ব্যক্তি নিয়মিত ছালাত আদায় করেন না। কিছুদিন আদায় করেন আবার ছেড়ে দেন। এটা তার খামখেয়ালী মাত্র। এ ধরণের ছালাত আদায়কারীর কি শাস্তি হ'তে পারে? আর অন্য এক ব্যক্তি নিয়মিত ছালাত আদায় করেন। কিন্তু সূদ-ঘুষ থেকে শুরু করে অনেক অন্যায় কাজে লিপ্ত থাকেন। তার কি শাস্তি হবে? কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে জানতে চাই।

-ডাঃ আহমাদ আলী
গ্রাম+পোঃ মহিষবাথান
থানাঃ খোকসা, কুষ্টিয়া।

উত্তরঃ অনিয়মিত ছালাত ছালাত আদায় না করারই শামিল। যা লোক দেখানোর জন্য হয়ে থাকে। এর শাস্তির কথা সূরা মাঊনের ৪-৮ নং আয়াতে বর্ণিত হয়েছে। আল্লাহ বলেন, 'ঐ সব মুছল্লীর জন্য দুর্ভোগ, যারা স্বীয় ছালাত হ'তে উদাসীন। যারা লোক দেখানোর জন্য করে থাকে এবং মানুষকে গৃহস্থালী আসবাবপত্র হ'তে দিতে বাধা দান করে'। সূরা মুদ্দাছছির-এর ৪২ নং আয়াতে জাহান্নামে যাওয়ার কারণ হিসাবে বলা হয়েছে- 'তারা সঠিকভাবে ছালাত আদায় করেনি'। ছালাতের হেফাযত না করার কারণে তারা ক্বিয়ামতের দিন ফেরাঊন, ক্বারূন, হামান ও উবাহ বিন খালফ-এর সাথী হয়ে উঠবে *(আহমাদ, ত্বাবারাণী, ইবনু হিব্বান, ফিকহুস সুন্নাহ ৯২-৯৩ পৃঃ; মিশকাত 'ছালাতের ফযীলত' অধ্যায় ৫৮-৫৯ পৃঃ)*।

আর যদি কোন ব্যক্তি নিয়মিত ছালাত আদায় করে এবং তার ছালাত আদায় সঠিক হয় তবে তার ছালাতই তাকে গোনাহ হ'তে বিরত রাখবে (আনকাবূত ৪৫)। সঠিকভাবে ছালাত আদায়কারীকে আল্লাহ ইচ্ছা করলে মাফ করে দিতে পারেন। তবে একটি হাদীছে কবীরা গোনাহ হ'তে বিরত থাকার কথা বলা হয়েছে *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত 'ছালাত' অধ্যায় ৫৭-৫৮ পৃঃ)*।

এক্ষণে উক্ত ব্যক্তিকে কবীরা গোনাহ হ'তে তওবা করার নির্দেশ দিতে হবে। তওবা না করলে সে হবে ফাসেক মুসলমান। আল্লাহ ইচ্ছা করলে যেমন পাপ তেমন শাস্তি দিতে পারেন কিংবা মাফও করতে পারেন। কেননা শিরক ব্যতীত সকল গোনাহ তিনি ইচ্ছা করলে মাফ করে দিতে পারেন (নিসা ৪৮)।

প্রশ্ন (২৯/১১৯)ঃ আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) নিজ ইচ্ছায় কিছুই বলেন না। অহি অবতীর্ণ হ'লেই তবে বলেন' (নাজম ৪)। জনৈক ব্যক্তি বলে যে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ইসলাম ধর্মের প্রবর্তক ছিলেন না। তিনি ধর্মের সংস্কারক ছিলেন মাত্র। উপরোক্ত আয়াত ও এই কথার মধ্যে মিল আছে কি? রাসূল ও সংস্কারকের অর্থ কি? রাসূল (ছাঃ)-কে সংস্কারক বলা যাবে কি? কুরআন ও হাদীছের আলোকে উত্তর দানে বাধিত করবেন।

-মুহাম্মাদ আব্দুল্লাহ
বামুন্দী, গাংণী
মেহেরপুর।

উত্তরঃ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাওহীদ বা একত্ববাদের প্রবর্তক ছিলেন না একথা ঠিক। তবে তিনি ইসলামী শরীয়তের প্রবর্তক ছিলেন। তিনি শরীয়তের বিষয়ে 'অহি' ব্যতীত কিছুই বলতেন না। সূরা শূরা-র ১৩ নং আয়াতের ব্যাখ্যায় তাফসীরে ইবনে কাছীরে বর্ণিত আছে- রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'আমরা নবীগণ আল্লাতী সন্তান বা বিমাতা ভাই স্বরূপ। আমাদের দ্বীন এক, কিন্তু শরীয়ত ভিন্ন ভিন্ন'। *-বুখারী, মুসলিম, আবুদাঊদ, মু'জাম ৪/৩০৮*। ইবনু কাছীর বলেন, এখানে দ্বীন অর্থ এককভাবে আল্লাহ্‌র ইবাদত করা বা তাওহীদে ইবাদত। সকল নবী এই তাওহীদের দাওয়াত দিয়ে গেছেন। আল্লাহ বলেন, 'তোমাদের প্রত্যেকের (পরীক্ষার জন্য) শরীয়ত বা ব্যবহারবিধি ভিন্ন করে দিয়েছি' (মায়েদাহ ৪৮)। 'অতঃপর তোমাকে ইসলামের একটি নির্ধারিত শরীয়ত দিয়েছি তুমি তারই

অনুসরণ কর' (জাছিয়া ১৮)। এদিক দিয়ে বিবেচনা করলে তিনি নতুন শরীয়তের ধারক ছিলেন। একই সাথে তিনি সংস্কারকও ছিলেন। যেমন মূসা (আঃ)-এর শরীয়তে যেনার শাস্তি হিসাবে ছঙ্গেছার করার হুকুম ছিল। তার উম্মতরাই তা রদবদল করেছিল *(নিসা ৪৮; মায়েদা ১৩, ৪১; বাক্বারাহ ৭৫)*। আমাদের নবী (ছাঃ) উহার সংস্কার করতঃ বাস্তবায়ন করে দেখিয়েছিলেন। রাসূল বা প্রেরিত পুরুষ হিসাবে তিনি যেমন নতুন শরীয়ত নিয়ে এসেছিলেন, তেমনি কোন কোন বিষয়ে তিনি পূর্বের শরীয়তের অনুসরণের জন্যও আদিষ্ট ছিলেন (আন'আম ৯০)।

প্রশ্ন (৩০/১২০)ঃ আমরা জানি বিপদ-আপদে বা কোন নেক মকছূদ পূরণে 'ছালাতুল হাজত' পড়ে দো'আ করলে আল্লাহ তা'আলা তার নেক মাকছূদ পূরণ করে দেন। আমার প্রশ্ন হল- কোন একটি মাকছূদের জন্য কি শুধু একবার ছালাত আদায় করতে হয়, নাকি মাকছূদ পুরা না হওয়া পর্যন্ত প্রতিদিন বা মাঝে মাঝে আদায় করতে হয়? প্রতিদিন বা মাঝে মাঝে আদায় করলে কোন অসুবিধা আছে কি-না? বিস্তারিত জানাবেন।

-রিয়ায
তালাইমারী
রাজশাহী।

উত্তরঃ 'ছালাতুল হাজত' একাধিকবার আদায়ের কোন বর্ণনা পাওয়া যায় না। পূর্ণভাবে ওযূ করে দু'রাক'আত ছালাত আদায় করে আল্লাহ্র প্রশংসা ও নবী করীম (ছাঃ)-এর প্রতি দরূদ পাঠ করতঃ হাদীছে উল্লেখিত দো'আ পড়ে নেক মকছূদ পূরণের জন্য অপেক্ষা করতে হবে। মুসনাদে আহমাদের ছহীহ হাদীছে ইংগিত পাওয়া যায় যে, শীঘ্র বা দেরীতে হউক আল্লাহ তার আশা পূর্ণ করবেন (*ফিকহুস সুন্নাহ ১/১৫৯*)।

এখানে দেরীতে কবুল হওয়ার সম্ভাবনায় পুনরায় ছালাত আদায় করার কথা বলা হয়নি। তাই প্রত্যহ বা মাঝে মাঝে একই উদ্দেশ্যে ছালাত আদায় না করাই উত্তম। হাদীছে যা নেই, তা করা অনুচিত।

প্রশ্ন (৩১/১২১)ঃ আমাদের গ্রামের দু'জন লোক পারস্পরিক ঝগড়ার কারণে একে অপরকে দেখতে পারে না। একদিন আছরের ছালাতে তাদের একজন মসজিদে এসে দেখে ২য় জনের পাশে একটু জায়গা খালি আছে। এ অবস্থা দেখে সে ঐখানে না দাঁড়িয়ে জামা'আতে ছালাত ছেড়ে চলে যায় এবং জামা'আত শেষ হ'লে এসে ছালাত আদায় করে। এ অবস্থায় তার ছালাত হবে কি?

-মুহাম্মাদ আখতারুযযামান
গ্রামঃ জলাইডাঙ্গা (পূবপাড়া)
পোঃ গোপালপুর
থানাঃ পীরগঞ্জ, রংপুর।

উত্তরঃ শারঈ কারণ ব্যতিরেকে এই দুই ব্যক্তির এভাবে হিংসা-বিদ্বেষ নিয়ে চলাফেরা করা সম্পূর্ণ অবৈধ। এই হিংসা তাদের নেকী খেয়ে ফেলবে, যেমন আগুন কাঠকে খেয়ে ফেলে। তারা আল্লাহ্র ক্ষমা থেকে বঞ্চিত হবে। তাদের কোন নেক আমল কবুল হবে না। আবু আইয়ূব (রাঃ) হ'তে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'তিন দিনের বেশী কোন মুসলমান অপর মুসলিম ভাই হ'তে সম্পর্ক ছিন্ন রাখা হালাল নয়। তাদের উভয়ের মধ্যে উত্তম সেই ব্যক্তি, যে প্রথমে সালাম প্রদান করবে *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মুসলিম, মিশকাত পৃঃ ৪২৭)*। আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, প্রতি সোমবার ও বৃহস্পতিবারে জান্নাতের দরজা সমূহ খুলে দেওয়া হয় এবং শিরক কারী ব্যতিত প্রত্যেক বান্দাকে ক্ষমা করা হয়। তবে যে তার ভাইয়ের সাথে হিংসা জিইয়ে রেখেছে, ঐ ব্যক্তিও ক্ষমা পায় না আপোষ না করা পর্যন্ত (*মুসলিম, ঐ*)। অন্য বর্ণনায় এসেছে- 'কোন মুসলমানের জন্য তার অপর মুসলমান ভাইয়ের সাথে তিন দিনের বেশী সম্পর্ক ছিন্ন রাখা হালাল নয়। যে ব্যক্তি তিনদিনের বেশী সম্পর্ক ছিন্ন রাখবে এবং মৃত্যুবরণ করবে, সে জাহান্নামে প্রবেশ করবে' *(আহমাদ, আবুদাঊদ, হাদীছ ছহীহ মিশকাত পৃঃ, ৪২৮, হা/৫০৩৫)*। ঐ ব্যক্তির ছালাত আদায় হ'য়ে যাবে। তবে তা কবুল হওয়ার সম্ভাবনা খুবই কম।

প্রশ্ন (৩২/১২২)ঃ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর জানাযার ছালাত কে পড়িয়েছেন? 'দরূদে রুইয়াত' পড়লে মহানবী (ছাঃ)-এর সাথে স্বপ্নে দেখা হবে' একথা কোন ছহীহ হাদীছে আছে কি? 'নিয়ামুল কোরান' বইয়ে নিম্নোক্ত ভাবে দরূদ বর্ণিত আছে- 'আল্লাহুমা ছাল্লে আলা সাইয়েদেনা মোহাম্মাদিন নাবীইন উম্মেইন'। এ বিষয়ে বিস্তারিত জানিয়ে বাধিত করবেন।

-মুহাম্মাদ আনারুল ইসলাম
সাং+পোঃ সাতানী
কুশখালি, যেলা সাতক্ষীরা।

উত্তরঃ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর জানাযায় কেউ ইমাম হয়ে ছালাত আদায় করেননি। আবুবকর (রাঃ) খলীফা নির্বাচিত হওয়ার পর রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর কাফন-দাফনে মনোনিবেশ করেন। গোসল দেওয়ার পর রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে তাঁর শয়ন কক্ষের মধ্যেই খাটনির উপর রাখা হয়। অতঃপর ঐ ঘরের মধ্যেই কবর খনন করার পর লোকজন পালাক্রমে দশজন

দশজন করে প্রথমে তাঁর পরিবারের লোক, তারপর মুহাজিরগণ, তারপর আনছারগণ, তারপর মহিলাগণ ঘরে প্রবেশ করতঃ জানাযার ছালাত আদায় করেন। সবশেষে বালকেরা প্রবেশ করে ছালাত আদায় করে *(মুখতাছার সীরাতির রাসূল ৪/৬০৩পৃঃ; আর-রাহীকুল মাখতূম ৫৩১ পৃঃ)*।

'দরূদে রুইয়াত' নামে কোন দরূদ বা আপনি যে শব্দগুলি লিখে পাঠিয়েছেন, ঐ শব্দে ও বাক্যে কোন দরূদ ছহীহ হাদীছে নেই। যে দরূদের অস্তিত্বই হাদীছে নেই, সেই দরূদ পাঠ করে নবী করীম (ছাঃ)-কে স্বপ্নে দেখার আকাংখা করা বাতুলতা বৈ কি। তাছাড়া 'নেয়ামুল কোরান' কোন নির্ভরযোগ্য কিতাব নয়। বিনা দলীলে এর কোন কথা মানা যাবে না। আল্লাহ পাক বলেন, 'তোমরা আনুগত্য কর যা নাযিল করা হয়েছে তোমাদের নিকট তোমাদের প্রভুর পক্ষ হ'তে। তা ব্যতিরেকে কোন অলী-আউলিয়ার অনুসরণ কর না' (আ'রাফ ৩)। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, যে ব্যক্তি আমার নামে কোন মিথ্যা কথা বলবে, সে যেন তার স্থান দোযখে বানিয়ে নেয় *(বুখারী, মিশকাত ৩২পৃঃ, 'ইলম' অধ্যায়)*। বানাওয়াট দরূদ তো দূরের কথা ছহীহ হাদীছে যেসব সুন্নাতী দরূদের বর্ণনা রয়েছে সে সব দরূদ পাঠেও রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে স্বপ্নে দেখা যাবে বলে কোন প্রমাণ নেই। তবে হ্যাঁ, ছহীহ হাদীছে বর্ণিত রাসূল (ছাঃ)-এর শামায়েল (অর্থাৎ পূর্ণ দৈহিক ও চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য) যথাযথ ভাবে স্মরণ রেখে কেউ স্বপ্ন যোগে তদনুরূপ দেখার সৌভাগ্য লাভ করলে তা সত্য বলে গণ্য হবে। অন্যথায় শয়তান দর্শনের সম্ভাবনা থাকতে পারে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, যে ব্যক্তি স্বপ্নে আমাকে দেখল সে আমাকেই দেখল, কেননা শয়তান আমার আকৃতি ধারণ করতে পারে না *(তিরমিযী, শামায়েল ৩২ পৃঃ)*।

প্রশ্ন (৩৩/১২৩)ঃ মেয়েদের দিকে এক বারের বেশী দৃষ্টি নিক্ষেপ করলে ছগীরা না কবীরা গোনাহ হবে? কোন্ কোন্ মেয়ের দিকে তাকানো নাজায়েয। জানিয়ে উপকৃত করবেন।

-রাশেদ, কুষ্টিয়া।

উত্তরঃ মেয়েদের সৌন্দর্যের দিকে ইচ্ছাকৃতভাবে তাকানো নাজায়েয। হঠাৎ নযর পড়লে চোখ ফিরিয়ে নিবে *(মুসলিম, মিশকাত, ২০ পৃঃ)*। শারঈ কারণ ব্যতীত একাধিকবার ইচ্ছাকৃতভাবে তাকালে গোনাহ কবীরা হবে। সর্বদা দৃষ্টি নীচু রাখতে হবে (নূর ৩০)। ১৪ জন নারী ব্যতিরেকে সকল মহিলার দিকে তাকানো নাজায়েয। এই অবৈধ কার্য হ'তে বাঁচার শরীয়ত মোতাবেক উত্তম ব্যবস্থা হচ্ছে যাদের সামর্থ্য আছে তারা যেন বিবাহ করে। তবেই তাদের দৃষ্টি অবনমিত হবে ও লজ্জাস্থানের হেফাযত করা সম্ভব হবে *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত 'নিকাহ' অধ্যায় ২২৭ পৃঃ)*।

প্রশ্ন (৩৪/১২৪)ঃ পাঁচ হাযার টাকার বিনিময়ে পাঁচ মাসের জন্য একটি গাভী বন্ধক রেখেছিলাম। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে গাভীটি একটি বাচ্চা প্রসব করে। এখন পাঁচ হাযার টাকা জমা দিয়ে গাভীটি বাচ্চাসহ ফেরত পাব কি?

-মীযানুর রহমান
গ্রামঃ পলাশী
গোদাগাড়ী, রাজশাহী।

উত্তরঃ বন্ধক রাখা বস্তুর মালিক মূলতঃ মালিকই থাকে। কাজেই গাভীর বাচ্চা মূল মালিকই পাবে। তবে যার নিকট গাভী বন্ধক রাখা হয় সে ব্যক্তি খরচ বাবদ তা দ্বারা উপকৃত হ'তে পারে। যেমন গাভীর দুধ পান ইত্যাদি। আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'খরচের কারণে বাহনের উপর আরোহণ করা যায় এবং গাভীর খরচের কারণে গাভীর দুধ পান করা যায়' *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/২৮৮৬)*।

প্রশ্ন (৩৫/১২৫)ঃ আমার আব্বার কবর গোরস্থানের এক পার্শ্বে। আর গোরস্থানটি পুকুর পাড়ে। বর্তমানে গোরস্থানের পার্শ্বের মাটি ক্ষয় হয়ে কবরটি বিলীন হ'তে চলেছে এবং সেখানে হাঁস, মুরগী, ভেড়া ইত্যাদি বিচরণ করছে। এমতাবস্থায় আমার আব্বার কবরটি কি ইট দিয়ে বাঁধানো যায়?

-খায়রুল আনাম
গ্রামঃ ইসলামপুর
পোঃ আক্কেলপুর
গোমস্তাপুর, নবাবগঞ্জ।

উত্তরঃ কোন অবস্থাতেই কবর পাকা করা জায়েয নয়। কারণ, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) সাধারণভাবে কবর পাকা করতে নিষেধ করেছেন। জাবের (রাঃ) বলেন, 'রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) কবর পাকা করতে, কবরের উপর কিছু লিখতে এবং কবরের উপর হাঁটতে নিষেধ করেছেন' *(তিরমিযী, মিশকাত ১৪৯ পৃঃ, হাদীছ ছহীহ)*। তবে গোরস্থান সংরক্ষণের জন্য যথাযথ ব্যবস্থা করতে হবে।

প্রশ্ন (৩৬/১২৬)ঃ ফরয ও নফল ছালাতে ক্বিরাআত পড়ার সময় কুরআন দেখে ক্বিরাআত পড়া যাবে কি?

-যিয়াউল বিন আবদুল গণী
গ্রাম ও পোঃ পানিহার

গোদাগাড়ী, রাজশাহী।

উত্তরঃ ফরয ও নফল যে কোন ছালাতে ক্বিরাআত পড়ার সময় সরাসরি কুরআন দেখে পড়ার বিষয়ে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ও ছাহাবায়ে কেরাম থেকে কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। বরং ছালাতের মধ্যে কুরআন মুখস্থ পড়াই সুন্নাত। যা একাধিক ছহীহ হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত 'ক্বিরাআত' অধ্যায়)।*

প্রশ্ন (৩৭/১২৭)ঃ তারাবীহ্‌র ছালাতে শুধু তাশাহহুদ পড়ে সালাম ফিরালে ছালাত পূর্ণ হবে কি? কুরআন ও সুন্নাহ্‌র আলোকে উত্তর দানে বাধিত করবেন।

-ইমামুদ্দীন
গ্রামঃ আখিলা
নাচোল, চাঁপাই নবাবগঞ্জ।

উত্তরঃ তারাবীহ্‌র ছালাত বা যে কোন ছালাতে শুধু তাশাহহুদ পড়ে সালাম ফিরালে সুন্নাত অনুযায়ী ছালাত আদায় হবে না। বরং সুন্নাত হচ্ছে তাশাহহুদ পড়ার পর দরূদ পড়া এবং তারপর নিজের জন্য কিছু প্রার্থনা করা। ফাযালা ইবনে 'উবাইদ বলেন, 'একদা আমরা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নিকট বসে ছিলাম। হঠাৎ একজন লোক এসে ছালাত আদায় করল এবং বলল, 'হে আল্লাহ! আমাকে ক্ষমা কর'। তখন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, হে মুছল্লী! তুমি তাড়াতাড়ি করলে। যখন তুমি ছালাত আদায় করবে এবং বৈঠকে বসবে তখন আল্লাহ্‌র যথাযথ প্রশংসা কর এবং আমার উপর দরূদ পড়। তারপর আল্লাহ্‌র নিকটে প্রার্থনা কর' *(তিরমিযী, আবুদাঊদ, মিশকাত হা/৯৩০ সনদ ছহীহ)।* আবদুল্লাহ ইবনে মাসঊদ (রাঃ) বলেন, 'যখন আমি ছালাতে বৈঠকে বসতাম তখন আল্লাহ্‌র প্রশংসা করতাম। তারপর রাসূল (ছাঃ)-এর উপর দরূদ পড়তাম। তারপর নিজের জন্য দো'আ করতাম। তখন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলতেন, চাও দেওয়া হবে। চাও দেওয়া হবে' *(তিরমিযী, মিশকাত ৮৫ পৃঃ, হা/৯৩১ সনদ হাসান)।*

প্রশ্ন (৩৮/১২৮)ঃ মসজিদের স্থান কোন ব্যক্তিকে ব্যবহারের জন্য প্রদান করে তার নিকট হ'তে অন্য স্থানে জমি নিয়ে সেখানে মসজিদ নির্মাণ করা যায় কি?

-আবদুল খালেক
প্রধান শিক্ষক, সাঁইধারা (রেজিঃ)
বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়
বাগমারা, রাজশাহী।

উত্তরঃ যথাযথ কারণ ব্যতীত মসজিদ স্থানান্তরিত করা জায়েয নয়। তবে যথাযোগ্য কারণ থাকলে, যেমন মসজিদ সম্প্রসারণের প্রয়োজন কিন্তু ব্যবস্থা নেই বা মসজিদে যাওয়ার রাস্তা নেই কিংবা মসজিদ অনাবাদী হয়ে পড়েছে ইত্যাদি কারণে মসজিদের মুতাওয়াল্লী মসজিদের স্থান বিক্রি করে অন্য স্থান ক্রয় করে সেখানে মসজিদ নির্মাণ করতে পারেন এবং ক্রেতা সে স্থানকে যেকোন কাজের জন্য ব্যবহার করতে পারে। ওমর ফারূক (রাঃ) একদা দামেশকে মসজিদের স্থান বিক্রি করে অন্য স্থান ক্রয় করে মসজিদ নির্মাণ করেছিলেন এবং মসজিদের বিক্রিত স্থানটি খেজুর বিক্রির বাজারে পরিণত হয় *(ইবনে তাইমিয়াহ, মাজমূ'আ ফাতাওয়া ৩১ খণ্ড, ২৬১ পৃঃ)।*

প্রশ্ন (৩৯/১২৯)ঃ বর্তমানে কাযী-র মাধ্যমে স্ত্রী কর্তৃক স্বামীকে যে তালাক দেওয়া হয়, তা কি শরীয়ত সম্মত? দলীলসহ বিস্তারিত জানিয়ে বাধিত করবেন।

-এম, এ, হুসায়েন
ঠিকানা প্রকাশে অনিচ্ছুক

উত্তরঃ তালাক প্রদানের অধিকার একমাত্র পুরুষের। তবে কোন নারী তার স্বামীর সাথে সংসার করতে যে কোন কারণে ব্যর্থ হ'লে, তার স্বামীর প্রদত্ত মোহর ফেরত দিয়ে নিজেকে স্বামীর বন্ধন হ'তে মুক্ত করে নেওয়ার জন্য কাযী-র নিকট প্রস্তাব পেশ করতে পারে। তখন কাযী স্বামীকে মোহর ফেরত গ্রহণ করতঃ একটি খোলা তালাক প্রদানের আদেশ করবেন। ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, ছাবিত ইবনে ক্বায়েস (রাঃ)-এর স্ত্রী নবী করীম (ছাঃ)-এর নিকট এসে বলল, হে আল্লাহ্‌র রাসূল (ছাঃ)! ছাবিত ইবনে ক্বায়েস এমন এক ব্যক্তি যার দ্বীন ও চরিত্র আমি ঘৃণা করিনা। কিন্তু আমি ইসলামের নে'মতের অকৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা অপসন্দ করি (অর্থাৎ হয়ত আমার দ্বারা তার নাফরমানী হবে)। তখন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, তুমি কি তার মোহর বাবদ বাগান ফেরত দিতে চাও? মহিলা বলল, জি। তখন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ছাবিত ইবনে ক্বায়েসকে বললেন, তুমি তোমার মোহর বাবদ বাগান ফেরত নাও এবং তাকে এক তালাক প্রদান কর *(বুখারী, মিশকাত ২৮৩ পৃঃ 'খোলা তালাক' অধ্যায়)।* এক্ষণে কাযী যদি সরকার কর্তৃক অনুমোদিত হন এবং কাযী-র মাধ্যমে প্রদত্ত তালাক যদি শরীয়ত মোতাবেক হয় তাহ'লে এই তালাক জায়েয হবে।

প্রশ্ন (৪০/১৩০)ঃ স্ত্রী যদি স্বামীকে বলে যে, আমি তোমার নিকটে তোমার মায়ের ন্যায়। তাহ'লে ঐ স্ত্রী তার জন্য হারাম হবে কি-না?

-মুহাম্মাদ আতাউর রহমান
মেহেরচন্ডি, চকপাড়া, রাজশাহী।

উত্তরঃ এমতাবস্থায় স্ত্রী স্বামীর উপরে হারাম হবে না, বরং পূর্বের ন্যায় বসবাস করবে। এটি স্ত্রীর একটি মিথ্যা ও বাজে কথা মাত্র। কেননা 'যেহার' করার অধিকার কেবলমাত্র স্বামীর, স্ত্রীর নয়। যেমন পবিত্র কুরআনে বর্ণিত হয়েছে। অবশ্য যদি কোন স্বামী তার স্ত্রীকে বলে

যে, 'তুমি আমার উপরে আমার মা, বোন, খালা বা অনুরূপ মুহরামাত মহিলাদের পিঠের ন্যায়' তাহ'লে তখন 'যেহার' হবে এবং স্ত্রী তার উপরে হারাম থাকবে যতক্ষণ না স্বামী 'কাফ্ফারা' আদায় করবে। যেহারের কাফ্ফারা হ'ল 'স্বামী একটি গোলাম আযাদ করবে অথবা একটানা দু'মাস ছিয়াম পালন করবে অথবা ৬০ (ষাট) টি মিসকীন খাওয়াবে' (মুজাদালাহ ৩-৪)। *(আল-ফিকহুল ইসলামী ৭/৫৮৮, ৫৯৩, ৬০৪)।*

প্রশ্ন (৪১/১৩১)ঃ সাধারণ আলেমদের মুখে শুনে থাকি যে, স্বামীর উপর স্ত্রীর হক ১১টি। এ সংখ্যা কি ঠিক? যদি ঠিক হয় তাহ'লে কি কি জানিয়ে বাধিত করবেন।

-আবদুল ক্বাহ্হার
রামপাড়া, পোঃ হাট শ্যামগঞ্জ
ঘোড়াঘাট, দিনাজপুর।

উত্তরঃ স্বামীর উপর স্ত্রীর ১১টি হক রয়েছে এরূপ নির্দিষ্ট সংখ্যা কুরআন ও হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত নয়। তবে আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (ছাঃ) সাধারণভাবে স্ত্রীর সাথে স্বামীর সদাচরণের কথা জোরালোভাবে বিবৃত করেছেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'নারীদের সাথে সৎভাবে জীবন যাপন কর' (নিসা ১৯)। আর পুরুষদের যেমন স্ত্রীদের উপর সদাচরণের অধিকার রয়েছে তেমনি স্ত্রীদেরও অধিকার রয়েছে পুরুষদের উপর' (বাক্বারাহ ২২৮)। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'তোমাদের মধ্যে উত্তম ঐ ব্যক্তি যে তার স্ত্রীর নিকট উত্তম' *(মিশকাত, 'স্ত্রীর সাথে সদাচরণ' অধ্যায়, ২৮০ পৃঃ, হাদীছ ছহীহ)।* অন্য এক বর্ণনায় রয়েছে 'তোমরা তোমাদের স্ত্রীদেরকে কল্যাণের উপদেশ দান কর' *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত ২৮০ পৃঃ)।*

প্রশ্ন (৪২/১৩২)ঃ কথিত আছে যে, 'দশ জনে যাকে ভালবাসে আল্লাহ তাকে ভালবাসেন।' এ কথার সত্যতা জানতে চাই।

-হাফীযুর রহমান
সম্রাট মটর মেশিনারিজ
বিআরটিসি মার্কেট, বগুড়া।

উত্তরঃ 'দশ জনে যাকে ভালবাসে আল্লাহ তাকে ভালবাসেন' এরূপ কোন কথা হাদীছে নেই। বরং আল্লাহ যাকে ভালবাসেন সে-ই সমাজে ভালবাসা লাভ করে থাকেন। আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'নিশ্চয়ই আল্লাহ যখন কোন ব্যক্তিকে ভালবাসেন তখন জিবরাঈলকে ডেকে বলেন, আমি অমুক ব্যক্তিকে ভালবাসি। তুমিও তাকে ভালবাস! রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, তখন জিবরাঈল (আঃ) তাকে ভালবাসেন। অতঃপর তিনি আসমানবাসীকে বলেন, নিশ্চয়ই আল্লাহ অমুককে ভালবাসেন, তোমরাও তাকে ভালবাস। তখন আসমানবাসী তাকে ভালবাসে। তখন পৃথিবীতে তার ভালবাসা প্রতিষ্ঠিত করা হয়' *(মুসলিম, মিশকাত হা/৫০০৫)।*

প্রশ্ন (৪৩/১৩৩)ঃ জুম'আর দিনে খুৎবা শুরু হ'লে শুধুমাত্র দাখেলী দু'রাক'আত সুন্নাত ছালাত আদায় করে বসা হয়। এক্ষণে ছালাত শেষে জুম'আর পূর্বের চার রাক'আত সুন্নাত পড়তে হবে কি? যোহরের সুন্নাত ছুটে গেলে পরে পড়তে হবে কি?

-ওয়ালিউল্লাহ
দৌলতখালী, দৌলতপুর।

উত্তরঃ জুম'আর খুৎবা চলাকালীন সময়ে দু'রাক'আত সুন্নাত পড়ে বসে পড়াই রাসূল (ছাঃ)-এর নির্দেশ *(মুসলিম, মিশকাত ১২৩ পৃঃ)।* তবে জুম'আর ছালাত শেষে পূর্বের চার রাক'আত সুন্নাত পড়তে হবে না। কারণ, জুম'আর পূর্বের কোন নির্ধারিত সুন্নাত নেই। যার যত রাক'আত পড়া সম্ভব সে তত রাক'আত পড়বে *(মুসলিম, বুলূগুল মারাম হা/৪৫১)।* জুম'আর পর চার রাক'আত সুন্নাত পড়া যায়। আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'কেউ যদি জুম'আর পর ছালাত পড়তে চায় তবে সে যেন চার রাক'আত পড়ে' *(মুসলিম, মিশকাত ১০৪ পৃঃ)।* তবে দুই রাক'আত পড়াও ছহীহ হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, রিয়াযুছ ছালেহীন হা/১০৯৮)।* যোহর বা অন্য কোন ফরয ছালাতের পূর্বের সুন্নাত বাদ পড়লে পরে পড়া যায় *(তিরমিযী, রিয়াযুছ ছালেহীন হা/১১১৮ হাদীছ হাসান)।*

প্রশ্ন (৪৪/১৩৪)ঃ আল্লাহ্র নবীর মি'রাজ কি সশরীরে হয়েছিল? আল্লাহ্র সাথে তাঁর সাক্ষাত কি সশরীরে হয়েছিল? কুরআন-হাদীছের আলোকে জানতে চাই।

-সেলিম
চোষডাঙ্গা, কদমচিলিন
লালপুর, নাটোর।

উত্তরঃ আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) সশরীরেই মি'রাজে গিয়েছিলেন এবং আল্লাহ্র সাথে সরাসরি কথোপকথনও হয়েছে। যা কুরআন ও একাধিক ছহীহ হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত। আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'পরম পবিত্র সত্তা তিনি যিনি স্বীয় বান্দাকে রাত্রি বেলায় মসজিদে হারাম থেকে মসজিদ আক্বছা পর্যন্ত ভ্রমণ করিয়েছিলেন। যার চতুর্দিকে আমি পর্যাপ্ত বরকত দান করেছি। যাতে করে আমি তাকে কুদরতের কিছু নির্দশন দেখিয়ে দেই' (ইসরা ১; তাছাড়া সূরা নজম ১১-১৮ পর্যন্ত দ্রষ্টব্য)। আর হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, তিনি 'বোরাক'-এর মাধ্যমে প্রতি আসমানে পৌঁছেছেন। সেখানে নবীদের সাথে সাক্ষাত করেছেন। আরো অনেক কিছু দেখতে পেয়েছেন। ফেরার পথে মূসা (আঃ)-এর সাথে ছালাত সম্পর্কে কথোপকথন হয়েছে *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৫৮৬২-৬৪, 'মি'রাজ' অনুচ্ছেদ)।*

প্রকাশ থাকে যে, নবী করীম (ছাঃ)-এর সশরীরে আল্লাহ্‌র সান্নিধ্যে সরাসরি কথোপকথন হ'লেও তিনি তাঁকে দর্শন করেননি। কারণ, পার্থিব চক্ষু দ্বারা আল্লাহ পাককে দর্শন করা সম্ভব নয় (আন'আম ১০৪; আ'রাফ ১৪৩)।

উল্লেখ্য যে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) -এর মে'রাজ স্বপ্নে হওয়ার পক্ষে কিছু জাগতিক যুক্তির অবতারণা করা হয়ে থাকে মাত্র। যার পক্ষে কুরআন ও ছহীহ হাদীছের স্পষ্ট কোন দলীল নেই।

প্রশ্ন (৪৫/১৩৫)ঃ আমার যাবতীয় সম্পদ আমার ছেলেদের মাঝে মৌখিকভাগে বন্টন করে দিয়েছি। বর্তমানে আমি ও আমার স্ত্রী সকল ছেলেদের সাথে পর্যায়ক্রমে খাই। এক্ষণে আমার ঐ সম্পদে যা আয় হয়, তা নেছাব পরিমাণ হয়। অথচ তারা কেউ যাকাত-ওশর দিচ্ছে না। এমতাবস্থায় তাদের রোজগারকৃত রুযী আমাদের পক্ষে খাওয়া হালাল হবে কি? বিস্তারিত জানিয়ে বাধিত করবেন।

-আব্দুল লতীফ
রাজপুর, কলারোয়া
সাতক্ষীরা।

উত্তরঃ বিবরণ অনুপাতে উক্ত শস্যে ওশর ফরয হয়েছে। ওশর বের করা অপরিহার্য। নইলে সমস্ত শস্য অবৈধ হবে। যা কোন ব্যক্তির জন্য খাওয়া জায়েয হবে না। আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'আপনি তাদের সম্পদ হ'তে যাকাত বের করুন। তাদেরকে পবিত্র করুন এবং যাকাতের মাধ্যমে তাদের সম্পদ বরকতময় করুন' (তওবা ১০৩)। অতএব এমতাবস্থায় সমস্ত শস্যের ওশর বের করতে হবে। নইলে সমস্ত সম্পদ ছেলেদের কাছ থেকে ফেরৎ নিতে হবে। কারণ আপনি উক্ত সম্পদের প্রকৃত মালিক বিধায় আপনিই এর জন্য আল্লাহ্‌র নিকটে দায়ী হবেন।

প্রশ্ন (৪৬/১৩৬)ঃ আমরা গ্রামের কয়েকজন মিলে একটা সমিতি করেছি। আমরা আমাদের সঞ্চয়ের টাকা দিয়ে কিছু দ্রব্য ক্রয় করে কিস্তির মাধ্যমে ছাড়তে আগ্রহী। এখন কিভাবে কিস্তিতে দ্রব্য প্রদান করলে সূদ হবে না? জানিয়ে বাধিত করবেন।

-শফীকুর রহমান
গ্রামঃ মৈশালা
পাংশা, রাজবাড়ী।

উত্তরঃ দ্রব্য ক্রয় করে কিস্তির মাধ্যমে দ্রব্য প্রদান করা যায় এবং তাতে ক্রেতা ও বিক্রেতার সমঝোতার মাধ্যমে মূল্যের কমবেশী করা যায়। কারণ ক্রয়-বিক্রয়ের ক্ষেত্রে উভয়ের সন্তুষ্টি শর্ত। আল্লাহ বলেন 'হে ঈমানদারগণ! তোমরা অন্যায়ভাবে অন্যের সম্পদ ভক্ষণ করনা, উভয়ের সন্তুষ্টিতে ব্যবসার মাধ্যমে উপার্জিত সম্পদ ব্যতীত' (নিসা ২৯)। রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, যে ব্যক্তি বাকীতে লেনদেন করবে, সে যেন তার পরিমাণ, পরিমাপ ও পরিশোধের সময় নির্ধারণ করে নেয় *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/২৮৮৩)*। বারীরাহ (রাঃ) ৯ কিস্তিতে নিজেকে মনিবের কাছ থেকে মুক্ত করেছিলেন এবং এভাবেই প্রথমে তার মালিকের সাথে চুক্তি হয়েছিল *(বুখারী হা/২৫৬৩)*।

প্রশ্ন (৪৭/১৩৭)ঃ আইয়ূব (আঃ)-এর শরীরে নাকি এমন ঘা হয়েছিল যাতে পোকা হয়েছিল। যার দুর্গন্ধের কারণে গ্রামের লোক তাঁকে গ্রাম থেকে দূরে রেখে এসেছিল। এই ঘটনার সত্যতা জানতে চাই।

-আব্দুল্লাহ বিন মোস্তফা
ভালুকগাছি
পুঠিয়া, রাজশাহী।

উত্তরঃ আইয়ূব (আঃ)-এর শরীরে পোকা হয়েছিল এবং গ্রামের লোক তাকে গ্রাম থেকে বের করে দিয়েছিল, নবীর শানে এ ধরনের অবমাননাকর বক্তব্য কোন ছহীহ হাদীছ কিংবা কোন নির্ভরযোগ্য ইতিহাস দ্বারা প্রমাণিত নয়। যা কিছু শোনা যায় তা কেবল ইসরাঈলী বানাওয়াট কাহিনী মাত্র। কুরআন থেকে শুধু এতটুকু জানা যায় যে, তিনি কোন দূরারোগ্য ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়ে ছবর করেন। অবশেষে আল্লাহ্‌র নিকট দো'আ করে রোগ থেকে মুক্তি পান এবং আল্লাহ তা'আলা তাঁকে পরিবার ও অর্থ সম্পদ ফেরত দেন *(আম্বিয়া ৮৩, ছোয়াদ ৪১-৪৪; আহকামুল কুরআন ১৫-১৬ খণ্ড, ৪১ নং আয়াতের ব্যাখ্যা)*।

প্রশ্ন (৪৮/১৩৮)ঃ কেউ যদি রাতের প্রথম ভাগে বিতর পড়ে এবং শেষ রাতে জাগ্রত হয়ে কিছু ছালাত আদায় করতে চায়, তাহ'লে সে কি আবার বিতর পড়বে? জনৈক আলেম বলেছেন, শেষ রাতে এক রাক'আত পড়ে জোড় করে নিবে এবং শেষে বিতর পড়বে।

-আব্দুল হাফীয
জান্নাতপুর, চাঁদপাড়া
গোবিন্দগঞ্জ, গাইবান্ধা।

উত্তরঃ এ ব্যাপারে সুন্নাত হচ্ছে পরে আর বিতর পড়তে হবে না। প্রথম রাতের বিতরই বহাল থাকবে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'এক রাতে দুই বার বিতর নেই' *(তিরমিযী, ১০৭ পৃঃ; আবুদাউদ ২০৩ পৃঃ; হাদীছ ছহীহ)*। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বিতর পড়ার পর দু'রাক'আত ছালাত আদায় করতেন *(মুসলিম, মিশকাত হা/১২৮৪)*। অত্র হাদীছদ্বয় প্রমাণ করে যে, এক রাতে দু'বার বিতর পড়া যাবে না এবং বিতর পড়ার পর নফল ছালাত আদায় করা যায়। কাজেই সন্ধ্যা রাতে বিতর পড়ার পর রাতে জাগ্রত হয়ে ইচ্ছা মত নফল ছালাত পড়তে পারেন *(আওনুল মা'বূদ, ৩য় খণ্ড 'বিতরের সময়' অধ্যায়; মুহাল্লা ২য় খণ্ড ৯২-৯৩ পৃঃ)*।

প্রশ্ন (৪৯/১৩৯)ঃ কচ্ছপ খাওয়া জায়েয কি? কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে জানতে চাই।

-আলাউদ্দীন
গ্রামঃ কিশোরীনগর
দৌলতখালী, কুষ্টিয়া।

উত্তরঃ কারো রুচি সম্মত হ'লে কচ্ছপ খেতে পারে। কারণ, কচ্ছপ জলজ প্রাণীর অন্তর্ভুক্ত। আর আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'তোমাদের কল্যাণার্থে তোমাদের জন্য সমুদ্রের শিকার ও সমুদ্রের খাদ্য হালাল করা হয়েছে' (মায়েদাহ ৯৬)। এই আয়াতের ব্যাখ্যায় হাসান বাছরী বলেন, কচ্ছপে কোন দোষ নেই *(বুখারী, তরজমাতুল বাব ২য় খণ্ড ৮৫৪ পৃঃ)*।

প্রকাশ থাকে যে, কোন বস্তু হালাল হ'লেই খেতে হবে এমন নির্দেশ শরীয়তের নয়। বরং রুচি না হ'লে খাবে না। এটাই ইসলামী নীতি। একদা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নিকট গুই সাপের ন্যায় রান্না করা গোস্ত পেশ করা হ'লে তিনি খেতে অনিচ্ছা প্রকাশ করেন। তখন জাবের (রাঃ) বলেন, ইহা কি হারাম? তিনি বললেন, না। তখন জাবের (রাঃ) সামনে নিয়ে খেতে লাগলেন *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৪১১১)*।

প্রশ্ন (৫০/১৪০)ঃ শিক্ষকদের চাকুরী শেষ হ'লে ছাত্র ছাত্রী কর্তৃক শিক্ষককে যে উপঢৌকন প্রদান করা হয় তা জায়েয কি?

-আরযেনা খাতুন
পলিকাদোয়া মহিলা দাঃ মাঃ
বানিয়াপাড়া, জয়পুরহাট।

উত্তরঃ শিক্ষকদের চাকুরী শেষে ছাত্র-ছাত্রীরা তাদেরকে উপঢৌকন প্রদান করতে পারে। কারণ মুসলমানের আপোষে ভ্রাতৃত্বভাব বৃদ্ধি করার একটি বড় মাধ্যম হচ্ছে পরস্পর উপঢৌকন বিনিময়।

'আয়েশা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) উপঢৌকন গ্রহণ করতেন এবং তার প্রতিদান দিতেন *(বুখারী হা/১৭৩৪)*। আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'আমাকে একটি ছাগলের ক্ষুর খাওয়ার দাওয়াত করা হ'লেও আমি তা গ্রহণ করি এবং আমাকে একটি ছাগলের বাহু উপঢৌকন দেওয়া হ'লেও আমি তা কবুল করি' *(বুখারী হা/১৭৩৫)*। 'আয়েশা (রাঃ) বলেন, 'হে আল্লাহর রাসূল (ছাঃ) আমার দু'জন প্রতিবেশী রয়েছে আমি কাকে উপঢৌকন দিব, তিনি বলেন, যার ঘরের দরজা তোমার নিকটে' *(বুখারী হা/১৮৪০)*। রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'তোমরা মুছাফাহা কর হিংসা দূর হবে। পরস্পর উপঢৌকন প্রদান কর। ভালবাসা বাড়বে ও সংকীর্ণতা দূর হবে' *(মুওয়াত্ত্বা, মিশকাত হা/৪০৩)*।

প্রশ্ন (৫১/১৪১)ঃ কোন জমিতে যদি ফসলের পরিবর্তে মাছের চাষ করা হয় তাহ'লে মাছের ওশর দিতে হবে কি?

-আবদুল খালেক
আলীপুর, সাতক্ষীরা।

উত্তরঃ কোন জমিতে ফসলের পরিবর্তে মাছের চাষ করলে মাছের ওশর দিতে হবে না। কারণ মাছের কোন ওশর নেই। তবে মাছের চাষ যদি ব্যবসায়ে পরিণত হয়, তবে বছর শেষে মূলধন ও লভ্যাংশের যাকাত বের করতে হবে, যখন তা যাকাতের নিছাবে পৌঁছবে।

উল্লেখ্য, ৮৫ গ্রাম সোনার সমমূল্য অথবা ৫৯৫ গ্রাম রূপার সমমূল্য টাকা সঞ্চিত হ'লে শতকরা আড়াই টাকা হারে যাকাত দিতে হবে।

প্রশ্ন (৫২/১৪২)ঃ হযরত মুহাম্মাদ (ছাঃ)-কে তাঁর চাচা আবু ত্বালেব যে দুশমনদের হাত থেকে রক্ষা করেছিলেন এর বিনিময়ে কি তিনি জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবেন? তার অবস্থা কি হবে? ছহীহ সুন্নাহ ভিত্তিক জওয়াব দানে বাধিত করবেন।

-আবদুর রশীদ
নন্দলালপুর
কুমারখালী, কুষ্টিয়া।

উত্তরঃ জান্নাতবাসী হওয়ার পূর্বশর্ত হচ্ছে আল্লাহ্র প্রতি ঈমান আনা এবং তাঁর সাথে অন্য কাউকে শরীক না করা। কিন্তু রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর চাচা আবু ত্বালেব আল্লাহ্র প্রতি ঈমান আনেননি। মুশরিক অবস্থায় তার মৃত্যু হয়েছিল। তবে রাসূল (ছাঃ)-কে সহযোগিতা করার জন্য জাহান্নামীদের মধ্যে তার শাস্তি সর্বাপেক্ষা সহজতর হবে।

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'জাহান্নামীদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা সহজতর শাস্তি হবে আবু ত্বালেবের। তার দু'পায়ে দু'খানা আগুনের জুতো পরানো হবে। এতে তার মাথার মগজ ফুটতে থাকবে' *(বুখারী, মিশকাত হা/৫৬৬৮)*।

প্রশ্ন (৫৩/১৪৩)ঃ সিল্কের পাঞ্জাবী, শাড়ী ব্যবহার করা যাবে কি? আমি একজন দোকানদার। আমার দোকানে সিল্কের পাঞ্জাবী ও শাড়ী বিক্রি করা হয়। ছহীহ হাদীছের আলোকে জওয়াব দানে বাধিত করবেন।

-মুহাম্মাদ বেলাল
সাহেব বাজার, রাজশাহী।

উত্তরঃ 'সিল্ক' ইংরেজী শব্দ যার অর্থ রেশম। রেশম-এর তৈরী কাপড় পরিধান করা পুরুষের জন্য হারাম ও নারীদের জন্য হালাল। হযরত আবু মূসা আশা'আরী (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'আমার উম্মতের পুরুষদের উপর রেশম-এর কাপড় ও স্বর্ণ হারাম করা হয়েছে এবং নারীদের জন্য

হালাল করা হয়েছে' *(তিরমিযী ১ম খণ্ড ১৩২ পৃঃ; নাসাঈ ২য় খণ্ড ২৮৫ পৃঃ; আহমাদ ৪র্থ খণ্ড ৩৯৪ পৃঃ; হাদীছ ছহীহ)*। হুযায়ফা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আমাদেরকে মিহি ও মোটা রেশমী কাপড় পরিধান করতে ও উহার উপর বসতে নিষেধ করেছেন *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৪৩২১)*। অতএব সিল্ক -এর শাড়ীর ব্যবসা নিঃসন্দেহে জায়েয। তবে পাঞ্জাবীর ব্যবসা করা যাবেনা। কারণ পাঞ্জাবী পুরুষের পোষাক।

প্রশ্ন (৫৪/১৪৪)ঃ জনৈক হিন্দু একজন মুসলমান নারীকে বিবাহ করেছে এবং তাদের সন্তানও হয়েছে। তাদের বিবাহ কি শরীয়ত সম্মত হয়েছে এবং তাদের সন্তানদের হুকুম কি?

-আবদুল জাব্বার
মহাদেবপুর, নওগাঁ।

উত্তরঃ শরীয়তের দৃষ্টিতে তাদের বিবাহ হয়নি। তারা ব্যভিচারী-ব্যভিচারিনীর অন্তর্ভুক্ত। তাদের সন্তান-সন্ততি জারজ সন্তান হিসাবে পরিগণিত। আল্লাহ তা'আলা বলেন, '....এরা (মুসলমান নারীরা) কাফেরদের জন্য হালাল নয় এবং কাফেররা তাদের জন্য হালাল নয়' *(মুমতাহিনা ১০; তাফসীর ইবনু কাছীর ৪র্থ খণ্ড ৩৭৫ পৃঃ)*। আল্লাহ তা'আলা অন্যত্র বলেন, 'ব্যভিচারী পুরুষ ব্যভিচারিনী নারী অথবা মুশরিক নারী ভিন্ন কাউকে বিবাহ করেনা এবং ব্যভিচারিনী নারীকে ব্যভিচারী পুরুষ অথবা মুশরিক পুরুষ ভিন্ন অন্য কেউ বিবাহ করেনা। মুসলমানদের প্রতি এরূপ বিবাহকে হারাম করে দেওয়া হয়েছে' (নূর ৩)।

অতএব হিন্দু যেহেতু কাফের ও মুশরিক, সেহেতু তাদের সাথে কোন ঈমানদার রমণী বিবাহ বসতে পারেনা। এদের অবস্থা ব্যভিচারী-ব্যভিচারিনীর ন্যায়। এ অবস্থায় তাদের সন্তানেরা জারজ সন্তান হিসাবে পরিগণিত হবে।

প্রশ্ন (৫৫/১৪৫)ঃ ছালাত আদায়ে নারী-পুরুষের মধ্যে কোন পার্থক্য আছে কি? অনেকে বলেন, পার্থক্য আছে। এই পার্থক্যের কি কোন দলীল আছে? পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে জওয়াবের প্রত্যাশায়-

-এখলাছুর রহমান
আন্দারিয়া পাড়া
কাটখইর, নওগাঁ।

উত্তরঃ ছালাত আদায়ে নারী-পুরুষের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। নবী করীম (ছাঃ) বলেছেন, 'তোমরা আমাকে যেভাবে ছালাত আদায় করতে দেখছ সেভাবে ছালাত আদায় কর' *(বুখারী ১/৮৮)*। এখানে নারী-পুরুষের ছালাতের পার্থক্যের কথা বলেননি। বিশিষ্ট তাবেঈ ইবরাহীম নাখঈ বলেন, পুরুষেরা ছালাতে যা করে নারীরাও তাই করবে *(মুছান্নাফ ইবনু আবী শায়বাহ, ১ম খণ্ড, ৭৫ পৃঃ, সনদ ছহীহ)*। নারী-পুরুষের ছালাতের মধ্যে পার্থক্য করে যে দলীল পেশ করা হয়, সেগুলি দলীলের যোগ্য নয় *(ছিফাতু ছালাতিন নবী ১৮৯ পৃঃ)*।

প্রশ্ন (৫৬/১৪৬)ঃ নিজ পরিবার ব্যতীত অন্য রমণীদের সালাম প্রদান করা যাবে কি? অনুরূপভাবে রমণীরা পুরুষদেরকে সালাম প্রদান করতে পারবে কি?

-ফযলে রাব্বী
কোদালকাটি
ভোলাডাংগী, মেহেরপুর।

উত্তরঃ কোনরূপ খারাবীর আশংকা না থাকলে পরিচিত অপরিচিত সকল নর-নারী একে অপরকে সালাম দিতে পারবে। উম্মে হানী থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি মক্কা বিজয়ের দিন নবী করীম (ছাঃ)-এর নিকটে আসলাম। তখন তিনি গোসল করছিলেন এবং ফাতেমা (রাঃ) কাপড় দিয়ে পর্দা করছিলেন। অতঃপর আমি সালাম প্রদান করলাম *(মুসলিম ১/৪৯৮ পৃঃ)*। আসমা বিনতে ইয়াযীদ (রাঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) একদল মহিলার নিকট দিয়ে যাচ্ছিলেন, তখন তিনি তাদেরকে সালাম করলেন *(আবুদাঊদ হা/৫২০; তিরমিযী হা/২৬৯৮ হাদীছ হাসান)*।

প্রশ্ন (৫৭/১৪৭)ঃ হিন্দুর জমিতে বা হিন্দুর অর্থ দ্বারা মসজিদ নির্মাণ করা যায় কি?

-নযরুল ইসলাম
সাং- বাররশিয়া, বাগডাঙ্গা
চাঁপাই নবাবগঞ্জ
ও
সামাদ এণ্ড সন্স
সাহেব বাজার, রাজশাহী।

উত্তরঃ হিন্দুর জমিতে ও হিন্দুর অর্থ দ্বারা মসজিদ নির্মাণ করা যাবে। কারণ (১) হিন্দুর জমিতে কিংবা হিন্দুর অর্থে মসজিদ নির্মাণ করা জায়েয নয়, এই মর্মে কোন শারঈ দলীল নেই। (২) মসজিদ নির্মাণ সৎ আমল সমূহের মধ্যে অন্যতম। আর মানব সমাজে সৎ আমল প্রতিষ্ঠা করাই হচ্ছে আল্লাহ্র দ্বীন প্রেরণের মূল উদ্দেশ্য। ফলে কাফিরের দ্বারাও যদি সৎ আমল প্রতিষ্ঠিত হয়, তাহ'লে শরীয়তের পক্ষ থেকে বাধা নেই। (৩) যদিও কাফেররা আল্লাহ ও পরকালকে অস্বীকার করে এবং আল্লাহ তাদের জন্য জান্নাত হারাম করে দিয়েছেন। কিন্তু তাদেরও সৎ বা অসৎ আমল আল্লাহ্র নিকট সৎ বা অসৎ হিসাবেই বিবেচিত। তাদেরকেও দুনিয়াতে কিংবা পরকালে আযাব কম ও বেশী করণের মাধ্যমে এক প্রকার ফলাফল দেওয়া হবে। আল্লাহ বলেন, 'যে ব্যক্তি অনু পরিমাণ ভাল কাজ করবে তার ফল সে দেখতে পাবে। আর যে অনু পরিমাণ অন্যায় করবে তার ফলও সে দেখতে পাবে' (যিলযাল ৭-৮)।

কাফের অবস্থায় কৃত সৎ আমল সমূহও মুসলমান হওয়ার পরে জান্নাতে যাওয়ার অসীলা হবে বলে মহানবী (ছাঃ) স্পষ্ট ভাবে ঘোষণা দিয়েছেন। একদা হাকীম ইবনু হিশাম (রাঃ) নবী করীম (ছাঃ)-কে জিজ্ঞেস করেন, হে আল্লাহ্র রাসূল! আমি কাফির অবস্থায় দান-খয়রাত, দাসমুক্তি, পরোপকার ইত্যাদি করার মাধ্যমে নেকী ও পাপমুক্তি কামনা করতাম। সেসব বিষয়ে কি এখন আমার কোন নেকী রয়েছে? উত্তরে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'তুমি বিগত (কাফের অবস্থার) ভাল কাজ সহ ঈমান এনেছ' (অর্থাৎ নেকী রয়েছে) *(বুখারী ফাৎহুল বারী 'আদাব' অধ্যায় হা/৫৯৯২)*।

প্রশ্ন (৫৮/১৪৮)ঃ কিস্তিতে কোন জিনিস ক্রয় করলে কি হারাম হবে?

-ফাতেমা
কলেজ রোড, বগুড়া।

উত্তরঃ কিস্তির ক্রয় বিক্রয় উভয়ের সন্তুষ্টিতে হ'লে হারাম হবে না। কারণ, এটা হচ্ছে অপারগদের সহযোগিতা করা। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'যে ব্যক্তি কোন অভাবগ্রস্ত লোককে সুযোগ দিবে কিংবা তার ঋণ মওকূফ করে দিবে, আল্লাহ ক্বিয়ামতের দিন উক্ত ব্যক্তিকে তার বিপদসমূহ থেকে মুক্তি দান করবেন *(মুসলিম, মিশকাত হা/২৯০৩, 'দারিদ্র ও অবকাশ দান' অনুচ্ছেদ)*। আয়েশা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি একদা বললেন, 'হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) সিরিয়া হ'তে একজন কাপড় বিক্রেতা এসেছে আপনি যদি কাউকে তার নিকট পাঠাতেন এবং পয়সার সুব্যবস্থা হওয়া পর্যন্ত দু'টি কাপড় বাকী নিতেন। (কাপড় বাকী ক্রয়ের জন্য) রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) একজন লোক পাঠান। কিন্তু লোকটি বাকীতে কাপড় প্রদান করেনি *(হাকেম, বায়হাক্বী, বর্ণনাকারীগণ সকলেই বিশ্বস্ত ও বুলূগুল মারাম হা/৮৪৬; সুবুল হা/৮০৮; তিরমিযী তোহফাসহ হা/১২২৮, 'নির্দিষ্ট মেয়াদে জিনিস ক্রয়ের সুযোগ দান' অনুচ্ছেদ, ৪/৪০৪ পৃঃ; বলূগুল মারাম 'সলম, কর্য ও রেহেন' অধ্যায় হাদীছ ছহীহ)*। এরূপ বাকী ক্রয়-বিক্রয়ে যদি দামের কমবেশী হয় আর উভয় পক্ষ সন্তুষ্ট থাকে তাহ'লেও জায়েয *(তোহফা ৪র্থ খণ্ড ৩৫৮ পৃঃ; নায়ল ৫ম খণ্ড ১৫২ পৃঃ)*।

প্রশ্ন (৫৯/১৪৯)ঃ জনৈক ব্যক্তি বিয়ের আগে কয়েকবার যিনা করেছে। গ্রামবাসী তার কোন বিচার করেনি। পরে এ ব্যক্তি অন্য গ্রামের একটি ভাল মেয়েকে বিবাহ করে। বিবাহের পরও সে পূর্বের ন্যায় অপকর্মে লিপ্ত হয়। তার স্ত্রী এসব সহ্য করতে না পেরে তাকে ভাল হওয়ার উপদেশ দেয়। ফলে সে তার স্ত্রীর উপর অত্যাচার করে। গ্রামবাসী এরও কোন বিচার করেনি। এমতাবস্থায় তার স্ত্রী যদি তাকে ভাল পথে আনার নিয়তে কোন গোপন ব্যবস্থা নেয়। তাহ'লে সেকি আল্লাহ্র নিকট দায়ী হবে? স্বামীর খারাপ চরিত্রের জন্য যদি তাকে অন্তর দিয়ে ঘৃণা করে ও খুশি মত তার খেদমত না করে তবে কি সে গোনাহগার হবে?

-নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক
জয়পুরহাট।

উত্তরঃ স্বামীকে ভাল করার জন্য স্ত্রীর প্রচেষ্টা ছওয়াবের কাজ। তবে গোপনে কি ব্যবস্থা নেওয়া হবে তা প্রশ্নে উল্লেখ নেই। শিরক-বিদ'আত ও যাদু-মন্ত্র ছাড়া কোন ভাল পদ্ধতিতে হেদায়াতের চেষ্টা করলে স্ত্রী নিঃসন্দেহে ছওয়াব পাবে। স্বামীকে ঘৃণা না করে তাকে ভালবেসে খেদমত করবে এবং আল্লাহ্র নিকট প্রাণঢালা দো'আ করবে স্বামীর হেদায়াতের জন্য। আল্লাহপাকের দয়া হ'লে হয়ত সে সহজেই ভাল হয়ে যেতে পারে। একান্তভাবে যদি সে ফিরে না আসে এবং স্ত্রীর উপর অত্যাচার করতেই থাকে, তবে স্ত্রী স্বামীর নিকট হ'তে 'খোলা' তালাক নিয়ে মুক্ত হবে। আল্লাহ বলেন, 'যদি তোমরা আশংকা কর যে, তারা আল্লাহ তা'আলার নির্ধারিত সীমা বজায় রাখতে পারবে না। তবে মেয়েটি বিনিময় দিয়ে মুক্ত হ'লে উভয়ের উপরে কোন দোষ নেই' (বাক্বারাহ ২২৯)। এই আয়াতটি 'খোলা' তালাকের দলীল। স্বামীর অধীনস্থ থেকে তার খিদমত না করলে বা তাকে ঘৃণা করলে গোনাহগার হ'তে হবে। বিবি আছিয়া স্বামী কাফের হওয়া সত্ত্বেও তার দুনিয়াবী খিদমত করেছেন। স্বামীর নাফরমানী করেননি। তাই বলে আল্লাহ্র বিরুদ্ধে তিনি স্বামীর হুকুম মানেননি।

প্রশ্ন (৬০/১৫০)ঃ আমরা জানি যে, সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর সপ্তম দিনে আকীকা দেওয়া উত্তম। কিন্তু যদি কোন সন্তান জন্মগ্রহণের পর সাত দিনের পূর্বে মারা যায় তবে তার আকীকা দিতে হবে কি?

-হাবীবুর রহমান মীযান
প্রভাষক, কাযিপুর কলেজ
গাংণী, মেহেরপুর।

উত্তরঃ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, ছেলের সাথে আকীকার হক সম্পৃক্ত। সুতরাং তার জন্য রক্তপাত কর (আকীকা কর) এবং তা হ'তে অপবিত্র (বস্তু) দূর কর (মস্তক মুণ্ডন কর) *(বুখারী ২য় খণ্ড ৮২১ পৃঃ)*। এ হাদীছে জীবন মৃত্যুর কোন বর্ণনা নেই। অন্য একটি বর্ণনায় আছে প্রতিটি সন্তান আকীকা না করার কারণে দায়বদ্ধ থাকে *(আহমাদ, তিরমিযী, আবুদাউদ, মিশকাত হা/৪১৫৩ 'আকীকা' অনুচ্ছেদ)*। ইমাম আহমাদ (রঃ) এর ব্যাখ্যায় লিখেছেন, সে পিতামাতার জন্য সুপারিশ করে না। এখানেও জীবন-মৃত্যুর কথা উল্লেখ নেই। বিধায় ছেলে যেহেতু জন্ম লাভ করেছে, সেহেতু আকীকা করা উচিত। তবে যেহেতু হাদীছে সপ্তম দিনে আকীকা করার কথা এসেছে, সেকারণ ইমাম শাওকানী বলেন যে, সাতদিনের পূর্বে বাচ্চা মারা গেলে তার আকীকা দিতে হবে না *(নায়ল ৬/২৬১)*।।

قُوْا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيْكُمْ نَارًا 'তোমরা নিজেদেরকে ও তোমাদের পরিবারবর্গকে জাহান্নাম থেকে বাঁচাও' (তাহরীম ১৬)।